এ জন্মের ইতিহাস

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যায়ন

৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

শ্রাবণ, ১৩৬৯

প্রকাশক
সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্যায়ন
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পরিবেশক
অভিজিৎ প্রকাশনী সমবায় লিঃ
৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
অজিতকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
এ. জি. প্রেস
৪, পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা-৯

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
নিতাই দে

। সূচনা ।

ায়ের কোলে এসেছিলাম দুই শূন্য হাতে মুঠি বেঁধে। মুঠি শূন্য, কিন্তু দাবী অনেক। জ্ঞানহীন শিশুবয়সে দাবীর ববরতায় কোন কুণ্ঠা ছিল না। সেই অকুন্ঠিত দস্যুতার ফাঁকে ফাঁকে ছিল দুটি বোধহীন চক্ষু মেলে অবাক হ'য়ে য়াবার পালা। আজ জীবনের জটিলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও সেই আদিম শিশু-'নকে অন্তরে অনুভব করি। অভিজ্ঞতার পাষাণ স্তূপের সংঘর্ষে চলমান পা দুখানি রক্তাক্ত,—তবু মাঝে মাঝে ফিরে তাকাই পৃথিবীর দিকে নির্বোধ এক শিশুর মতো। বিস্তীর্ণ আকাশ, গহন অরণ্য, স্রোতস্বিনী নদী আজও কি স্ম' হ'' দেখা দেয় চোখের সামনে!

সন্ধ্যা অবকাশে দিদিমার কোলের কাছে বসে গল্প শুনেছি, আমারই ছোটবেলার গল্প।

আমিই প্রথম সন্তান আমার মায়ের। আমার 'পনেরো বছরের তরুণী ।' নাকি তখন লজ্জা পেতো আমাকে কোলে নিতে। এ বয়সের তটরেখায় 'ড়িয়ে কল্পনা করি মায়ের সেই প্রথম তারুণ্যের কাল! হাসি-হাসি মুখ, কৌতুকোজ্জ্বল চঞ্চল এক তরুণী। শুনেছি, ঘরে আর কেউই হয়ত নেই, চুপি পি আসত আমার দোলনার কাছে,—আমার মুখের দিকে চেয়ে সন্তর্পণে ত দোল। চারিদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে কোলে তুলে নিতো,—তারপর নিবিড় স্নেহে আর আগ্রহে আমাকে বুকে চেপে ধরে চুমু খেতে থাকত। ক সেই সময়, বাইরে হয়ত শোনা গেল পদশব্দ। অমনি আমাকে নির্মম হস্তে ালনায় ঠেলে ফেলে রেখে দ্রুত পলায়ন করত। নির্বোধ শিশুর উচ্ছ্বসিত ান্নাও কিছুতে টেনে আনতে পারত না সেই পলাতকাকে।

অতি তুচ্ছ, সামান্য ঘটনা। কিন্তু আজ ভাবি, এর অন্তরালে আম. বনের কী নিদারুণ সত্য কথাটাই না লুকিয়েছিল! জীবনের দোলনায় :নর পর কাটে দিন। মায়ের স্নেহ অলক্ষ্যে এসে স্পর্শ করেছে; ি দেখছি ান্ মুহূর্তে—কোথায় মা! অন্তর উদ্বেলিত কান্নায় গুমরে উঠেছে সময় নেই কার সন্ধান মেলে নি ... আকাশে হে

স্পষ্ট মনে পড়ে দাদামশাইকে। স্মৃতির কুয়াশা ভেদ ক'রে বালক বয়সের অস্বচ্ছ দৃষ্টি-দিয়ে দেখা তাঁর কর্মজীবনের চিত্র বিবর্ণ লিপির মত মনের ভূমিকায় ভেসে উঠছে। মহানগরীর বক্ষপ্রান্তে বড়ো একখানা বাড়ী, অনেক-গুলো ঘর, দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় তাঁর কোলে বসে দেখতাম, বৈকালের ম্লান স্তিমিত আলো এসে পড়েছে বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে দিয়ে রাজপথে, চলেছে গাড়ী, চলেছে জনস্রোত! সেই স্রোত! সেই স্রোতের সাড়া এসে লাগত আমাদেরও বাড়ীতে। লোকজন আত্মীয় স্বজন, বাড়িখানি সর্বক্ষণই কোলাহল ও উৎসব মুখরিত। আমার দিদিমা ছিলেন এই উৎসবেরই কেন্দ্রে। তাঁর কল্যাণ হস্ত স্পর্শ করত বাড়ির প্রত্যেকটি কোণ। তাঁর অপরূপ [illegible] মনটি ছিল এ বাড়ীর প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে মিশে।

সেই আমার ছোটবেলাকার হারানো দিদিমা! পরনে চওড়া [illegible] সাড়ী, হাতে শুধু দুগাছি শাঁখা আর লোহা, ঘন আর উজ্জ্বল সীম[illegible] অত্যন্ত সাদাসিদে বেশ-বিন্যাস, দিদিমার সেই সুগৌর কল্যাণী [illegible] ও-বাড়ীর দেয়ালে টাঙানো তাঁর যে তৈলচিত্রখানি ছিল,—তার ম[illegible]ও রাখতে পারা যায় নি! উঠতেন সূর্যোদয়ের পূর্বে, টুকরো টুকরো [illegible] খুঁটিনাটি কত যে কাজ করতেন তার ঠিক নেই, দিনের শেষে ক্লান্ত [illegible] আসতেন উপরে। তাঁর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কোলে থাকতা[illegible]

আমার মা ছিলেন দাদামশাইয়ের একমাত্র সন্তান। অত্য[illegible] সেইজন্যই সম্ভবতঃ তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ও যত্নের প্রতি এ বাড়ির প্রায় প্রত্যেক মানুষই ছিল সচেতন; তখনকার সাধারণ সমাজের চলন হিসাবে অল্পবয়[illegible] মা বিবাহিতা হয়েছিলেন। কতো আর তখন মার বয়স? যতোদূর শুনে[illegible] তেরোর কিছুতেই বেশী না। আমার বাবা তখন ছাত্র। দরিদ্র, মাতাপিতৃ[illegible] নিঃসহায়। কলেজে মেধাবী ছাত্র বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। আর ছি[illegible] অনাড়ম্বর জীবন। স্বল্পভাষী। জ্ঞানের রাজ্যে অবিশ্রান্ত পথচলার অকু[illegible] প্রয়াস! সত্যিকারের নিষ্ঠাবান অধ্যবসায়ী তপঃগম্ভীর এক তরুণ। বি[illegible] পরে এ বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করতেন; দাদামশায়েরও একমাত্র কন্যা[illegible] চোখের আড়াল করতে হয় নি।

প্রাচুর্যের ক্রোড়েই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। ক্রোড়-ভূমির [illegible]
[illegible]ছে, কিন্তু সে অস্পষ্টতার গুণ্ঠনমোচন করে লাভ নেই।

ছয় টাকা

হিসাবে সেটা বিংশ শতকের প্রারম্ভ। এই প্রারম্ভকে ভূমিকা বলা যায়; আসন্ন ঝড়ের আয়োজনে মেঘের আনাগোনা।

ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েই সত্যিকারের বিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয়। তখন আমারও মনোজগতের সূর্যোদয় হয়েছে, অল্প অল্প বুঝতে পারছি, দেখতে পারছি।

কিন্তু তার পূর্বে শেষরাত্রির আশা-উদ্বেল নক্ষত্রের দীপ-জ্বালানো অন্ধকারের কাহিনী শোনা দরকার। ছোটবেলাকার খণ্ড খণ্ড কতগুলি চিত্র জেগে আছে মনে। একদা, সেটা আমার শিশু-মনকেও দিয়েছিল নাড়া, দেখলাম, হঠাৎই যেন সব কিছু বদলে গেছে। সেই প্রাণখোলা উচ্চহাসির শব্দও আর শুনতে পাই না সমস্ত বাড়ির মধ্যে। সবারই ভিতরে একটা কেমন স্বাচ্ছন্দ্যহীন ধৈর্য দেখতে পাচ্ছি। আমার বাবার নির্জন পড়ার ঘরে প্রত্যেক সকালে ও সন্ধ্যায় ভীড় বাড়ে। কী একটা বড়ো কাগজ চোখের সামনে ধরে প্রত্যহ বাবা পড়ে শোনান, আর সবাই স্তব্ধ হয়ে শোনে। দাদামশাইয়ের কর্মব্যস্ততা হঠাৎ আরও বেড়ে গেল, তাঁকে আর আমি বেশী পাইও না। সকলের মাঝে হেঁটে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কানে যেতো, যুদ্ধ। রাত্রে দিদিমার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, "দি'মা, যুদ্ধ কী?"

যুদ্ধ কী, কী-ই বা ফল, এবং কী-ই বা প্রতিক্রিয়া, বোঝা গেল অনেক পরে, তখন বুঝতে শেখবার বয়স আমার হচ্ছে। সার্বিয়ার এক নগরপ্রান্তে অগ্নিশিখার দেখা গেল উন্মেষ, তাই অনুকূল হাওয়ায় লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে সমস্ত ইয়োরোপ ব্যাপ্ত করে জ্বলে উঠল। সেই প্রচণ্ড দাহের উত্তাপ এসে লাগল এ দেশেও। সে উত্তাপে উনবিংশ শতকীয় মোহজালটুকুও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল; দেখা পাওয়া গেল মোহমুক্ত বিংশ শতাব্দীর।

তখন মাঝামাঝি, এমনদিনে স্তব্ধ হলেন আমার দিদিমা। শিশুকালের চোখ দিয়ে দেখা সেই চিত্রটি আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দিন ধরে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি। দিদিমার ঘরের দিকে গেছি যেতে পারি নি, ভুলিয়ে আমাকে বারান্দায় শিক ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। অনেকগুলো মোটর এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, তার থেকে ব্যস্ত-সমস্ত নামছে অনেক লোক। পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখছি সবাই ভয়ানক ব্যস্ত, আমার দিকে ফিরে তাকাবার কারুরই সময় নেই। কাউকেও পাচ্ছি না, মা-ও দিদিমার ঘরে। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে

পড়েছে তখনই রোল উঠল কান্নার। সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল সেই ঘরে। জ্বর হওয়ায় যে খাটে এ কয়দিন শুয়েছিলেন, সেই খাটেই শা হয়ে শুয়ে আছেন দিদিমা। চওড়া লালপাড় শাড়ির ঘোমটা খুলে চুলের রা এলিয়ে পড়েছে, বাবা যেন সিঁথিতে দিয়ে দিচ্ছে সিঁদুর, পায়ে আলত ব্যাকুল হয়ে বললাম, "দি'মা যাবো।"

—"চুপ, চুপ, দিদিমা ঘুমিয়েছে, গোলমাল করো না।"

ঘুমিয়েছে? তা হলে মা ও-রকম কাঁদছে কেন? আর আমাকেই মার কাছে অমন করে ঠেলে দিলো কেন ওরা? মার কান্না দেখে আমা কান্না পেলো।

দিদিমা গেলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রাচুর্যের মূলদেশ পর্যন্ত প্রবলভ নড়ে উঠল। তিনি চলে যাবার পর বোঝা গেল তিনি কী ছিলে দাদামশাই আনতেন, কিন্তু রাখতে জানতেন না। কিছুদিনের মধ্যেই নির্মম সত্য কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। উপযুক্ত কর্ণধার বিহীন সংসা তরী চলল বিপথে ভেসে, গতি হলো শ্লথ, ভঙ্গিমা গেল বক্র হয়ে। সেই বক্রতার অনুকূলেই পালে লাগল ঝড়ের বাতাস, স্রোতমুখে হলো টলোমলো।

ঠিক এই সময়টুকু একটি অত্যদ্ভুত বিশৃঙ্খলার ইতিহাস। এই একান্নবর্তীতার মধ্য থেকে যে সুবিধাবাদীরা গোপনে সুবিধার জটিল জাল ফেলেছিলেন, তাঁদের দেখা গেল কর্মতৎপর। বিশৃঙ্খলা আরও ঘনায়মান হ যখন একদিন জাহাজ-ঘাটা থেকে দাদামশায় ফিরলেন গুরুতর আহত হ পায়ের উপর আকস্মিক ভার পতনের ফলেই এই দুর্দৈব। চলল চিকি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকতে হলো তাঁকে। ঘরে বাইরে সুবিধাবাদীদের জালবিস্তার এই সুযোগে লাভ করল দ্রুতগতি। দাদামশায় ছিলেন ব্যবসা তাঁর ব্যবসার ক্ষেত্রভূমিতে ফাটল ধরল। জাহাজ-ঘাটার ঠিকাদারীই তাঁর প্রধান অবলম্বন। সেইখানেই ফাঁকটা হলো গুরুতর। সুবিধাবাদী দের চক্ষু প্রখরতর হয়ে উঠল। গোপনে চোরাপথে তাদের যাতায়াত বেড়ে। সেই বর্ধমান বিষ বিস্তারের কুয়াশায় দিকভ্রম ঘটল। তরীর নিম্ন চোরা আঘাত যখন লাগল, তখন ভীষণ ভাবেই লাগল। দাদা ভরাডুবি হলেন।

এর পরবর্তী অধ্যায় থেকেই আমার জীবনের সত্যিকারের

ইয়োরোপের অনল শান্ত হয়ে কিছুদিন গেছে কেটে। দেশের অভ্যন্তরে তখন নূতন জোযার এসেছে। নূতন সূর্যের স্বচ্ছ আভায় দিগন্ত ঝলোমলো।

এ আলোর ছটা এসে লেগেছিল আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গনেও; তখনো ভাঙন ঠিক ধরেনি। ভাঙন-নাট্যের প্রস্তাবনার আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে।

এবং এই প্রস্তাবনাটি বিশেষ মূল্যবান। অন্ততঃ আমার জীবনে বাল্যজীবনের এই সময়টুকু আমার মনে বিশেষ চিহ্ন ধারণ করে জাগরূক আছে। এই সমযেই বাণী পিসীকে আমি প্রথম দেখি। আমার বয়স তখন কত? এগাবো-বারোর বেশী না। সেই বালকেব মনে বাণী পিসীর যে ছাপ প্রথম পড়েছিল, আজ যৌবনেব প্রান্তদেশে পৌছেও দেখি, সে ছাপ মুছবার নয়।

। প্রথম ঢেউ ।

বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নয়, একটা বড়ো রাস্তার ধারে ছোট দোতলা বাড়ী।

ইজিচেয়ারে কাৎ হয়ে শুয়ে কী একটা বই পডছিলেন তখন তিনি, ধবধবে সাদা কালোপাড় শাড়ি পরনে, ঘোমটা শিথিল হয়ে খোঁপা ভেঙে চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে। ঘরের আসবাবগুলো বেশ গুছানো। টেবিল-র‍্যাকে অনেক বই, খাতাপত্র, দোয়াত কলম। একপ্রান্তে খাটে বিছানা পাতা। তারই এক-পাশে একটি বছর তিনেকের ছোট্ট ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আমাদের দেখে স্মিতহাস্যে মুখ তাঁর হয়ে উঠল উজ্জ্বল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "এসো নতুনদা, অনেকদিন পরে এলে কিন্তু।"

বাবাও হাসলেন, বললেন, "হ্যাঁ, পনেরোদিন পরে অনেকদিন পরেই বটে!"

এবার হাসিতে তাঁর লজ্জার আভাস ফুটল, একটু থেমে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "এই নাকি বড়ো ছেলে?"

"হ্যাঁ। খোকা, তোমার বাণী পিসীমাকে প্রণাম করো।"

প্রণাম করতেই তিনি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন।

"খোকা, তোমার নাম কী?"

বললাম।

"নিখিলেশ? নিখিল—তোমার নাম? বেশ নামটি তো?"

বাবা হাসলেন "নামটি অবশ্যই পিতৃদত্ত। যাই হোক্, বাড়ীর কর্তাটি আমাদের কোথায়?"

"ও ঘরে ঘুমুচ্ছেন।"

"তুলব নাকি ভদ্রলোককে?"

"তোলো না। কী খালি প'ড়ে প'ড়ে ঘুম, আমার ভালো লাগে না।"

বাবা হাসলেন, "সত্যিই তুলতাম। কিন্তু আজ আমারই সময় নেই, এক যায়গায় এখুনই যেতে হবে। খোকা রইল তোমার কাছে। ফেরবার পথে ওকে নিয়ে যাবো।"

"একটুও বসবে না এখন ?"

"না।"

একটু থেমে বাণী পিসী বললেন, "কোথায় যাচ্ছ বোধ হয় আন্দাজ করতে পারছি।"

'তোমার পক্ষে না করবার কথা নয়।"

বাণী পিসী স্তব্ধ।

কথা কইলেন বাবা, "আচ্ছা, চললাম তাহ'লে, কেমন ?"

"একটা কথা বলে যাও।"

"কী ?"

"বউদি-কে জানিয়েছ ?"

"না।"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ রইলেন পিসীমা, তারপরে এক সময় যেন চমক ভেঙেই বললেন, "ফিরবে কখন ?"

"পাঁচটার মধ্যেই।"

"একটা কথা জানতে পারলুম।"

"কী ?"

"বউদি তোমার গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এইজন্যেই সঙ্গে আজ তোমার ছেলে, তাই না ?"

বাবা নিরুত্তর।

কয়েক মুহূর্ত পরে এই নীরবতার কাঠিন্যকে ভেঙ্গে ফেলে হঠাৎ-ই প্রশ্ন করলেন বাণী পিসী, "কেন এমন হ'লো নতুনদা ?"

"ঐ দেখ! মিছিমিছি দেরী করিয়ে দিচ্ছ ত ? আমি চললাম। খোকা তোমার বাণী পিসীর কাছে থেকো, দুষ্টুমি ক'রো না যেন।"

বাবা চলে গেলেন।

বাণী পিসী স্তব্ধ পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন পথের দিকে চেয়ে আমি ঘরের একপাশে বসে তাঁর সেই কবাট-ধরে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী দেখতে পাচ্ছি। মনের মধ্যে এই একটি কথাই গুঞ্জরণ তুলছিল—কে ইনি ইনি আমার পিসী ? কৈ শুনিনি ত এঁর কথা, কেউ ত বলেনি এঁর নাম বাড়ী থেকে বেরোবার মুহূর্তে মার প্রশ্ন, "যাওয়া হচ্ছে কোথায়, শুনি ?"

বাবার উত্তর, "বন্ধুর বাড়ীতে।"

"খোকাকে সঙ্গে নাও।"

"বেশ

…ভাবছি। খুঁজছি জিজ্ঞাসার উত্তর। মনের মধ্যে সর্বক্ষণই একটা কৌতূহল উঁকি দেয়। এই কৌতূহল, এই জিজ্ঞাসা, এর বীজ শিশুবয়স থেকেই অঙ্কুরিত আমার মনে। আজও ভাবি, জীবনে লোভের সামনে, মোহের সামনে, দুঃখের সামনে, সুখের সামনে, আনন্দের সামনে, বিপদের সামনে, কোনোদিনই রেহাই পেলাম না এই অন্ধ কৌতূহল থেকে!…

বসে আছি অনেকক্ষণ। একসময় চমক ভেঙে বাণী পিসী সরে এলেন কাছে।

"দেখ দেখি কী অন্যায়! বসে আছ একলাটি চুপ করে; অথচ একটা কথাও তোমার সঙ্গে বলছি না!"

সলজ্জ ভঙ্গিমায় একটু হাসলাম। উনি এসে বসলেন খুব কাছে:

"বাবা কোথায় গেলেন বলো ত?"

"জানি না! কোথায় গেলেন?"

হেসে উঠলেন, "বলব কেন?"

তারপরেই গম্ভীর হয়ে—"এক বন্ধুর বাড়ীতে, ভয়ানক দরকারে।"

আবার চুপচাপ। কাছেই ছোট ছেলেটি ঘুমোচ্ছে। ওঘর থেকেও মস্ত নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ঘড়ির টিক টিক। মধ্যাহ্নের রৌদ্র জানালার পথে এসেছে ঘরে। বাণী পিসী কথা কইলেন, "আচ্ছা নিখিল, একটা কথা বলো ত?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম।

বল্লেন, "কাকে তুমি সব থেকে ভালবাসো?"

একটু ইতস্ততঃ করছিলাম।

"লজ্জা কী, বলো, বলো?"

বললাম, "দাদুকে।"

"তাই নাকি। দাদু বুঝি খুব ভালো লোক?"

"খু-ব। আপনি দেখেননি দাদুকে?"

"কী করে দেখব বলো? আমি তো আর কোনোদিন তোমাদের বাড়ী যাই নি!"

"যান নি! তাহ'লে আমার দিদিমাকেও দেখেন নি?"

"না। একদিন যাবো। দেখে আসব সবাইকে।"

"দিদিমা নেই! মারা গেছেন।"

"তাই নাকি! কবে?"

"অ-নে-ক দিন।"•

"আহা!"

একটু চুপ থেকে বললাম, "আমার মাকে দেখেছেন নিশ্চয়।"

"একবার, তোমার বাবার বিয়ের দিনে। সে অনেক কালের কথা।"

আবার স্তব্ধতা।

উনিই স্থরু করলেন, "আমার কথা বলবে তোমার মাকে?"

"বলব।"

হেসে উঠলেন, "কী বলবে?"

হঠাৎ-ই কেন যেন ঈষৎ লজ্জায় মাথা নীচু করলাম।

"তুমি তোমার মাকে খুব ভালবাসো, তাই না নিখিল?

একটু থেমে একটু দ্বিধার পর বললাম, "হুঁ। তবে মা বড্ড বকে।"

আবার হেসে উঠলেন "দুষ্টু ছেলে! নিন্দা করা হচ্ছে মায়ের!"

গভীর লজ্জায় নুয়ে পড়লাম মাটির সঙ্গে যেন! পার হলো কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত। আস্তে আস্তে মুখ তুলে দেখতেই অকস্মাৎ মনে হলো, যিনি হেসে হেসে এতক্ষণ কথা কইছিলেন, তিনি যেন ইনি নন। ঘোমটা খসে গেছে, আঁচলটা শিথিল হয়ে লুটিয়েছে বাহুমূলে, স্থির নিবিষ্ট দৃষ্টি বাতায়ন পার হয়ে দূর দিগন্তে, সমস্ত মুখে অদ্ভুত গাম্ভীর্য। কাছে থেকে যেন নিমেষে চলে গেছেন বহু দূরে।

"নিখিল?"

ঈষৎ চমকে তাকালাম ওঁর দিকে।

"কী তুমি ভালবাসো, বলো ত?"

ঠিক বুঝলাম না।

"খেলতে, বেড়াতে না পড়তে? কী তুমি ভালবাসো?"

মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "পড়তে।"

"পড়তে, নয়? কী পড়ো তুমি? কোন ক্লাসে?"

বললাম।

"বাঃ! বেশ। মন দিয়ে পড়াশোনা করো।"

একটু থেমে পুনর্বার বললেন, "কবিতা পড়তে তোমার ভালো লাগে?"

সোল্লাসে বললাম, "খু-ব।"

"শুনেছ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম?"

"শুনেছি।"

"পড়েছো তাঁর কোনো কবিতা?"

"হ্যাঁ। 'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ, করো করো সবে সাজ'...!"

"থামো-থামো। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' পড়েছো? 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের 'পর...!' পড়োনি?"

মাথা নাড়লাম। টেবিল থেকে কী একটা বই তুলে নিলেন।

"কথা ও কাহিনী। পড়েছো? এর মধ্যে একটা চমৎকার কবিতা আছে—গুরু গোবিন্দ। আমার ভয়ানক ভালো লাগে। গুরু গোবিন্দ কে ছিলেন জানো ত? ইতিহাস পড়ো নিশ্চয়। বুঝতে পারবে। গুরু গোবিন্দ ছিলেন শিখদের গুরু। ইনি কী স্বপ্ন দেখতেন জানো?

'আয় আয় আয়—ডাকিতেছি সবে, আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার, ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ-সম্পদ মায়া-মমতার বন্ধন যায় টুটে'!'

মুগ্ধ অন্তর দিয়ে শুনছি। ধীর স্পষ্ট আবেগময় তাঁর কণ্ঠস্বর অপূর্ব যাদু বিস্তার করল। একমনে আবৃত্তি করতে করতে একসময় উনি দুটি চোখ বুজে ফেলেছেন, বলছেন,—

'এখনো কেবল নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা আপন মর্মবাণী!'

শুনতে শুনতে আমার বালক মন এক বিচিত্র বিপুল নূতনত্বের ভাণ্ডার চোখে দেখেছিল সেদিন। আর দেখেছিল, ওঁকে। এই চারটে-দেয়াল-ঘেরা ক্ষুদ্রতার মধ্যে উনি নেই, উনি সেইখানে, যেখানে দূরতটপ্লাবী যমুনার কল্লোল, দুর্গম গিরিপথ, অরণ্যের ধ্যাননিমগ্ন স্তব্ধতা, পাষাণের ক্রোড়ে যেখানে মানুষ হচ্ছেন সত্যধর্মী জাতির অধিনায়ক! বালক-বয়সের দেখা স্মৃতির কুয়াশা-ঘেরা অমূল্য চিত্রখানির দিকে আজকের চোখ মেলে দেখি, কী অদ্ভুত প্রাণময়তা বাণী পিসীর! নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে দিয়েছেন কাব্যের বিস্তৃত উদার আকাশে, সংসারের সমস্ত কোলাহল ছাড়িয়ে উধাও ঊর্ধ্বে একাকী উড়ে চলার পক্ষ বিধূনন!

কিন্তু তবু নামতে হয়। নেমে আসতে হয় সংসারের তীরে আশ্রয় শাখার ক্ষুদ্র নীড়খানির মধ্যে, হাসিকান্নার হীরাপান্নার আনন্দের মধ্যখানেই স্তব্ধ হয় শ্রান্ত ক্লান্ত পাখা দুটি ; আবার কোলাহল, আবার সুখদুঃখের অশ্রুপাত!

দরজার খুট করে একটু শব্দ। ঘরখানি তখন স্তব্ধ ছিল, আবৃত্তি শেষ, রেশটুকু শুধু তখনো বাতাসে ভাসছে।

"কে ?"

উত্তর এলো না, দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেল। এদিকের চৌকাঠ ধরে নিজেকে যতটুকু আড়ালে রাখা যায়, ততখানি অন্তরালে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি মেয়ে! বাণী পিসী হেসে উঠলেন, "ঘুম ভাঙল এতক্ষণে? ভেতরে আয় না ? ও, তোর একটি দাদা, নিখিলদা। আয় ?"

এলো না। মাথাটা একটু হেলিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়েই ছুটে পালাল। হাসতে লাগলেন বাণী পিসী, "কী ভয় মেয়ের! নতুন লোক দেখলেই ওর ঐরকম ভয় আর লজ্জা! চিনতে পারলে তো ওকে নিখিল ?"

নিরুত্তরে মাথা নাড়লাম।

"আমার মেয়ে। গৌরী।"

বাণী পিসী উঠে দাঁড়ালেন।

"তুমি বসো নিখিল, বই-টইগুলো দেখো, আমি আসছি।"

তন্দ্রা ভাঙল সংসারের। আবার কোলাহল, আবার কাজ, আবার ব্যস্ততা! বছর তিনেকের ছোট্ট ছেলেটিও উঠে বসেছে। পিসীমা তাকে নিয়ে গেলেন ওঘরে। আমি বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর পাচ্ছি অনেকের। ছোট ছেলে, মেয়ে এবং পিসীমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিশে একটি মোটা গম্ভীর স্বরও কানে আসছে। পার হচ্ছে সময়। রান্নাঘরে জলল আগুন, তার ধোঁয়া এ ঘরকেও স্পর্শ করল। ইতিমধ্যে ছোট্ট ছেলেটিকে পরিচ্ছন্নমূর্তিতে আমার কাছে বসিয়ে রেখে গেলেন পিসীমা।

"মণ্টু আমার লক্ষ্মী ছেলে, বসো তো একটু ? এই যে তোমার দাদা, দাদার সঙ্গে গল্প করো, কেমন ?"

বড়ো বড়ো দুটি চোখ মেলে ছেলেটী আমায় দেখতে লাগল। বেশ ছেলেটি। মনে মনে ভাবলাম, আমার যে ভাইটি আঁতুড়ঘরেই মারা গেল, বেঁচে থাকলে সে এতবড়টিই হয়ে উঠত। আমি, আমার পরের ভাই কমল,

আর সে, আমরা হতাম তিনজন। হঠাৎ দেখি চোখ পাকিয়ে মণ্টু আমার দিকে চড় তুলেছে। হেসে তাকে কোলে তুলে নিলাম। প্রথমটায় বিরক্তি প্রকাশ করলেও পরে খুসী হয়েই আমার সাগ্রহ আলাপনে সাড়া দিল।

খানিক পরে সেই মেয়েটির দেখা মিলল। এক হাতে গ্লাসে জল, অপর হাতে খাবারের রেকাবী, ধীর পায়ে এসে টেবিলে রাখল। তারপরে আমাদের কাছে এসে হাত তুখানি দিলো বাড়িয়ে ঃ

"এই মণ্টু, আয়, মা খেতে ডাকছে রান্নাঘরে।"

মণ্টুকে নিয়ে চলে গেল, একটা কথাও বলল না আমাকে।

বাণী পিসী এলেন, "কই নিখিল, খাও? লজ্জা কী?"

মেয়েটি আবার এলো, "মা, বাবা ডাকছে।"

মা যেতেই সে এবার এসে বসল অদূরে একটা চেয়ারে, হাতে তার নিজের খাবারের বাটি! আর তার পরক্ষণে দরজার কাছে দেখতে পেলাম এই দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। ঈষৎ স্থূল, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া মস্ত গোঁফ আর ঘন তির্যক ভ্রূ তাঁর মুখমণ্ডলে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। আন্দাজে বুঝলাম, ইনি পিসেমশাই। উঠে এসে প্রণাম করতে প্রশ্ন শুনলাম, "এটি কে?"

বাণী পিসী ঠিক পিছনে ছিলেন, বলে উঠলেন, "চিনতে পারলে না? নতুনদার বড়ো ছেলে নিখিল।"

মনে হলো একটু কঠোর হ'লো তাঁর ভাবভঙ্গী, বললেন, "হুঁ। বিনয় এসেছিল বুঝি?"

"এসেই তখ্খুনি চলে গেলেন। ছেলেকে রেখে গেলেন, ফেরার পথে নিয়ে যাবেন।"

"হুঁ। ফিরবে কখন?"

"ফেরার সময় তো হয়ে এলো।"

একটু থেমে উত্তর দিলেন, "তাহ'লে দেখা হবে। গৌরী মা?"

মেয়েটী ছুটে এলো, "কী বাবা।"

"বাড়ীতেই খেলা-ধুলো করো, বাইরে যেও না, কেমন?"

"আচ্ছা।"

উনি চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তেই ফিরে এলেন বাবা। আর দেরী নয়, এবার যেতে

হবে। বাণী পিসী বললেন, "আরও একটু থাকো না নতুনদা? উনিও ফিরবেন, ওঁর সঙ্গেও দেখা হবে।"

"দুর্ভাগ্য আমার! কিন্তু না ফিরলে নয়, খোকাকে নিয়ে এসেছি, বোঝো তো?"

"একটুক্ষণও থাকবে না?"

বাবা হাসলেন, "আবার আসব বাণী।"

"তোমার আসা! কবে আসবে ঠিক নেই। একটা গান শুনিয়ে যাও না নতুনদা? বহুদিন তোমার গান শুনি না।"

হো হো করে হেসে উঠলেন বাবা, "গান গাইবারই উপযুক্ত অবসর বটে!"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গাইতে হলো। বাণী পিসীর মিনতিরই হলো জয়। আকাশে তখন সবে লেগেছে সন্ধ্যার স্পর্শ, জ্যোৎস্নার আভাস নগরীর কক্ষ প্রান্তে। বাবা গাইলেন। মুগ্ধ অন্তর দিয়েই শুনলাম। 'কবে তুমি আসবে সে অপেক্ষাতেই থাকব না বসে। আমি বাইরে চলব। বাতাস দোল দিয়েছে, তরীর বাঁধন এখনই ত খোলবার পালা, মাঝনদীতে ভাসিয়ে তরী একা চলবার এই ত অবসর! আজ শুক্লা একাদশীর তিথিতে নিদ্রাহারা শশী স্বপন পারাবারের খেয়া একলাই চালিয়ে নিয়ে চলেছে। এমন দিনে পথ না হয় না-ই জানা থাকল, তবু চলতে ক্ষতি কী? সময়? আর ত সময় নেই!'

উঠে দাঁড়ালাম। বিদায়ের মুহূর্তে ওঁরা পরস্পরের সম্মুখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। বাবা বললেন, "বাণী, সংসারের অন্তরালে থেকেও অনেকে অনেক কাজ করে। তুমি করবে?"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বাণী পিসী, "নতুনদা! আমি কি পারব!"

"পারবে।"

সিঁড়ি বেয়ে পথে নামতেই মুখোমুখি দেখা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে। বাবা বলে উঠলেন, "নমস্কার প্রফুল্লবাবু।"

পিসেমশায়ের ঠোঁটের প্রান্তেও ঈষৎ হাসির রেখা পড়ল, "এই যে বিনয়বাবু।"

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। সাধারণ ভদ্রতা-বিনিময় সাঙ্গ করে আমরা পথে নামলাম।

আমাদের বাড়ি। দাদু ব্যস্ত ছিলেন বৈঠকখানায়। ওপরে যেতেই মা এলেন আমাদের সামনে : "এই এতক্ষণে ফেরা হলো বুঝি ?"

বাবা দাঁড়িয়ে পড়লেন, আমি পাশ কাটিয়ে চলে এলাম আমার পড়ার ঘরে। পোষাক বদলেছি, বাবার গাওয়া গানটি নিয়ে গুণ গুণ করার প্রয়াস চলছে, এমন সময় ত্বরিৎ পায়ে মায়ের প্রবেশ।

"হ্যাঁরে খোকা, কোথায় গিয়েছিলি ?"

একটু থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, "পিসীমার বাড়ি।"

"পিসীমা! সাতগুষ্ঠি কেউ নেই পিতৃপুরুষে, তোদের আবার পিসী এলো কে!"

"বাণী পিসী!"

"বাণী পিসী! কে বল তো? বল তো কী রকম দেখতে?"

মা জাঁকিয়ে বসল। নানাভাবে নানারকম প্রশ্ন। একটু আশ্চর্য লাগছিল, আনন্দও হচ্ছিল। মা এভাবে এতক্ষণ বসে আমার সঙ্গে সাগ্রহে আলাপ করছে, স্বাদটা নূতন বই কি!

"জানো মা, বাণী পিসী ভারী চমৎকার লোক! আমাকে কতো আদর করলেন। আর কী সুন্দর কবিতা পড়েন, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আর শুনেছ মা, একটা কথা ?"

"কী ?"

"বাবা চমৎকার গান গাইতে পারেন। ওখানে গাইলেন। কী মিষ্টি গলা! মা, আমি গান শিখব।"

"হুঁ।"

ছোট্ট উত্তর। মুখখানা জলভরা মেঘের মতো থমথমে। উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাশে যে ঘরখানায় তখন বাবা রয়েছেন, সেই ঘর থেকে মার ক্রন্দনমিশ্রিত উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে আমার বিস্ময় আর সীমারেখা মানল না!

"জানি! জানি আমি সব! বোন? বোন না আরও কিছু! তোমার কোন সম্পর্কের আহ্লাদী বোন, শুনি?"...

সে রাত্রির এই আকস্মিক কুজ্ঝটিকাকে ভুলবার নয়। বাবা রাগ করে নীচের ঘরে চলে গেলেন, আর উঠে এলেন না। মা জলস্পর্শ না করে বিছানায় রইল পড়ে। আমার ছোট ভাই কমল গেল নীচে, বাবার কাছে। আমি মার কাছে একবার গেলাম। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, মনে হলো কাঁদছে

তখনো। বাড়িশুদ্ধ সবাই এসে সেধে গেলেন, এমন কি দাতু নিজে পর্যন্ত, মা তবু টলল না। শেষবারে এলাম আমি। আস্তে ডাকলাম, "মা ?"

বারুদের স্তূপে যেন অগ্নি সংযোগ ঘটল।

"আমার কাছে কেন! যাও না তোমার সেই সাত জন্মের পিসীর কাছে! যা বলছি, সরে যা। সব শয়তান! যা যা দূর হয়ে যা সমুখ থেকে!"

আজ বুঝি, কিন্তু তখন বুঝিনি! অকারণ তিরস্কারে প্রায় কেঁদে ফেলেই দাতুর কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু বিছানায় শুয়ে সে রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি, ছটফট করেছি, মনে আছে। বেদনার চেয়ে বড়ো হয়ে মনে জাগছে কৌতূহল—প্রশ্ন। কী হলো ? কেন হলো ?

পরদিন সকাল থেকে কিন্তু যেমন দিন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। কোনো গোলযোগ কোনো দিকে নেই। প্রশ্নভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কারুরই আচরণে কৌতূহলের চিহ্নমাত্র নেই। এমন কি সেই কালকের মাকেও দেখছি শান্ত। সকালে যথারীতি স্নান করে গৃহকাজ তদারক করছে। এও এক কঠিন বিস্ময় আমার কাছে!

কিন্তু এই বিস্ময়ের ঘোর ভালো করে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমাদের সংসারে ভাঙনের স্রোত নামল। স্তূপীকৃত বরফের পর্বত-শিরের বরফের একটা স্তূপ গেল গলে, প্রবল নবীন জলস্রোত অকস্মাৎ পথরেখা প্লাবিত করে নেমে এলো। সেই দুরাবরোধ্য দুর্নিবার প্লাবনে আমাদের বিরাট পরিবার সম্পূর্ণ ভেসে গেল।

॥ তুই ॥

দাতুর অবস্থাটাই হলো ভয়ানক। দীর্ঘ চিকিৎসার পর অবশেষে পা কাটাতে হলো। কাষ্ঠফলকের সাহায্যে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটেন, ঘাড় পড়েছে নুয়ে, মাথার চুল শুভ্রতায় ভরে গেছে, সমস্ত মুখে গভীর রেখা এঁকে এঁকে মূর্তিমান বিষাদকে রূপায়িত করে গেছে।

ছোট্ট একতলা একখানা বাড়ির একাংশ ভাড়া নিয়ে আমরা আছি। সে আসবাবের সমারোহও আর নেই। সেই আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ী ঋণের দায়ে

নীলাম হয়ে গেল চোখের সামনে। ঘর-সাজানো জিনিষগুলিও খাতকের ব্যাদিত মুখ-গহ্বর থেকে বাঁচল না।

অত লোক, কে কোথায় পড়ল ছিটকে। দাদু, বাবা, মা, আমি, আমার ভাই কমল, আর আমাদের বহুদিনের পুরানো ঝি, এই কয়টি প্রাণীমাত্র নিয়ে আবাব সংসারের পথাতিবাহন সুরু হলো।

মাকে দেখলাম নবতর রূপে। সংসারের সমস্ত ভার অবলীলায় নিয়েছে তুলে। খরচ বেশী হবে বলে একটি বাঁধবার লোক পর্যন্ত রাখতে দেয়নি, দাদুর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও না। সকালে কত ভোরে যে উঠত ঠিক জানি না, ঘরে বাইরের আলো স্পর্শ করতে না করতেই মা আসত আমাদের বিছানার কাছে, ততক্ষণে স্নান শেষ, সংসারের প্রাথমিক কাজও কিছু কিছু সমাপ্তির পথে। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকত, "ওরে নিখিল, ওরে কমল, ওঠ ওঠ, বেলা হয়ে গেছে, পড়তে বোস।"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে অল্পক্ষণেব মধ্যে বই নিয়ে দাদুর দরবারে উপস্থিত হতাম। দাদুরও ততক্ষণে আহ্নিক শেষ। আরম্ভ হতো আমাদের প্রাত্যহিক বিদ্যানুশীলন। একটু পরেই মা আসত খাবার হাতে করে। মাঝে মাঝে দেখতাম, মাকে দেখে দাদুর মুখ কেমন বিরস, করুণ হযে উঠত, চোখের কোলে টল টল করত অশ্রুর বিন্দু।—"খুকু, মা, এ আমি কী করলাম! শেষকালে তোকেও দেখতে হলো এ বেশে? করুণাময় আমার এ কী করলেন, একেবারে অকর্মণ্য করে বাঁচিয়ে রাখলেন এই কষ্ট দেখতে!"

মা তাড়াতাড়ি বলে উঠত,—"এ কী বলছেন বাবা! কষ্ট আমার কোথায়? আমি রয়েছি আমার বাবার কাছে, আমার ঘরে, যা করছি এ তো আমারই কাজ, আমি ছাড়া করবেই বা কে? আপনি আশীর্বাদ করুন বাবা!"

"প্রাণভরেই আশীর্বাদ করছি মা, সুখী হও। কিন্তু কোথায় সুখ? শেষকালে তোমার গয়নাগুলোও নিতে হলো মা! তোমার এত গয়না, আর এখন…!" বলতে বলতে আবেগে দাদুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেতো।

"ও কথা বললে কষ্ট পাবো, বাবা। গয়নার অভাবটা আমার কোথায়? অভাব কী আপনি রাখতে দিয়েছেন? একখানার জায়গায় তিনখানা। সেই বাড়তিগুলো দিয়ে যে আপনি ঋণমুক্ত হয়েছেন, এই তো আনন্দের কথা। আপনার আশীর্বাদে আমার আবার সব হবে। আমার নিখিল মানুষ হবে কমল মানুষ হবে, সেই আমার শ্রেষ্ঠ গয়না, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"

বলতে বলতে মার চোখ মুখ হয়ে উঠত উজ্জ্বল ! মার সেই মহিয়সী রূপ ভুলবার নয় ! সেই ক্ষণিকের আত্মপ্রকাশ আজও আমার স্মৃতির পৃষ্ঠায় অক্ষয় হয়ে আছে !

এই সময় বাবা-মা, উভয়কেই অতি কাছে পেয়েছিলাম। এই সময়টুকুই পলাতকা মায়ের আমার জীবন-দোলনার কাছে চুপি চুপি এগিয়ে আসা— নিবিড স্নেহে ভরিয়ে দেওয়া।

আমি স্কুলে পড়ি। আমার চলাফেরা পড়াশুনা, সব ব্যাপারেই মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কমল তখন ছোট, বাড়ীতেই পড়াশুনা সুরু করেছে। কিন্তু সে ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির, একটু দুরন্ত, সেই বয়সে পড়া ছিল তার কাছে বিভীষিকা বিশেষ। মা রাগ করে তাকে ভীষণ প্রহার করত, আর কোনো কোনো দিন বলত,—"দেখ দেখি, দাদা কেমন ভালো ছেলে, চব্বিশ ঘণ্টা বই নিয়েই আছে, কেমন স্কুল যায়, মাস্টার মশাইরা কেমন ওকে ভালোবাসে ! তুই-ও পড, তুই-ও স্কুলে যাবি, কত বই পডবি, কেমন ?"

বাবার চেহারা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই বাড়ী থাকেন না। কখন যে এসে স্নান করেন, কখন যে খান, কখন যে শুয়ে পড়েন, তার ঠিক ছিল না। চোখে মুখে সর্বক্ষণই কী একটা উদ্বেগের ছাপ, চুল রুক্ষ, কথাবার্তা বলছেন অত্যন্ত অল্প।

একদিন কানে শুনলো মা বলছে, "দেখ, এ চাকরী তুমি ছেড়ে দাও, এত খাটুনী তোমার পোষাবে না, দিন দিন শরীরের যা হাল হচ্ছে !"

বাবা হেসেছিলেন—"খাবো কী ?"

"তুমি ভালো চাকরী খোঁজো। ততদিন খাওয়ার ভাবনা আমি ভাবব। গয়নার কিছু কিছু এখনও আছে।"

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন বাবা,—"একান্ত অনুরোধ, গয়নার কথা তুমি তুলো না। স্ত্রীর গয়নার বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ—ছি !"……

"তা হোক, তা বলে এরকম খাটুনি তোমার……।"

"শুধু চাকরী নয়, আমার আরও অনেক কাজ।"

সত্যিই কাজ। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন বাবা বাড়ীতেই আসতেন না। কয়েকদিন পরে যখন ফিরে আসতেন, যেন ঝড়-লাগা পাখী ! শরীরের রুক্ষতা, পোষাকের মালিন্য দশগুণ বেড়ে গেছে !

যেদিন তিনি আসতেন না, আমাদের বাড়ী সেদিন বিষণ্ণতায় স্তব্ধ। প্রথমে কিছুক্ষণ মা আমাদের পাশে শুয়ে ধীরে ধীরে অনেক কথা বলত—তার অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষার আভাস। আমরা অনেক বড়ো হবো, অনেক টাকা আনব, অনেক সম্মান। আমাদের আগেকার বাড়ির মতই মস্ত বাড়ি হবে আমাদের। ঘুমপাড়ানি গানের মতই শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম অবশেষে। কোন কোন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখতাম, বাবা আসেননি, মা একা একা বালিশে মুখ গুঁজে আকুল হয়ে কাঁদছে! এই সময়টা আমার ভয়ানক ভয় করত। মার কাছে গেলে অথবা ডাকলেই মা এই সময় আগুন হয়ে উঠত আমাদের উপর।—"ডাকিসনি আমায় হতভাগারা, তোরা আমার কেউ না…কেউ না!"

বাবা ফিরে এসে দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য কী কৈফিয়ৎ দিতেন সব সময় শুনতে পেতাম না। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যা থেকেই সুরু হতো আমাদের প্রতীক্ষা। দাদু বারবার উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ নিতেন, "খুকু-মা, বিনয় এলো?"

মা কোনবার উত্তর দিতো, কোনবার দিতো না। রাত বাড়ত। বাবার দেখা নেই। দাদু তাঁর কাষ্ঠ-ফলকটির উপর নির্ভর করে বেরিয়ে যেতে চাইতেন, বলতেন, "খুঁজে আসি।"

"কোথায় খুঁজবেন, বাবা?"

"দেখি পাড়ায় জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা করে। বিনয়দের অফিসে কাজ করে এমন একজনকেও কি কাছাকাছি কোথাও পাবো না?"

"তাতে লাভ কী, বাবা? অফিসে এতক্ষণ নিশ্চয়ই বসে নেই।"

"তাহলে? হয়ত অফিসেরই কাজে কোথায়ও বাইরে পাঠিয়েছে। তুই ভাবিস না মা, ভাবিস না। কিন্তু বিনয় তো একটা খবরটবর দিয়ে যেতে পারে, বলিস?"

"সেটা হয়ত দরকার মনে করে না।"

"বটে! আসুক সে, তাকে আমি আচ্ছা করে বকে দেবো।"

"না, বাবা। সে মানুষ আর নেই। আপনার কথা শুনবে না। মিছামিছি আপনার অপমান আমি সইতে পারব না, বাবা!"

কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে একটি কথাও না বলে দাদু ঘরে চলে যান।

কিছু বুঝি না আমরা। সমস্ত বাড়িটা ঘিরে কী যেন একটা ভয়াবহ আশঙ্কার ছায়াপাত! বাবা মাঝে মাঝে কোথায় যান? কী করেন? দাদুর

পাই না। বাবাও বলেন—কাজ, মাও বলে—কাজ। কি কাজ, কীসের কাজ! বুঝি না।

ক্রমে ব্যাপারটা সয়ে এলো। বাবার মাঝে মাঝে এই ভাবে আকস্মিক অন্তর্ধান, এটা নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র হয়ে দাঁড়াল। মার লুকিয়ে লুকিয়ে কান্নাও আর নেই। এমন কি, এ নিয়ে বাবার সঙ্গে মার যে তর্কবিতর্ক চলত, তাও একরূপ যবনিকায় ঢেকে গেল।

কিন্তু শান্তি নেই। ভয় হলো। ভয়ানক কী একটা যেন ঘটতে যাচ্ছে, এই আশঙ্কাতেই মনটা ভীরু শশকের মত শঙ্কিত হয়ে রইল। মা যেন আবার দূরে সরে যাচ্ছে। বাবাও দূরে,—একটা অব্যক্ত বেদনা ও আতঙ্কে মন মেঘাচ্ছন্ন।

একমাত্র সান্ত্বনা দাদু। কিন্তু দিন-দিন দাদু যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দেখতাম, চুপচাপ নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করে বকে চলেছেন। সব কথা শুনতে পেতাম না, কয়েকটি কথা মাত্র কানে যেতো। "গরীব…ঘৃণা করে…বেশ, না আসুক ওরা!"…

কিন্তু এই যথেষ্ট। বুঝতাম তিনি কী বলতে চান। ঐটুকু বয়সে আমিও বুঝেছি। বুঝেছি যারা কাছে ছিল, তারা কাছে নেই এবং এখন থাকবেও না। প্রথম প্রথম পত্রে কেউ কেউ কুশল জিজ্ঞাসা পাঠাতেন, কিন্তু দাদু দৃঢ়তায় সর্বদাই থাকতেন নিরুত্তর। ফলে, পত্র-সংখ্যা বিরল থেকে হয়ে উঠত বিরলতর।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর দাদু গল্প বলতেন। তীর্থের কাহিনী। বহু তীর্থ ই ঘুরেছেন তিনি। এমন কি, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা হয়ে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত। হৃষীকেশ পর্যন্ত আমিও গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে শৈশবে, ধূ-ধূ মনে পড়ে। কিন্তু তার পর? সেই বিশাল ধ্যাননিমগ্ন গম্ভীর পর্বতশ্রেণী, তার ওপরে কী বিপুল ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে কে জানে!

দাদু বলতেন, "একমাত্র যাওয়া হলো না কৈলাস। দেখা হলো না মানস-সরোবর!" একটু থেমে সুরু করতেন, "হিমালয়ের সেই অদ্ভুত সৌন্দর্য যে দেখল না, সে এদেশে এসে তবে দেখল কী?"

চোখ দুটো ভরে উঠেছে স্বপ্নে, দাদু হাতবাক্স থেকে একটি মলিন ছিন্নপ্রায় ছোট্ট ম্যাপ বার করে মেলে ধরতেন সামনে।—"এই আলমোড়া। এখান থেকে পাহাড়ে পথ সুরু হলো। ধবলছিনা, গনোই, বেণীনাগ, থল, ডাণ্ডীহাট, আসকোট, গারবেয়াং। পথ হলো আরও দুর্গম। বরফের ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়শুদ্ধ কাঁপে, পার হয়ে যায় লিপুধুরা,—নেপাল সীমান্তের কালীনদীর তীর

ধরে ধরে। এর পরে তাকলাখার, পুরাংমণ্ডি, তিব্বতে এসে পড়েছো।
ভীষণাকৃতি হুনিয়া লামাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যাবে! এই দেখ রাবণ-হ্রদ।
মাঝে মাঝে তিব্বতী মঠ বা গোম্পা। তারপর, ঐ দোলমা শিখর—নীচে বরফে-
ঢাকা গৌরীকুণ্ড। এর পুব তীর ধরে এগিয়ে যাও। উষ্ণ প্রস্রবণ। জু-গোম্পা;
তার পরেই ঐ অগাধ বিপুল নীলের আভাস, কী ও? মা-ন-স স-রো-ব-র!"

দাদুর চোখ মুখ একটা অনির্বচনীয় আনন্দের জ্যোতিতে ঝলোমলো।
বিড়বিড় কবে বলে চলেছেন, "যাবো, যাবো, যেতেই হবে!"…

এর পরেই যে ঘটনাটি ঘটল, তার আকস্মিকতার জন্য আমরা কেউই
প্রস্তুত ছিলাম না। আঘাতটা বাজল গভীর ভাবেই। কিন্তু দাদুর পক্ষে তা
হল গভীরতম!

একদিন বৈকালে হঠাৎ বাবা আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন, চুপিচুপি
বললেন, "নিখিল, একটা কাজ করবি?"

"বলুন?"

"চুপিচুপি, কেউ যেন না জানতে পারে, এমন কি তোর মা-ও না।"

একটু ইতস্ততঃ করলাম। মাকে না জানিয়ে! একটু ভয়ও হলো, কিন্তু
তবু বললাম, "কী বলুন?"

"আয়।"

ঘরের ভিতর নিয়ে গিযে ট্রাঙ্কটা খুলে একটা কিসের ক্ষুদ্র পুঁটুলী দিলেন
হাতে। বললেন, "তোর সেই বাণী-পিসীকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের বাড়ী গিয়ে এটা তাকে দিয়ে আয়, বুঝলি, খুব দরকারী।"

"ওদের বাড়ী গেলে মা বকবে না?"

"মাকে জানাবি কেন? বলবি, বাবার এক বন্ধুর বাড়ি গিযেছিলাম,
এই কাছেই।"

রাজী হলাম। কিন্তু কৌতূহল অদম্য। আবার বললাম, "এতে কী আছে,
বাবা?"

"ও কিছু না, সামান্য জিনিষ, তুই বুঝবি না। কিন্তু দেখিস খুলিস না যেন!
আর কোথাও না, একেবারে সোজা ওদের বাড়ি চলে যাবি, কেমন?"

চললাম। বহুদিন পরে ওঁদের বাড়ি যাচ্ছি। এর মধ্যে অনেকবার যাবার
ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু মায়ের নিষেধে পারি নি।

ওপরে উঠতেই দরজার কাছে সেই ফ্রক পরা মেয়েটাকে দেখলাম, যার নাম গৌরী। আগের চেয়ে অনেক বড়ো হয়েছে, দেখতে অনেক সুন্দর। আমাকে দেখে সে চিনতে পেরেছে মনে হলো। একটু যেন হাসি দেখলাম ঠোঁটের কোণে, কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে শুনছি তার কণ্ঠস্বর, —"মা? এসেছে।"

"কে?"

"সেই যে সেই নিখিলদা।"

"কে রে? কে এসেছে?" বলতে বলতে যিনি ওঘর থেকে বেরিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তিনি পিসেমশাই—প্রফুল্লবাবু।

"কী হে, কী খবর?"

প্রণাম করলাম।

"থাক থাক, হাতে ওটা কী?"

"বাবা পাঠিয়ে দিলেন পিসীমাকে দেবার জন্য।"

"বিনয় পাঠিয়েছে? দেখি-দেখি!"

হাত থেকে একপ্রকার কেড়ে নিয়েই দেখতে লাগলেন। পেছনে ততক্ষণে পিসীমা এসে দাঁড়িয়েছেন। কিছুটা শীর্ণ হয়েছেন, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর। পিছন থেকে তাড়াতাড়ি পুঁটুলীটা, পিসেমশায়ের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়েই নিলেন বলা যায়—"ওটা আমার জিনিষ, তোমার এতে কোনো অধিকার নেই।"

বলেই ছুটে গেলেন ঐদিকে, একেবারে রান্নাঘরের ভিতর। পিসেমশাই অর্থাৎ প্রফুল্লবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম ভীষণ হয়ে গেছে তাঁর চেহারা, দুঃসহ ক্রোধে নাসা স্ফীত, চোখে আগুন, মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপরে দ্রুতপায়ে অনুসরণ করলেন বাণী পিসীকে। নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল রান্নাঘরের দরজা কয়েকটি মুহূর্ত উভয়েরই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তারপরেই ঘন ঘন কী একটা শব্দ, সংগে সংগেই চাপা মেয়েলী কান্না; কান্না না বলে আর্তনাদই বলা যায়।

নিশ্চল পাষাণ-খণ্ডের মতই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কীসের টানে যে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম ঐদিকে তা বলতে পারি না। হঠাৎ পিছনে জামায় একটা টান পড়তেই দেখি, সেই মেয়েটা, গৌরী। ইতিমধ্যে ফ্রক ছেড়ে একখানা হলদে ডোরাকাটা কাপড় পরে এসেছে। এক প্রকার ফিসফিসিয়েই বললে, "চলো, আমরা ওদিকে যাই।"

যন্ত্রচালিতের মতই ওর পিছনে পিছনে সিঁড়ির কাছের একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে এসে ঢুকলাম। একরাশ রঙবেরঙের কাপড় পরানো ক্ষুদ্রকায় পুতুল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘরের বাসন-কোশন, উহুন প্রভৃতি। আমি এসব লক্ষ্য করছি দেখে একটু হেসে পাকা গিন্নীর মতই বললে, "দেখছ কী? আমার ঘর। আমার ছেলের বিয়ে আজ, ওবাড়ীর কনকদির মেয়ের সঙ্গে, বুঝলে?"

একটা পুতুল তুলে নিয়ে দেখাতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললাম, "ওঁরা কী করছেন বলো ত?"

গৌরী খুব কাছে এসে দাঁড়াল, মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে চাপা গলায় বললে, "তুমি এখন বাড়ি যাও।"

"কেন, বলো ত?"

"বাবা রেগে গেছে। রেগে গেলে আমাকেও মারতে পারে, তোমাকেও পারে, কাউকে বাদ দেয় না।"

"কেন!"

"আস্তে। রান্নাঘরে মাকে কীরকম মারছে, দেখছ না? ঐ শোনো শব্দ, ঐ শোনো মার কান্না!"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসিয়ে গেল যেন!

"আমি যাব ওদের মধ্যে।"

হাত ধরে টানল, "না, না, যেও না, লক্ষ্মীটি যেও না!"

অবাক হলাম। মেয়েটা এমনই ব্যাকুল হয়ে উঠল যেন সত্যিসত্যিই ওদের মধ্যে চলে গেছি!

গৌরী বললে, "বাড়ী যাও।"

"না।"

শঙ্কিত দৃষ্টি আমার উপর স্থাপিত করে বললে, "তুমি যাও। তোমাকে দেখলে বাবা আরও রেগে যাবে। আমাকেও মারবে হয়ত।"

"তোমাকেও!"

"হ্যাঁ। দেখবে আমার পিঠ? সেদিন একটা বেত দিয়ে…। অথচ আমি কোনো দোষ করিনি!"—বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

অদ্ভুত অবস্থা তখন আমার। ওর হাত ধরে কাছে টেনে বলতে লাগলাম, "কেঁদো না, কাঁদে না, ছিঃ!"

জলভরা দুটি চোখ তুলে ধরল, "কেন তুমি আনলে ঐ পুঁটুলীটা? ওটার জন্যই তো···!"

ওরই জন্য! ওরই জন্য বাণী-পিসীর এই নির্যাতন!···

গৌরী বললে, "বড্ড রেগেছে বাবা। আমাকেও মারবে।"

"পালিয়ে যাও কারুর বাড়ীতে।"

"আরও রেগে যাবে।"

"তাহলে?"

চুপ করে রইল।

"আচ্ছা, গৌরী, তোমার সেই ভাইটি।"

কান্নাভরা কণ্ঠেই উত্তর এলো, "নেই। আজ চার মাস হয়ে গেল।"

এ কী শুনছি! সেই বড়ো-বড়ো কালো-কালো দুষ্টুমী-ভরা চোখ! সেই চমৎকার ছেলে—মণ্টু!···

"কী হয়েছিল?"

"টাইফয়েড।"

আবার চুপচাপ।

ইতিমধ্যে হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। প্রফুল্লবাবুকে বেরিয়ে আসতে দেখেই গৌরী ভয়ে আমাকে একপ্রকার জড়িয়ে ধরল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বারান্দায় এগিয়ে তাঁর সম্মুখীন হতেই অদ্ভুত হিংস্রতায় জ্বলে উঠল তাঁর মুখ,—"এই যে শয়তানের বাচ্ছা শয়তান! কোথায় যাও?"

"পিসীমার কাছে যাবো।"

"সাত জন্মের পিসীমা! বেরো বলছি।"

"না

"তবে রে হতভাগা।"

চকিতে দেখলাম ওঁর হাতের বেতখানা লিকলিকিয়ে উর্ধ্বে উঠল কিন্তু, পড়ল না আমার গায়ে। ঐটুকু মেয়ে গৌরী ছুটে এসে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল। সপাং-সপাং! একটুক্ষণ। তারপরেই বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রফুল্লবাবু গর্জে উঠলেন, "বেরো বলছি। তোর বাবা অপমান হয়ে ফিরে গেছে, এখন নিজে না এসে পাঠিয়েছে ছেলেকে! ব্যাটা শয়তান!"

"আপনি বলবেন না ওসব।"

"বলব না! ঐসব কাগজ পাঠান হয়েছে আমার বাড়ী, আমারই স্ত্রীর কাছে! পুলিশে দেবো! হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাক!"

উত্তেজিত পদক্ষেপে চলে গেলেন।

গৌরীর দিকে চেয়ে দেখি, পিঠে রক্ত! পিঠ থেকে কোমর ছাড়িয়ে বেতের চিহ্ন ধবে ধরে রক্তের ফোঁটা! আমাকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদছে!

"লেগেছে খুব?"

"হুঁ!"

"ওঠো, দেখি ভাল করে।"

উঠল। চোখ মুছতে মুছতে বলতে লাগল, "মার শব্দ পাচ্ছি না কেন? কী হয়েছে চলো তো দেখি?"

বুড়ো রান্নাঘরখানায় ঢুকে স্তম্ভিত হযে গেলাম।

মুখে আঁচল গুঁজে দিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছে। গামছা দিয়ে হাত বাঁধা, পা বাঁধা। কপালের কাছে কেটে গিয়ে বইছে রক্ত। শরীরে প্রচুর বেতের চিহ্ন। নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। পুঁটুলীটা খোলা। ভেতরে কতকগুলি কাগজ ছিল বুঝলাম, সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। আমরা দুজনে ওঁর বাঁধন খুলে দিলাম। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমেই ওই কাগজগুলো কুড়িযে নিয়ে দিলেন জ্বলন্ত উনুনে ফেলে। পুড়ে ছাই হলো।

বর্ণনা দীর্ঘতর করে লাভ নেই। একটু সামলে নিয়ে ধরা গলায় বাণী পিসী বললেন, "নিখিল, বাবা, এখন বাড়ী যাও। আর শোনো: লক্ষ্মীছেলে, কাউকে কিছু বলো না যেন। তোমার মাকেও না, বাবাকেও না।"

সম্মতি জানিয়ে ভারাক্রান্ত মুহ্যমান মন নিয়ে বাড়ী এলাম। গভীর রাত্রে বাবা ফিরে এসে জাগিযে তুললেন আমাকে ঘুম থেকে। বললেন, "কী রে, দিয়ে এসেছিস?

"হ্যাঁ।"

"কার হাতে দিলি?"

"পিসীমার হাতে।"

আর কিছু বললাম না। বাণী পিসীর কথা রাখলাম। মনে হচ্ছিল ওঁর কোনো উপকারে আসাই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর ওঁর আদেশ মেনে নেওয়া মানেই ওঁর উপকারে আসা এ কথাও মনে হয়েছিল।

একটা অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমার রাত কেটেছিল সেদিন। ভাবছিলাম। নানাবিধ প্রশ্নের ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠছে মনে, নানান প্রশ্ন, নানান কৌতূহল। বাণী পিসীকে, গৌরীকে, কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট করে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম কে জানে!

কিন্তু আশ্চর্য, সে রাত্রে গৌরী না, বাণী পিসী না, স্বপ্ন দেখলাম আমারই সহপাঠী একটি ছেলেকে, নাম সমর। সুশ্রী, সুগৌর। ভয়ানক দুরন্ত। তাকে দেখছি। যেন সেই স্কুল-ঘরে। একটানা সে আমাদের বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বেঞ্চিগুলি ঠেলে দিয়ে ছেলেদের হাত ধরে ঘরের বাইরে দিচ্ছে এগিয়ে, দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠছে, "বন্ধুগণ! বেরিয়ে এসো, কাজ করবার সময় এসেছে!"

ছেলেরা হৈ-হৈ করে তার কথায় আসছে বেরিয়ে। বিপুল কলরব হঠাৎ সে আমার হাত ধরে প্রবল ঝটকা দিলে, ধমকে বললে, "বেরি আয়!"...

আমিও আসব না, সেও ছাড়বে না।

ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি, বেশ বেলা হয়ে গেছে। মার মাথায় ঘোমটা অনুচ্চকণ্ঠে হাত ধরে ডাকছেন, "এই খোকন, শীগগির ওঠ্!"

উঠঁতেই দেখলাম, ঘরের মধ্যে অনেক লোক। খাকি রঙের প্যাণ্ট টুপি পর একটি লোকের সঙ্গে বাবা কথা কইছেন, আর কয়েকজন আমাদের জিনিষ-পত্র বাক্স, তোরঙ্গ, উলটে তচনচ্ করছে। ব্যাপারটা যখন আরও একটু পরিষ্কা বুঝলাম, তখন ভয়ে আতঙ্কে হতভম্ব আড়ষ্ট হয়ে গেছি। প্রফুল্লবাবুর গর্জন মনে পড়ল, "পুলিশে দেবো ব্যাটাদের, শয়তানের দল!" চেয়ে দেখি, পুলিশ সত্যি ক্ষুদ্র বাড়ীখানা ঘিরে ফেলেছে! মার কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললাম. কেন এনেছে! ওরা আমাদের কী করবে!

কী করল, একটু পরেই দেখতে পেলাম। বাইরে বিপুল জনতা। দরজা কাছে মার সঙ্গে এসে দেখলাম, বাবাকে নিয়ে সেই খাকি-পোষাকপরা ভদ্রলো একখানা ছাদখোলা মোটরে উঠতে যাচ্ছেন। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, বাবা হাত বাঁধা এক টুকরো শিকলে। আমাদের কাঁদতে দেখে একবার এগি এলেন, হাসিমুখেই কী যেন বলে বিদায় নিয়ে মোটরে উঠলেন। জনতা চীৎকা করে উঠল। কোথায় যেন শাঁখও বাজল। ওপাশে দোতলা বাড়ীর জানা থেকে মেয়েরা ফুল ফেলে দিলেন। অনেকে বাবার গলায় দুলিয়ে দিলেন ফুলে

মালা! আমাদেরও অশ্রু কখন গেছে শুকিয়ে, হতবাক হয়ে চেয়ে আছি! কই, কারুর মুখেই তো অনুকম্পার চিহ্ন নেই! বাবা যেন কোনো রাজ্য-জয় করা বীর! উন্মুখ জনতা অভিনন্দনই জানাতে এসেছে!

মোটর ছেড়ে দিলো। জনতা চেঁচিয়ে উঠল—"বন্দে-মাতরম্!"

অবলুপ্ত চেতনায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কতক্ষণ যে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, কখন যে সম্মুখের দীর্ঘ কালো পথ থেকে কোলাহল মিলিয়ে গেল বলতে পারব না; অকস্মাৎ পিছনে ঘরের মধ্যে একটা ভার পতনের শব্দে চমক ভেঙে গেল আমাদের। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, জানালার কাছ থেকে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন দাদু।

॥ তিন ॥

অনেক উদ্বেগ, অনেক চেষ্টা, অনেক যত্নের পর দাদু উঠে বসলেন। কিন্তু যা ওঁর হলো, তা মর্মান্তিক। অতি বেদনার সঙ্গেই লক্ষ্য কবলাম, ওঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। নানা দিক দিয়েই লক্ষণ প্রকাশ পেতো। কোন কোন দিন হঠাৎ কাষ্ঠফলকের ওপর ভর দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইতেন।

"এ কী, কোথায় যাচ্ছেন!"

তির্যক চক্ষে একবার দৃকপাত করে গভীর কণ্ঠে বলতেন,—"কৈলাস।"

আমরা অনেক কষ্টে এক প্রকার জোর করেই ফিরিয়ে আনতাম। দুঃসহ অন্তর্বেদনায় যেন ওঁর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত মনে হতো। নিতান্ত অসহায় দুঃখীটির মতই কেঁদে ফেলে বলতেন,—"যেতেও দিবি না! কেন, কি করেছি তোদের!"

এই ঝটিকাচ্ছন্ন দুর্দিনকে ভুলবার নয়। প্রথম প্রথম বাবার সহকর্মীদের মধ্যে দু'একজনকে আসতে দেখতাম, পরে তাঁরাও আর আসতেন না, বোধ হয় বাবার মতই হয়েছিল তাঁদের অবস্থা তখন। কিন্তু তারপর? কোন দিকে কোন সহায় নেই, বন্ধু নেই, অবলম্বন নেই। একদিকে এক উন্মাদ, অপরদিকে এক বালক আর এক শিশু। মাথায় ওপর দুঃসময়ের দুর্বিসহ নিঃসঙ্গতা। তথাপি অসীম দুঃসাহসে সংসারের হাল ধরে রাখল আমার মা। নিল না কারুর আশ্রয়, প্রার্থনা করল না কারুর সাহায্য, গ্রহণ করল না কারুর দয়া ভিক্ষা।

বিশ্বস্ত প্রৌঢ়া মানদা ঝি, আর বালক আমি, আমাদের অবলম্বন করেই দৃঢ় পদে সংসারের পথে পা ফেলল।

মায়ের খরদৃষ্টি আমার ওপর বেশী করে পড়ল। স্কুলে ঠিকসময়ে যাওয়া এবং ঠিক সময়ে আসা, এছাড়া কোথাও যাবার আমার হুকুম ছিল না। যদিচ, এর প্রয়োজন ছিল না। আমি স্বভাবতই ছিলাম নিরীহ, শান্ত, নির্জনতা-প্রিয়; হৈ-চৈ-হুজুগ আমার ভাল লাগত না মা একথা জানত, তথাপি তাঁর সাবধানতার সীমা ছিল না। প্রায়ই আমাকে বলত, "খোকা, তুই-ই আমার এখন একমাত্র ভরসা। তুই যেন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিশে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে যাস না, বাবা। দেখছিস ত সংসারের হাল। তোকে যে পড়াশুনা করে মানুষ হয়ে উঠতে হবে, বাবা।"

বুঝতে পারছি মায়ের কথা। কিন্তু যে প্লাবন এসেছে আমাদের দেশের মধ্যে তার থেকে কেমন করে সত্যসত্যই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখি!

স্কুলে হঠাৎ যেন রাতারাতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠলাম। যারা মিশত না, তারাও এলো ভীড় করে কাছে। সেই ভীড়ের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে—সমর।

"তুমি বিনয়বাবুর ছেলে। এসো, রাস্তায় বেরিয়ে এসো, ছেড়ে দাও স্কুল তুলে নাও আমাদের জাতীয় নিশান। বলো ভাই, বলো—'বন্দে-মাতরম্'!' ছাত্রের দল চীৎকার করে উঠল,—'বন্দে-মাতরম্!'

প্রচণ্ড একটা ঢেউ এলো। সমস্ত অন্তরটা যেন খাপে ঢাকা এক খণ্ড ধারাল ইস্পাত-ফলকের মত ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। রুদ্ধ আবেগের গুমরে ওঠা ঘূর্ণি! তারই আবর্ত নিমেষে টেনে নিয়ে গেল স্কুলের প্রাঙ্গণ থেকে। প্রথম উত্তেজনা ঈষৎ স্তিমিত হয়ে আসতেই লক্ষ্য করলাম, স্কুলের সেই ক্লাশঘরের বেঞ্চিতে বসে নেই, বসে আছি ছাত্রদের এক বিশাল জনতার মধ্যে! স্তব্ধ জনতার সম্মুখে একটি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আবেগময় কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে এক তরুণ, পরণে খদ্দর, মাথায় গান্ধী-টুপি, টুপির এক পাশে জাতীয়তার ত্রিবর্ণ চিহ্ন চিনতে পারলাম। আমাদের স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। সন্তোষদা। বলবার ক্ষমতা আছে। ছাত্রদল মুহুর্মুহু হাত তুলে সমর্থন-সূচক ধ্বনি তুলছে।

কিন্তু আশ্চর্য আমার মন! এই ভীড়ের মধ্য থেকে কখন অলক্ষ্যে চলে গেছে দূরে! সমস্ত জনতা চোখের সামনে হয়ে গেল ঝাপসা,—বক্তৃতার ভাষা হয়ে গেল অস্পষ্ট, ভেসে উঠেছে আমাদের স্কুলের সেই ক্লাশ ঘরখানি। এতক্ষণে ভূগোলের শিক্ষক অনাথবাবু ক্লাশে এসেছেন নিশ্চয়। সেই আশ্চর্য শাদ

মানুষটি। বয়স হয়েছে। কোথায় যেন দাদুর সঙ্গে উনি এক ভূগোল বিবরণের মধ্যে তন্ময় হযে গেছেন, চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন স্বপ্ন দেখছেন! ভযানক ভালবাসতেন আমাকে। জনবিরল ক্লাশে এসে ওঁর স্বপ্নিল দৃষ্টি যেন এতক্ষণ আমাকেই খুঁজছে!

বিশাল গভীর অবণ্যে লিভিংস্টোন পথ হাবাল। প্রখর মধ্যাহ্ন। অথচ সমস্ত বনটা রাত্রির মত অন্ধকার। মাথার ওপবে শাখাপ্রশাখায ঘন আর বিস্তীর্ণ পত্রের চন্দ্রাতপ মেলে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ বনস্পতি। হঠাৎ কানে এলো, ও কীসের শব্দ! যেন গভীব আনন্দে কলকল্ কবে উঠেছে বনপরীর দল। শ্রান্ত আহত দেহে এলো জোযাব। পথ-বিপথ আপদ-বিপদ সমস্ত হেলায লঙ্ঘন কবে ছুটল সে। আবও একটু দূবে। ঘন ডাল-পালা সবিয়ে অতি কষ্টে এগিযে যেতেই সুকঠিন বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হযে গেল। গভীব উত্তাল ফেনিল নীল উত্তুঙ্গ জলবাশি! তারই মধ্য দিযে নীলাভ আনন্দেব ধারা চঞ্চল হয়ে ছুটে চলল। পবিপূর্ণ আনন্দেব মগ্ন চেতনায আবিষ্কারক স্তব্ধ। হলো নামকবণ। সেই উজ্জ্বল উদ্বেল অপূর্ব সৌন্দর্যেব নাম ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল লিভিংস্টোন: ভি-ক্টো-রি-যা জ-ল-প্র-পা-ত!

অনাথবাবুর সেই স্বপ্ন-জড়ান আশ্চর্য কণ্ঠস্বব এখনো শুনতে পাচ্ছি যেন! গহন অবণ্য, লিভিংস্টোন, ভিক্টোবিযা জলপ্রপাত! সবই চোখের সামনে জেগে উঠছে!

চলছে বক্তৃতা। সবার অলক্ষ্যে চলে এলাম বাইরে। কী জানি কেন ভাল লাগছিল না। ধীরে ধীরে স্কুলে এসে আমাদের ক্লাশঘরেব সামনে দাঁড়ালাম। কিন্তু এ কী? ঘর বন্ধ। চারিদিকে চেয়ে দেখি সমস্ত স্কুলটাই স্তব্ধ। ছুটী হয়ে গেছে। দ্রুতপায়ে ফিবে চললাম বাড়ি।

গল্লির মোড়েই মানদা-ঝির সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখামাত্র আমাব বাহুমূল আঁকড়ে ধরে ফেলল বুড়ি।

"কোথায় গেছলে গো দাদামণি, মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে।"

"কেন রে! আমি তো স্কুলে গিযেছিলাম।"

"না দাদামণি, তুমি ইস্কুল পেলিযে মিটিন্ কবতে গিয়াছিলে গো, ঐসব স্বদেশী ছেলেগুলার সঙ্গে!"

চমকে উঠলাম! মার কানে গেল কী করে?

"যাঃ! বাজে কথা! কে বললে রে?"

"ও বাড়ীর কাশী বললে গো। সে ছুটীর পর বাড়ী এসতেছেল, মা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সব বলে দিলে!"

কাশী আমাদের স্কুলেই পড়ে, আমার এক ক্লাশ নীচে। বললাম, "ভারী করেছে বলে দিয়ে! গেছি তো কী হয়েছে? ওরকম সবাই যায়!"

ঘরে পৌছাতেই মা উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। চোখ দিয়ে ঝর্ঝর্ করে জল পড়ছে, মা বলতে লাগল, "খোকা, শেষকালে তুই-ও! তুই-ও আমাদের দুঃখ বুঝবি না! তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে সংসারের ভার নিবি তুলে, এই আশা নিয়েই যে তোর মুখপানে চেয়ে আছি বাবা! তোর কি সাজে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হৈ-হৈ করা! ওসব সাজে তাদেরই, যারা বড়লোক, যাদের পয়সা আছে, যাদের ভাবতে হয় না দিনে দু'মুঠো অন্ন কেমন করে আসে!"

মা একটু শান্ত হলে বললাম, "কিন্তু মা, সবাই যে বলে, এ দেশের কাজ, বড়লোক, গরীব—সকলেরই এ কাজ করা উচিত!"

"দেশের কাজ!"—অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে জলে উঠল মার চোখ,—"লেখাপড়া শেখাটা দেশের কাজ নয়? পুত্র-পরিবারের মুখে অন্ন দেওয়া, দেশের কাজ নয়? পরিবারের পর পরিবার যদি অন্নের অভাবে শিক্ষার অভাবে মারা যায়, দেশ বাঁচবে কাকে নিয়ে? যারা এই দায়িত্বকে এড়িয়ে দেশের কাজ করবার নামে হৈ-হল্লা সভা-সমিতি করে ভেসে বেড়ায়, তাদের কাজকে আমি দেশের কাজ বলি না, তারা দেশের শত্রু!"

"কিন্তু মা, বাবা…।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বাবার কথাই বলছি। কী সে করেছে? জানত না তার মাথার ওপরে কী গুরুভার রয়েছে? যাদের খুসী তারা তার মাথায় ফুল জড়িয়ে দিক, আমি দেবো না, আমি জানি সে কর্তব্য-ভ্রষ্ট!"

নূতন-শেখা যুক্তি-তর্কের স্নায়ু-উত্তেজক বহু বুলিই জিহ্বায় এসেছিল, কিন্তু কিছুই বলা হলো না। মায়ের অশ্রু-সজল অথচ দৃপ্ত মুখখানির দিকে চেয়ে মনে হলো, মা যা বলছে, সেই-ই সব থেকে যুক্তিপূর্ণ! খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে ধীরে ধীরে বললাম,—"আর কখনও ওদের সঙ্গে যাবো না, মা।"

"তা হোক বাবা। তোমার আর ও-স্কুলে গিয়ে দরকার নেই। আমার মাসতুতো ভাই প্রভাতদাদা মফঃস্বলের এক স্কুলের হেডমাস্টার, আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি তাঁকে, তুমি সেখানে চলে যাও, তাঁর ওখানে তাঁর কাছে থেকেই তুমি পড়বে।"

এ কী কথা! ছাড়তে হবে এই স্কুল, এই সহর, মা, দাদু, কমল, সবাইকে! অন্তর কেঁদে উঠল,—"না, মা, না। আমি যাব না, আমি এখানেই থাকব।"

"এখানে থাকলে তোমার পড়া হবে না নিখিল। শেষকালে তোর বাবার মত···।"—আবেগে মার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

"না মা, আমি আর ওদের সঙ্গে মিশব না, ওদের সঙ্গে কোথাও যাবো না, শুধু পড়াশুনাই করব!"

এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ রেখে মা বলল, "ঠিক?"

।"

"তাহলে আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।"

তাই করলাম।

এতক্ষণে হাসি ফুটল মায়ের মুখে। বলল, "এই তো আমার ছেলের মত কথা। এবার হাতমুখটুখ ধুয়ে ওঘরে দাদুর কাছে যাও!"

গেলাম। জানালাব দিকে মুখ করে বিছানার ওপর বসে আছেন। খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ীতে মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন। চোখের নীচে গভীর কালি-রেখা। কপালে, চোখের পাশে, নাসার কাছে কুঞ্চন। বড়ো বড়ো যত্নরহিত চুলে জট পড়েছে। কী যেন আপন মনে বকছিলেন বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ঠোঁটের ফাঁকে পড়ছিল মৃদু হাসির রেখা। সামনে কতকগুলি বহু পুরাণো মলিন খবরের কাগজ সযত্নে ভাঁজ করা। মাঝে মাঝে একটা পেনসিল দিয়ে কী যেন আঁকিবুকি কাটছেন তার ওপর, আর চলছে বিড় বিড় করে বকা, আর মাঝে মাঝে অকারণ একটু হেসে ওঠা! আমাকে দেখেই আগ্রহে দুখানা হাত ঈষৎ আন্দোলিত করে বলে উঠলেন,—"দাদু ভাই, কাব্য! মহাকাব্য!"

"কীসের, দাদু?"

হা-হা করে হেসে উঠে ভাঁজ-করা কাগজগুলো দু'হাতে তুলে সামনে ধরে বললেন, "আমি যে মহাকাব্য রচনা করছি! ম-হা-তী-র্থ! সমস্ত আর্যাবর্তের তীর্থ বিবরণ, বিরাট কাব্য, বুঝলে দাদুভাই? কামাখ্যা থেকে দ্বারকা, রামেশ্বর সেতুবন্ধ থেকে কৈলাস।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, ভঙ্গী হয়ে গেল বিষাদময়, দুচোখ ভরে ফুটে উঠল অশ্রুর বিন্দু, দীর্ণ করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দাদুভাই, এবার আর কৈলাস যাওয়া হলো না, নিদারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে, এখন লিপুধুরার পথে পড়লে ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে যেতে হবে! দাদুভাই, তুমি কালীনদী দেখেছ?

ওঃ! কী ভীষণ গর্জন! মাঝে মাঝে দস্তুরমত ভয় করে ওঠে!"...শিউরে দু'চোখ বুজলেন।

কয়েকটা দিন পরে। কোনো এক প্রখ্যাত নেতার বন্দীত্ব উপলক্ষে ব্যাপক হরতাল স্বরু হয়েছে। আমাদের স্কুলেও তার ঝঞ্ঝনা এসে বাজল। ক্লাশঘরের মধ্যে আবার ছুটে এল সমর, সন্তোষদার দল। ধ্বনি উঠল—'বন্দে-মাতরম্!' ছেলেদের হাত ধরে তারা বাইরে টেনে আনতে লাগল। আমার হাতে টান পড়তেই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলাম। সামনে এসে দাঁড়াল সমর! বলে উঠল, "কাপুরুষ! লজ্জা করে না? যার বাবা জেলের মধ্যে পচে মরছে, তার সাজে এই ভাবে পালিয়ে বেড়ান! ছিঃ!"

যেন চাবুক খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আবার স্বরু করল সমর,—"মরে যাচ্ছে না লেখাপড়া! তোমার বাবা বিনাবিচারে বন্দী—পারো না জোর গলায় প্রতিবাদ জানাতে? বইয়ের পোকা হয়ে বই শুঁকে শুঁকে বেড়ানর সময় এই নয়। বাইরে এসো, জোর গলায় তোমার বাবার মুক্তির দাবী জানাও!"

আবার রক্তের স্রোতে সেই অদ্ভুত অনুরণন! ভুলে গেলাম ঘর, বাড়ি, স্কুল, মার অনুনয়। উচ্চ কণ্ঠে স্বর মেলালাম,—"বন্দে-মাতরম্!"

চাই, চাই, বন্দীদের মুক্তি চাই!

বাইরে এলাম। আজ এসেছে সকলেই। সেই বিশ্বাসঘাতক কাশী, সে-ও আজ জনতার মধ্যে! সমস্ত দলটি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সার দিয়ে অনতিদূরের বড়ো পার্কটার অভিমুখে এগিয়ে চলল।

বিরাট ছাত্র সভা। বহু জ্বালাময়ী বক্তৃতা চলেছে। একসময় হঠাৎ পাশ থেকে একটা ভয়ানক কোলাহল উঠল। জনতা ছত্রভঙ্গ। কানে একটি কথা মাত্র প্রবেশ করল,—"পুলিশ!" হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই আছি। দেখতে দেখতে ভিড় গেল ফিকে হয়ে, দু'জন শুভ্র বেশধারী সার্জেন্ট আর লাঠি হস্তে পাহারাদার-দল নিমেষে ঘিরে ফেলল আমাদের! সংখ্যায় আমরা প্রায় তিরিশটি ছাত্র। ওদের নির্দেশ অনুযায়ী ধীর শান্ত পদক্ষেপে আমরা থানার দিকে চললাম।

অন্ধকার হাজত কক্ষ। ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর মিলিয়ে আসতেই মনে হলো, এ কী করলাম! এ ত আমার করবার কথা নয়! রুক্ষ কম্বলের শয্যায় শুয়ে মার অশ্রু-ঝরা দুটি চক্ষের ব্যাকুল মিনতি মনে পড়ল, মনে পড়ল কমলকে,

দাত্নকে। মা এখন কী করছে ? হয়ত কাছে সান্ত্বনা দেবার মতও কেউ নেই। আর দাত্ন ? না, আর না, আর কখনো হবো না মার অবাধ্য। এবার ছেড়ে দিলেই ক্ষমা চাইব মার কাছে। মার কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বলব, এবারটি ক্ষমা করো মা, আর কখ্খনো এমন হবে না। কিন্তু এরা যদি ছেড়ে না দেয় ? আমার মা কার মুখ চেয়ে দুঃখে বুক বাঁধবে ? কে থাকবে দাত্নর কাছে, কে শুনবে দাত্নর অন্তরের কল্প-কাহিনী !

কিন্তু ঈশ্বর করুণাময় ! দু'রাত পরেই ওরা ছেড়ে দিলো। আঃ ! বাঁচলাম ! মাথার ওপরে সাদা মেঘের ভেলা-ভাসানো নীল আকাশ, সোনার মত রৌদ্রের দীপ্তি, মায়ের আদরের মতই ঝিরঝির বাতাস ! পৃথিবীকে যেন নূতন করে দেখছি !

বাড়ী পৌছালাম একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই। মা, মাগো ! আমাকে চেপে ধরো তোমার বুকের মধ্যে। তোমার স্নেহের অমৃতধারায় আমি নূতন করে স্নান করি !

দরজা বন্ধ। কয়েক বার ঘা দিতেই খুলে গেল। দরজার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে —মা। চোখে ব্যাকুলতার চিহ্ন মাত্র নেই, স্থির গম্ভীর দৃষ্টি। আপাদমস্তক আমার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। কিন্তু কই, এখনো তো দু বাহু মেলে নিলো না কাছে টেনে !

"কোথায় ছিলে ?"

বললাম।

"তুমি না আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে ওসব দলে মিশবে না ?"

আমি নিরুত্তর।

"উত্তর দাও ?"

"হ্যাঁ।"

"সে প্রতিজ্ঞা রাখবার চেষ্টা তোমার মোটেই নেই, কেমন ?"

আমি স্তব্ধ।

"মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা, তার দাম তোমার কাছে কিছুই না !"

আরও একটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত।

"যে-ছেলে মাকে অবহেলা করে, মার মর্যাদা রাখতে জানে না, তার স্থান এবাড়ীতে হবে না। তুমি যেখানে খুসী চলে যেতে পারো।"

মুখের সামনে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

রুদ্ধ অভিমানে চোখ ফেটে জল এলো। দরজা থেকে দ্রুত পায়ে চলে এলাম রাস্তায়। অনুতপ্ত ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে এসেছিলাম মায়ের কোলে, কিন্তু কোথায় মা? স্নেহ-বুভুক্ষু সন্তানকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে গিয়ে নির্মম হস্তে দূরে ঠেলে দেওয়া! এই কি আশা করছিলাম স্নেহময়ী মার কাছে?

না, আর ফিরব না! রাস্তা ধরে উদ্দেশহীন ভাবে চলতে চলতে ভাবলাম, চলে যাবো বহু দূর। কেউ পাবে না আমার উদ্দেশ! নাই বা পেলাম কারুর স্নেহ, নাই বা কাছে এসে দাঁড়াল কেউ!

চলতে লাগলাম। গলাটা শুকিয়ে গেছে, একটু জল পেলে হ'তো। বড় রাস্তার মোড়টা ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে ডানহাতি একটা পার্ক। পার্কের ধারে ফুটপাথের ওপরই পেয়ে গেলাম জলের কল। হাতের বইগুলো তখনো সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। ওগুলো নামিয়ে রেখে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিলাম। আঃ!

কিন্তু তারপর? আস্তে আস্তে পার্কটার মধ্যে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া স্টেশন। তারপর ট্রেণে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী! কিন্তু ভাড়া? অতি দুঃখেও হাসি এলো। একটা পয়সা বলতে পকেটে কিছু নেই।

হঠাৎ একটা কোলাহল হৈ-চৈ কাণে যেতেই চোখ তুলে সামনে তাকালাম। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, আমার সামনেই একটা সভা হচ্ছিল। মেয়েদের সভা। মধ্যখানে বাঁশের মাথায় উড়ছে জাতীয় পতাকা, তাকে কেন্দ্র করেই বিচিত্রবেশা খদ্দরধারিনীদের দল। কিন্তু সবাই এমন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে কেন? সভা ভঙ্গ হলো? অথবা পুলিশ নয় তো? কথাটা মনে হতেই উঠে পড়লাম।

অনতিদূরেই লোহার রেলিং-এর ঘূর্ণায়মান গেট। গেটটা ঠেলে পার হয়ে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। পরনে খদ্দর, ব্লাউজের সঙ্গে পিন আঁটা জাতীয়তার ত্রিবর্ণ চিহ্ন,—বাণী-পিসী সস্মিত মুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

"পিসীমা!"

এগিয়ে এসে সস্নেহে স্পর্শ করলেন আমাকে।

"এদিকে যে? বেড়াতে এসেছিলে বুঝি?"

"হ্যা।"

"মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এসো আমার বাড়ীতে। এই কাছেই।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই উনি হেসে উঠলেন, বললেন, "নতুন বাড়ীতে উঠে এসেছি। এসো না?" আমার হাতখানা সজোরে চেপে একপ্রকার টেনেই ওঁর নতুন বাড়ীর অভিমুখে নিয়ে চললেন আমাকে।

॥ চার ॥

কাছেই বাড়ী। রাস্তা পার হয়ে একটা গলির মধ্যে—এক প্রান্তে। মাঝারী আকারের দোতলা বাড়ী। একতলায় এক কোণের ঘবেব সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। দরজায় তালা লাগানো ছিল। দরজা খুলতে খুলতে বাণী-পিসী বললেন, "এই আমার ঘব, এখানেই আমি থাকি।"

ঘর খুলে গেল। উনি বললেন, "তুমি বসো বাবা, আমি এখুনি আসছি।"

"পিসীমা?"

"কি বাবা?"

"গৌরী?"...

মুখে ম্লান মৃদু একটু হাসি ফুটল, "সে তো আর আমার কাছে থাকে না! বলব বাবা, তোমাকে সবই বলব। আসছি।"

মূঢ়ের মতো বসে রইলাম অন্তরে অদম্য কৌতূহল নিয়ে। ঘরখানি ছোট্ট, কিন্তু চমৎকার। এক পাশে ছোট্ট খাটে বিছানা পাতা, একটা হলদে রঙের খদ্দরের চাদর বিছান। তারই ওপর বসে আছি। আলনায় খানকয়েক শাড়ি, সেমিজ, বোধ হয় সবই খদ্দরের। মেঝের এক কোণে একটি চরকা, কিছু তুলো কিছু সুতো। দেয়ালে চতুর্ভুজ বিষ্ণু, কয়েকজন বিখ্যাত দেশনেতা।

পিসীমা এলেন। একহাতে রেকাবীতে কিছু খাবার, অপর হাতে গ্লাসে জল। মেঝেতে নামিয়ে রেখে একখানা আসন দিলেন পেতে। বললেন, "নিখিল, বাবা, খেয়ে নাও।"

ক্ষুধার্ত সত্যই, তবু অনভ্যস্ত পরিবেশে কিছু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তকাল আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সস্নেহ মৃদুহাস্যে উনি বললেন, "লজ্জা কী বাবা, খাও?" বলেই একখানা গামছা টেনে নিয়ে বাইরে গিয়ে সেটা

ভিজিয়ে আনলেন। তারপরে কাছে এসে আমার মুখ-চোখ ভাল করে মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে বসালেন আসনে, বললেন, "খাও বাবা। খেতে খেতে তোমার পিসীমার গল্প শোনো।"

"বলুন পিসীমা!"

বলতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে একটু হেসে উঠলেন, কান্নার মধ্যে মানুষ হঠাৎ যেমন করে হেসে ওঠে।

"বলব কী বাবা! অবশ্য তুমি বড়ো হয়েছো, তোমাকে বলতে বাধা নেই।"

কয়েক মুহূর্ত মুখ নীচু করে কী ভেবে আবার মুখ তুললেন,—"কিন্তু তার আগে, নিখিল, তোমার বাবা—আমার নতুনদার খবর কিছু জানো?"

"তিনি জেলে।"

"জানি। আর জানতে গিয়েই তো আমার আজ এই অবস্থা, বাবা।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তাঁর দিকে তুলে ধরলাম। ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি টেনে এনে তিনি বললেন, "ভালই হয়েছে। বেঁচেছি আমি।"

আবার স্তব্ধতা।

জানালার বাইরে দূর আকাশের দিকে ওঁর দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে দৃষ্টি ফিরল আমার দিকে, উনি সুরু করলেন, "জানো নিখিল, নতুনদার ঐ খবর শুনে আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। চলে গেলাম জেলখানার গেটের কাছে। গেলাম বললে ভুল বলা হলো, কে যেন টেনে নিয়ে গেল জোর করে। কিন্তু হায়রে ভাগ্য, দেখা হলো না। আমার পৌছবার আগেই লোহার কবাট বন্ধ হয়ে গেছে। পরে অবশ্য কর্তাদের অনুমতি নিয়ে অনেক কষ্টে একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

"দেখা হয়েছিল? বাবা কী বললেন?"

"বলবেন আর কী? তিনি মহৎ, সাধারণ দুঃখ-কষ্টের তিনি অতীত। হাসি মুখেই কথা কইলেন। এবং তোমরা যে দেখা করতে যাওনি, তার জন্য একটুও দুঃখ প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল, নিখিল।"

"এইবার তাঁকে দেখতে যাবো পিসীমা, আমাকে নিয়ে যাবেন?"

ম্লান হাসলেন, বললেন, "আর তো দেখা পাবে না, বাবা। ওঁকে যে কলকাতার বাইরে নিয়ে গেছে। কিন্তু এতদিন যাওনি কেন, নিখিল?"

একটা রুদ্ধ অভিমান গুমরে উঠল অন্তরে, কণ্ঠ গেল কেঁপে, চোখের কোল উঠল ভিজে, বললাম, "মা যেতে দেয়নি।"

"দেয় নি ?"

"না।"

আবার নিস্তব্ধতা।

"তিনি নিজেও যান নি ?"

"না।"

"আশ্চর্য !"

কিছুক্ষণ চুপ। বললেন, "যাই হোক, ভেবো না বাবা, তিনি ভালই আছেন আর ভালই থাকবেন। তাঁর থাকবার ব্যবস্থা ভালই করা হয়েছে।"

কয়েকটি মুহূর্ত আবার নিশ্চুপ।

বললেন, "তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমাকে বললেন মাঝে মাঝে তোমাদের খবর নিতে। কিন্তু কী দুর্দৈব দেখ, তোমাদের বাসাও আমি চিনি না, আর তাঁর কাছ থেকে ঠিকানাটা চেয়ে নিতেও ভুলে গেলাম। কী ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হলো নিখিল, এইবার তোমাদের বাসায় যাবো।"

আমি স্তব্ধ।

বোধ হয় ততটা লক্ষ্য করলেন না আমাকে, বলে চল্লেন,—"যাই হোক, এবার যা বলছিলাম। নতুনদার সঙ্গে জেলের ফটকে দেখা করতে যাচ্ছি, এ খবর তোমার পিসেমশায়ের কানে উঠেছে। তারপর যা হলো তাতো বুঝতেই পারছ নিখিল, নমুনা তো তুমি নিজের চোখেই দেখে এসেছ একদিন।"

"মারলেন ?"

ম্লান হাসলেন, "তুমি বড়ো হয়েছ, তোমাকে বলতে আর বাধা কী। আমার জন্য কথা নয়, কিন্তু ঐ কচি মেয়েটার ওপর যা অত্যাচার হলো, তা মর্মান্তিক।"

"গৌরী ?"

"হ্যাঁ। লোক-জানাজানি, কেলেঙ্কারীটা পর্যন্ত সেদিন হয়ে গেল। জানো ? পাড়ার জনকয়েক ভদ্রলোকের সামনে দস্তুরমত অপমান করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

এতক্ষণে ওঁর গলা ধরে এলো, চোখে এলো জল। অশ্রুব্যাকুলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "তাড়িয়ে দিক তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু, মিথ্যা দোষারোপ !

তা-ও আমাকে যত খুসী বলুক, সয়ে যাবো, কিন্তু শেষকালে নতুনদার নামে!
ছিঃ ছিঃ! ওরা জানে না, চেনে না নতুনদাকে।"

আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তবুও আসনে বসে আছি, নিশ্চল, স্তব্ধ।

আঁচলে চোখ মুছে বলতে লাগলেন, "তোমায় বলব কী নিখিল, মেয়েটাকেও আমায় দিলে না।"

"গৌরী এখন কোথায় পিসীমা?"

"সেই বাড়ীতেই। তার বাবার কাছে।"

"আমি একদিন যাবো।"

"না বাবা, তা হলে আরও মুস্কিল হবে। লোকটাকে তো আমি চিনি!"

"আপনাকে ছেড়ে গৌরী থাকতে পারবে?"

"পারবে বাবা, ক্রমে সব সয়ে যাবে। তাছাড়া কিছুদিন পরেই নাকি তার নতুন মা-ও আসছে, শুনছি।"

"নতুন-মা!"

ঠোঁটের কোণে আবার তাঁর হাসির রেখা ফুটল, "তোমার পিসেমশায় আবার বিয়ে করছেন যে!"

আবার স্তব্ধতা।

কী যেন ভাবতে ভাবতে ওঁর অশ্রুভেজা মুখখানি হাসির আভায় ঝিলমিলিয়ে উঠল; বলতে লাগলেন,—"ভালই হয়েছে নিখিল। এখন নিজের সুখদুঃখ নিয়ে ভাববার সময় নেই। সকলের সুখদুঃখের কথাই ভাববার সময় এসেছে। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, এবারে সকলের কাজ হাতে তুলে নিয়েছি।" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন, "মৃণালদির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। মৃণালদি আমাদের নেত্রী। যিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

প্রশ্ন করলাম, "এ বাড়ী বুঝি তাঁর?"

"হ্যাঁ। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। বাপ-মা নেই। বাবা মারা যেতে সম্পত্তি তাঁর নিজের হাতে এসেছে। বিয়ে করেননি, করবেনও না। অদ্ভুত মৃণালদি! তাঁর আশ্রয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আজ পর্যন্ত কত মেয়ে এসেছে প্রত্যেকেই যেন তাঁর নিজের বোন।"

"এ বাড়ীতে অনেক লোক বুঝি?"

আমার দিকে চেয়ে আবার একটু হাসলেন, বললেন, "এটা কারুর বাড়ী না একটা প্রতিষ্ঠান। পুরুষ কেউ নেই, সব মেয়ে। আসবার সময় দেখলে

বাইরে সাইনবোর্ড টাঙান রয়েছে? দুপুরে বড়ো-বড়ো মেয়েদের নিয়ে স্কুল বসে, বাইরে থেকেও অনেক বাড়ীর বৌ-ঝিরা আসে, আমরাই পড়াই। সেলাই শেখান হয়। তাঁত আছে, তাঁতে খদ্দরের কাপড় বোনা হয়। আর ঐ দেখ চরকা। প্রত্যেক ঘরেই আছে। আমরা স্থতো কাটি।...খাওয়া হয়ে গেছে? লক্ষ্মী ছেলে। এসো আমার সঙ্গে কলঘরে। হাতমুখ ধুয়ে নাও, তোমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছি।"

এর পরেই বাণী-পিসীর মৃণালদি। আমরা ওঁর ঘরে যখন গেলাম, মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে উনি তখন চরকা ঘুরিয়ে স্থতো কাটছেন। বয়স পিসীমার চেয়ে বেশী হবে না। স্থন্দর স্নিগ্ধ চেহারা। আমরা দ্বারদেশে দাঁড়াতেই সহাস্তে আহ্বান জানালেন কাছে আসতে। পিসীমার সঙ্গে সতরঞ্চির একপাশে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটি কে?"—পিসীমা পরিচয় দিলেন।

"ও, তাই নাকি?"

চরকা রেখে আরও একটু কাছে সরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন অনেক কথা। তারপরে আমাকে রেখে পিসীমার সঙ্গেই চলতে লাগল আলাপন, এবং সেটা প্রধানতঃ আমার বাবাকে কেন্দ্র করেই। আমি ততক্ষণে ঘরখানাকে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করেছি।...

"নিখিলেশ!"

ঈষৎ চমকেই ওঁর দিকে তাকালাম। পিসীমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার দিকে সস্মিত মুখখানি ফিরিয়েছেন, বললেন, "আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়ি?"

আমি উত্তর দেবার পূর্বেই পিসীমা বলে উঠলেন, "যাবেন মৃণালদি? চলুন না। আমি তো এখুনি যাচ্ছি।"

সেইভাবে সমান হাসির সঙ্গেই উত্তর এলো, "আজ স্থবিধে হবে না ভাই, কাজ আছে। যাবো, নিশ্চয়ই যাবো, তবে আরেকদিন। আজ তুমিই যাও ভাই বাণী।"

তারপরে আমার দিকে ফিরে বলে উঠলেন, "কই নিখিল. তমি তো আমাকে নিমন্ত্রণ করলে না তোমাদের বাড়ী যাবার জন্য?"

স্নিগ্ধ হাস্তে ভরে গেল ওঁর মুখ, পিসীমাও মৃদু কৌতুকে হেসে উঠলেন আমাকে তথাপি নিরুত্তর লক্ষ্য করে পিসীমা বললেন, "বলো বাবা, নিমন্ত্রণ

করব কী, আপনি তো পর নন, যখন ইচ্ছে হবে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন।"

কিন্তু কী হলো আমার মধ্যে ? কেমন করে অকস্মাৎ চোখের কোণে জেগে উঠল রুদ্ধ অভিমানের অশ্রুকণা ? বললাম, "আমি কিন্তু বাড়ি যাবো না পিসীমা।"

এতক্ষণে ওঁরা দুজনেই লক্ষ্য করলেন আমাকে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন পিসীমা, "কেন ?"

ওঁর মৃণালদিও স্নেহভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে বাবা ?"

দুই হাতে মুখ ঢেকে বললাম, "আমি আপনার কাছেই থাকব, পিসীমা।"

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে পিসীমা কোলের কাছে টেনে নিলেন আমাকে, বললেন "মার সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি ? ছিঃ, তুমি না লক্ষ্মী ছেলে, মার মনে কষ্ট দিতে নেই। চলো, মার কাছে দিয়ে আসি। কতক্ষণ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছ বলো দেখি ? রোদে রোদে ঘুরে মুখখানা তাই অত শুকিয়ে গিয়েছিল ?"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম এতক্ষণে, "মা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

ওঁর মৃণালদি প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে বল দেখি, বাবা ?"

বললাম। পিসীমার বাহুতে মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে সবই বলে গেলাম। দু'রাত্রি হাজত-বাসের কথা, মায়ের কথা। বলতে বলতে কখন কান্না এসে গেছে প্রাণপণে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মুখ তুলবার চেষ্টা করতেই দেখি, পিসীমা তাঁর নিবিড় স্নেহ-বন্ধনে অতি কাছে টেনে নিয়েছেন আমাকে।

ওঁরা স্তব্ধ। অনেকক্ষণ কেটে গেল এইভাবে।

কথা কইলেন পিসীমার মৃণালদি, "তোমার খুব কষ্ট গেছে, না বাবা ?"

ততক্ষণে সামলে নিয়েছি, বললাম, "না।"

আরও কিছুক্ষণ কাটল। পিসীমার মুখে মুহূর্তকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উনি বললেন, "কী ভাবছ ভাই ?"

"ভাবছি !" যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন পিসীমা, "কিছু না !"

"জানি ভাই," ধীর গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—"আমাদের ঘরের কোণে এখনো পুঞ্জীভূত অন্ধকার। কিন্তু ভয় নেই, ঐ অন্ধকারের কোণেও একদিন এসে লাগবে আলোর ছটা। আমরা তারই জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমাদের পরবর্তী পুরুষ, এই নিখিলেশদের দল, এদের চলার পথ সুগম হোক, বিস্তৃতত হোক।"

পিসীমা স্তব্ধ। কী যেন একাগ্রমনে ভাবছেন। সমস্ত মুখখানি উদ্বেলিত স্নেহ এবং করুণায় মধুর। আমার পিসীমা! অদ্ভুত ভাল লাগল মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করতে! ওঁর বুকের একপাশে আমার মাথাটা ছুঁয়ে আছে, কণ্ঠ বেষ্টন করে ওঁর হাতখানা। একটা স্নিগ্ধসুরভি যেন আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে মস্তিকেব কোষে কোষে স্নায়ুতে অপূর্ব ঝংকার তুলছে! দুঃসহ অন্ধ একটা আবেগ! চুরমার হয়ে যাবো যেন! ডাকলাম,—"পিসীমা?"

"কী বাবা?"

কী সুন্দর, কী সুন্দব আমার পিসীমা! ওঁর বুকে মুখটি গুঁজে হাতদুটি দিয়ে ওঁকে বেষ্টন করে বলে উঠলাম, "পিসীমা, আমি আপনার কাছে থাকব।"

আরও নিবিড় করে আমাকে একবার একটু চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়িযে নিলেন নিজেকে, বললেন, "আমি ত রইলামই বাবা, সবসময়ই পিসীমার কাছে আসবে, কিন্তু বাড়ীতে মাযের কাছে ফিরতে হবে তো!"

ওঁর মৃণালদি বললেন, "বাণী, এখনই যাচ্ছো তো ভাই? আমিও যাবো নাকি সঙ্গে?"

আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন পিসীমা, "আজ আমিই যাই ভাই মৃণালদি, পরে তো আপনাকে যেতেই হবে।"

"যাবো। বিনয়বাবুর সহধর্মিণী, কেন গ্রহণ করবেন না দেশসেবক স্বামীর ধর্ম? আব তো ঘোমটা টেনে অন্তঃপুরে থাকবার দিন নেই, আমাদেরও অনেক কাজ করবার আছে!"

কথাটা আজ ভাবি। দান আছে বই কি! জাতির অগ্রগতির মূলে ওদের যুগেরও একটা দান আছে। যুগের পর যুগ এসেছে আলোর বর্তিকা নিয়ে। শেষের মুহূর্তে সেই দীপ তুলে দিয়ে গেছে পরবর্তী যুগের হাতে। এমনি করে হেঁটে-চলা-পূর্ণ জাতীয়তার পথ। সেই অনির্বাণ দীপ আমাদের হাতেও এসেছে। কিন্তু কী ঝঞ্ঝার, কী দুর্গমতার পথ বেয়েই না এলো। মন্থন ঘটেছে সত্য, কিন্তু হলাহলও উঠেছে প্রচুর। সেই তীব্র বিষ পান করেছি আমরা। ওঁদের মধ্যাহ্নের প্রহরে জাগ্রত সূর্যের প্রখরতা ছিল স্বীকার করি, কিন্তু সংশয়বাদের গাঢ় কুটিল মেঘরাশির আকস্মিক অন্ধকার-বিস্তার—এর মধ্য দিয়ে আমাদের পথচলা কী হয়েছে স্বচ্ছন্দ, হয়েছে সংশয়হীন?

পিসীমা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "আসি ভাই, মৃণালদি।"

চললাম। কিন্তু উনি যখন ওঁর ঘর বন্ধ করে পথে নামলেন, তখন বলে উঠলাম, "বাড়ি আমি যাবো না পিসীমা।"

"ছিঃ।"

"মা যে ঢুকতে দেবে না, তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"পাগল! মা কি ছেলেকে কখনো তাড়িয়ে দিতে পারে?"

"মা বকবে।"

"হাত ধরো দেখি?"

ধরলাম। সস্নেহে একটু হেসে বললেন, "ভয় কী? আমি তো রয়েছি।"

পার হতে লাগলাম পথ। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাই। ভয় হচ্ছিল ভয়ানক। এটুকু দেখেছি, পিসীমার নাম শুনলেই মা কী নিদারুণ চটে যেতো। সেই উনি চলেছেন আমাদের বাড়ি। বহুবার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলাম, কিন্তু উনি অবিচল—দৃঢ় পদক্ষেপে অবলীলায় এগিয়ে চলেছেন। কী যে ভয়ানক কাণ্ড হবে আজ, সেটা ভাবতেই ভয়ে শিউরে উঠছি।

কিন্তু বিধাতা কি যত বিস্ময় আমারই জন্য জমিয়ে রাখছিলেন? কিছুই ঘটল না। মা সেলাই করছিল ঘরের মধ্যে, খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই মেসিন রেখে দিয়ে এগিয়ে এলো।

"কী বৌদি, চিনতে পারেন?"

সস্মিতমুখে মা ওঁর হাত ধরে খাটের ওপর বসাল, বলল, "অতো ভুলো মন আমার না ভাই। বিয়ের সময় তোমায় দেখি নি? ভারী আনন্দ হচ্ছে আজ তোমাকে দেখে ভাই ঠাকুর-ঝি!"

মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্রচ্ছটার মত ওঁরা হেসে উঠলেন। আমি অবাক ইচ্ছা হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার মা—আমার মা!

"খোকন বুঝি তোমার ওখানেই গিয়েছিল?"

পিসীমা সংক্ষেপে বললেন, "হ্যাঁ।"

মা হাসল আবার, বলল, "জানি। খোকন, ঐ আলনা থেকে তোমার কাপড়-চোপড় নাও, বই-পত্র রাখো, কলঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে পোষাক বদলে এসো। আসবার সময় দেখে এসো দাদু জেগেছেন কি না, না জাগলে

ডেকো না কিন্তু। আমি খাবার করছি, শীগগির তৈরী হয়ে এসো পিসীমার সঙ্গে বসে যদি খেতে চাও।"

আনন্দে নেচে উঠলাম যেন, বললাম, "পিসীমা খাবেন! বেশ হবে! জানো মা, পিসীমা আমাকে আজ কত খাইয়েছেন!"

"দুর দুষ্টু ছেলে! আপনি বিশ্বাস করবেন না বৌদি ওর কথা।"

মা হাসল, "জানি ভাই, তোমার কাছে যখন গেছে, যত্ন না পেয়ে যাবে কোথায়? পিসীর আদর।"

লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে সহজ হয়ে ওঁরা ক্রমে গভীর কথায় এলেন। বাবার কথায়, মার কথায়, পিসীমার কথায়।

অদ্ভুত—অদ্ভুত আমার মা! হঠাৎ ভালো-লাগার আনন্দে এই কথাটাই ভ্রমরের মত অকারণ গুঞ্জরণ করছে আমার মন!

আর দাদু? কমল? কিছুক্ষণ পরে বেশবাসে পরিচ্ছন্ন হয়ে দাদুর ঘরে ঢুকে দেখি, উনি ঘুমোচ্ছেন, এক পাশে কমল। দাদুর শিয়রের কাছে গিয়ে ওঁর জট্‌পাকানো পাকা চুলের রাশিতে একটুক্ষণ হাত বুলিয়ে দিলাম। মনে হচ্ছে যেন কতদিন ওঁকে দেখি নি। কমলটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে, আলগোছে ওর থুত্‌নী ধরে একটু আদর করলাম। ছোট্ট ভাইটি! ভাল লাগছে—সমস্ত ভাল লাগছে। মানদা-ঝি কোথায়—মানুদি? পাড়া বেড়াতে গেছে হয়ত। কলতলার পাশ দিয়ে ও বাড়ীর নারিকেল গাছের ঝিরিমিরি পাতার ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে দাদুর ঘরের দোর-গোড়ায়। ভারী চমৎকার!

মার ঘরে এলাম। ওঁরা কাছাকাছি দুজনে বসে কথা কইছেন। পিসীমা বলছেন গল্প—বাবার ছোটবেলার গল্প। সহরতলীর একপ্রান্তে এক টিনের বাড়ী ভাড়া নিয়ে ঠাকুর্দা থাকতেন। সেখানেই ছিল পিসীমার বাপের বাড়ী। ছোটবেলা দুজনে এক সঙ্গে পড়েছেন, খেলা করেছেন। ক্রমে বদলে গেল সব। ঠাকুর্দা মারা গেলেন।

আমি আবার এলাম দাদুর ঘরে। দাদু জেগেছেন।

"দাদু।"

"দাদুভাই? হাতটা ধরো ত? কাঠের ওটা দাও, কলকাতায় যাবো।"

দাদুর সঙ্গে আমার গল্প চলল। ততক্ষণে কমলটাও উঠেছে। আমাকে দেখে আনন্দে হেসে হাততালি দিয়ে অস্থির। এক সময়ে হাত ধরে টেনে

নিয়ে গেল ঘরের কোণে। একটা ভাঙা চরকার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগল। বললাম, "কী রে ?"

চোখ বড় বড় ক'রে বললে, "চরকা। সুতো কাটবো। কাপড় হবে।"

হেসে ওকে কাছে টেনে নিলাম।

মা পিসীমাকে নিয়ে গেছে রান্নাঘরে। খাবার তৈরী চলছে। মানদা-ঝি ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে, বাসন মাজছে কলতলায়। চমৎকার, চমৎকার লাগছে আমার।

"দাদুভাই ?"

"কী দাদু ?"

"অমরকণ্টক। অমরকণ্টক দেখেছ—নর্মদা নদীর উৎস ? দেখেছ গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ? গোমুখীর ওপরের পাহাড়ে গন্ধর্ব-রাজ্য ? আমি শুনেছি দাদুভাই, তাদের নাচগানের শব্দ আমি শুনেছি। বদ্রী-কেদারের পথে হেঁটেছ দাদুভাই ? অমরনাথে গেছ ? অমরতীর্থ ? বরফের রাজ্য ! মহাদেব নিজে এসে পূজার নৈবেদ্য খেয়ে যান পায়রার ছদ্মবেশে ! অ্যা দাদুভাই, তুমি কিছু দেখো নি। তবে, শোনো গল্প। কৈলাসের পথে যেতে একবার ঘুরে যাচ্ছি কোদণ্ডনাথ, রাস্তায় এক ভীষণ আকৃতি ভুনিয়ার সঙ্গে দেখা। সে করলে কী···ওহো-হো-হো-হো !"—দাদু হেসে উঠলেন অনর্গল, "সে এক মজার কাণ্ড! লিখব দাদুভাই, কাব্য লিখব, মহাকাব্য ! মহাতীর্থ···মহাতীর্থ হবে তার নাম।"

দাদুর কল্প-কথা সুরু হলো।······

অপরাহ্ন গড়িয়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি। বাণী-পিসী বিদায় নিলেন। মা বলল ওঁর চিবুকে হাত দিয়ে সস্নেহ আদরে—"ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে না, এমনই ভালো লেগেছে তোমাকে ভাই ঠাকুর-ঝি। মাঝে মাঝে এসো ভাই ?"

"আসব।"

"তোমাদের কাজে যদি লাগতে পারতাম! উপায় নেই ভাই, সংসার দেখতে হবে তো ? আমার সংসার, ওঁর কাজ। কবে যে আবার······"

"ভাববেন না বৌদি, দাদা ভালো আছেন।"

"ভাবি না, ভাই। কিন্তু কী গুরুভার যে আমার মাথায় চাপানো! যেন ভেঙে না পড়ি।"

"না বৌদি, ভাঙবেন কেন ?"

মুহূর্তকাল চুপচাপ।

পিসীমা বললেন "চলি ভাই বৌদি। চলি খোকন, কেমন ?"

চলে গেলেন। গলির মোড়ে তিনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই আমাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ হলো। আর নিমেষে যেন বদলে গেল দৃশ্যপট! সেই হাস্যমুখী মা কোথায় অন্তর্হিত হলো! হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল মায়ের ঠোঁটে, ধীর গম্ভীর কঠোর হয়ে উঠল মুখমণ্ডল। যেন থমথমে ঝড়ের মেঘ। ধারালো কণ্ঠে ডেকে উঠল, "নিখিল ?"

"কী মা ?"

"কাল থেকে তোমার স্কুল বন্ধ। শুধু স্কুল না, একপাও বাড়ীর বাইরে যেতে পাবে না। প্রভাতদাদাকে চিঠি দিয়েছি, তাঁর লোক এলেই তার সঙ্গে তুমি চলে যাবে তাঁর কাছে। সেখানেই পড়বে। এখানকার হুজুকে তোমার পড়া হবে না।"

"আমি যাবো না মা!"

"তোমাকে যেতে হবে!"—প্রচণ্ড গর্জনে মা ধমকে উঠল।

আমি নিরুত্তর।

"ভেবেছিলাম,"—মা বলতে লাগল, "ভেবেছিলাম কারুর সাহায্য নেবো না। কিন্তু নিতে হলো শেষ পর্যন্ত তোমাদের জ্বালায়। চলে যাও প্রভাতদাদার কাছে। আমি থাকি কমলকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে—আমার সহায় ভগবান।"

ঘটনা ঘটলো এত আকস্মিক যে কিছু ভাববার পেলাম না অবকাশ। নিদারুণ আকস্মিকতা বিস্মিত বিহ্বল হতবাক করে দিয়ে গেল আমাকে।

দিন পনেরোর মধ্যেই এক ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে যেতে উপস্থিত। প্রভাতমামা যেখানে থাকেন, সেখানে ওঁর বাড়ী। ছুটিতে দেশে চলেছেন। ইতিমধ্যে মামার চিঠিতে নির্দেশ পেয়ে নিতে এসেছেন আমাকে।

বিদায় মহানগরী! ভেসে চললাম দূরদেশে। মাকে ছেড়ে, কমলকে ছেড়ে, মামুদিকে ছেড়ে, সর্বোপরি দাদুকে ছেড়ে চলে যেতে কী যে কষ্ট হচ্ছিল বোঝাতে পারব না! আসবার সময় দাদুর সেই শূন্য উদাস স্বপ্নিল চোখ আমার দিকে ফিরিয়ে তাকানো, তা কি ভুলতে পারব কোনোদিন?

রেল স্টেশন। ধীরে ধীরে গাড়ী ছাড়ল। মমতা-বিহ্বল মহানগরী শূন্য পথের দিকে চেয়ে মুহ্যমান পড়ে রইল পশ্চাতে!

। উন্মেষ ।

নতুন দেশ। সত্যিই নতুন দেশ আমার চোখে। বনবীথির স্নিগ্ধ ছায়া-ঢাকা শ্যামল শান্ত পল্লীশ্রী আকর্ষণ করল আমাকে। কী নিবিড়, কী দুর্নিবার সে আকর্ষণ! সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। আমার নতুন মন নতুন রঙে ভরে গেল!

পথচলা ট্রেণে, তারপরে স্টীমারে। এই পথচলা কোনোদিন ভুলব না। জলরাশির বুকে ঢেউ তুলে তুলে চলেছে স্টীমার। অনেকগুলি নদী পার হয়ে আমাদের স্বচ্ছতোয়া ছোট্ট নদীটি। দুই ধারের ঘন বনশ্রেণীর ছায়া পড়েছে তার বুকে। আমাদের সেই গাঁয়ের নীচে দিয়ে বাঁধাঘাট ছুঁয়ে বয়ে চলেছে সলাজনম্রা পল্লী বালিকাটির মত!

গ্রাম। পরিচ্ছন্ন খড়ের চাল-ছাওয়া কুঁড়ে, ধানের মরাই, গোয়াল। যারা বর্ধিষ্ণু, তাদের ঘর ইঁটের। ইঁটের, কিন্তু কারাগৃহ নয়। কাছেই জঙ্গলে সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁ ডাকে, দূরের মাঠ থেকে শেয়ালের কান্না, শিবমন্দিরের ঘণ্টার শব্দ, জমীদারবাড়ীর নহবতের প্রহর-ঘোষণা। আর ওঠে চাঁদ। বাঁশবনের শিহরিত শিখর ছাড়িয়ে, আম্রবীথির ঝিলিমিলির মধ্য দিয়ে।

স্কুলের কাছেই আমাদের বাড়ী। স্কুলঘরের পাশ দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ। একটু গেলে প্রকাণ্ড পুকুর, তার পরে কলাবাগান আমবাগানের মধ্যে আমাদের খড়ে-ছাওয়া চালাঘরগুলি উঁকি দিচ্ছে। এই মাটির মেঝে, দরমার বেড়া, খড়-ছাউনী কুঁড়ে ঘরের এক প্রান্তেই আমার দীর্ঘ চারটি বৎসর কেটেছে। বালক-বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনের স্পর্শ পর্যন্ত।

বেশ মনে আছে, উঠানে পা দিয়েই রীতিমত একটি ভীড় দেখেছিলাম। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এবং আরও অনেকে; তাদের মধ্যে বর্ষীয়সী মহিলার সংখ্যাই বেশী। আমরা যেতেই ভীড় ঠেলে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন প্রভাতমামা। ইনি মায়ের মাসতুতো ভাই। প্রথম যে চেহারাটি ওঁর দেখেছিলাম, আজও তা স্পষ্ট মনে আছে। দীর্ঘ ঋজু দেহ, ফরসা ধবধবে দেহের বর্ণ, চোখে চশমা, সমস্ত মুখ ভরে সুসমঞ্জস কাঁচা দাড়ী। গায়ে তখন একটা মোটা চাদর ছিল, পায়ে খড়ম, হাতে মোটা একখানা বই—যেন পড়তে পড়তে হঠাৎ-ই আমাদের দেখে

উঠে এসেছেন। চেহারায় একটা থমথমে গাম্ভীর্য। তা সত্ত্বেও ওঁর চরিত্রে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে করে ওঁর প্রতি ভয় আসে না, আসে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা! এ আমি তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম।

ভীড় দেখেছিলাম। কিন্তু ফিকে হয়ে যেতে লক্ষ্য করলাম, এ বাড়ীর লোকসংখ্যা ভয়াবহ রকম বেশী নয়। যাঁদের দেখেছিলাম, তাঁরা প্রতিবাসী অথবা প্রতিবাসিনী। অনেকগুলো বাড়ী নিয়ে এই পাড়াটা। এ বাড়ীর মধ্য দিয়ে অপর বাড়ীতে অনায়াসে যাতায়াত করা চলে। এই দেখেই আমার অনভ্যস্ত মন ভেবেছিল, সব মিলিয়ে এটা বোধহয় বড়ো একটা বাড়ী, অনেক মানুষ, অনেক কোলাহল, অনেক ভাবনা নিয়ে নোঙর-ফেলা জাহাজের মত ঢেউয়ের কোলে থমকে থেমে আছে।

মামীমাকে দেখলাম। মনে হলো, দিদিমা আর উনি যেন এক। মুখে কথাটি নেই, শুধু একটি স্নিগ্ধ হাসির স্পর্শ, মাথায় ঘোমটা হাতে মোটা শাঁখা আর লোহা—পরনে আধময়লা লাল অথবা কালোপাড় সাধারণ আটপৌরে শাড়ি—অলঙ্কার ও বেশবাসের বাহুল্যমাত্র নেই—সারাদিন টুকিটাকি কাজ করে চলেছেন। সবশুদ্ধ ছয়টি ছেলেমেয়ে। প্রথম দুটি বড়ো, তাদের কথা পরে বলছি, আর চারটি ছোট ছোট, সর্বকনিষ্ঠটি মাসকয়েকের শিশুমাত্র। এদের পরিচর্যাতেই সময় ওঁর কেটে যায়। ছেলেমেয়েদের ছেঁড়া জামা সেলাই করতে বসেছেন হয়ত মধ্যাহ্নে—কোলের ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে জেগে উঠল। পুরানো সেলাইয়ের হাত-মেসিনটা চালাতে চালাতে ডেকে ওঠেন, "মাধু?"

"যাই মা।"

ওঁদের প্রথম সন্তান অর্থাৎ আমাদের মাধুরীদিদি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। খোঁপা ভেঙে চুল এলানো, শাড়িতে এলোমেলো ভাঁজ। বুকের নীচে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, মায়ের ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে।

"কী মা?"

"খোকাকে একটু ধর। কাঁদছে। হাতের কাজটা চট্ করে সেরে নেই।"

খোকাকে কোলে তুলে নিলো মাধুরীদি। বাড়ীটার চারধারে ঘুরানো দাওয়া। দুটি মাত্র ঘর, তবে বেশ বড়ো-বড়ো। একটাতে এদিক-ওদিক আলমারী-টেবিল-খাতাপত্র বইয়ের স্তূপ, সেটা মামার ঘর। পাশেরটায় আমরা থাকি। একদিকে আমার ছোট খাট, অপরদিকে মাধুরীদিদি আর

ভাইবোনদের। দাওয়ার এককোণে দরমার বেড়া দিয়ে ক্ষুদ্র একখানি ঘরের মত তৈরী করা হয়েছে, এটা আমাদের পড়ার ঘর, রাত্রে অবশ্য হরি চাকরটা এখানে শুয়ে থাকে। পড়ার ঘরে বসে অঙ্ক কষতে কষতে মুখ তুলে সামনে তাকাই। ক্ষুদ্র জানালা। তারই ফাঁকে সমস্ত দাওয়াটাকে দেখতে পাচ্ছি। বারান্দার বাঁকের মুখ থেকে একটা গুণগুণানি সুর তুলে ভাইকে শান্ত করতে করতে বেরিয়ে আসছে মাধুরীদি, খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। পল্লীর কোনো নিদ্রালস স্তব্ধ মধ্যাহ্ন সেটা। অনতিদূরে বাঁশঝাড়ে শন্‌শন্‌ একটা ক্লান্ত বাতাস। এ পাশের রাঙচিতার বেড়ায় ঈষৎ শিরশির্‌। ওদের বাড়ীর কুকুরটা বেড়ার পাশে এককালি ছায়ার উপর শুয়ে জিব বার করে ধুঁকছে। ওর পিছন দিকেই স্তব্ধ হয়ে বেড়ার সঙ্গে মিশে অলক্ষ্যে বসে আছে আমাদের মেনি বেড়ালটা। আমার তুচোখের পাতা ভারী হয়ে একটা আবেশ নামছে—খোলা খাতার ওপর দশমিকের জটীল অঙ্কটা—আরও জটীল তুরূহ তুর্বোধ্য ঝাপসা। মাধুরীদিকে দেখছি। ও কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছে না জানালার ঝাপটার আড়াল থেকে।

মাধুরীদি এদিকে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়াল থমকে, চকিত দৃষ্টিপাতে একবার চারিদিকে চেয়ে নিলো। ভাইকে নিবিড় করে চেপে ধরল বুকের কাছে! অগোছালো বুকের আঁচলটা সরে গেল। ··হঠাৎ যেন শিরশির্‌ করে উঠল সমস্ত দেহটা, মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা অশান্ত শিহরণ, কাণ তুটো গরম হয়ে উঠল যেন, গভীর লজ্জায় মুখ নীচু করে টেবিলে মাথা রাখলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু কেন লজ্জা? নিজের মনকে বারবার সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম, কেন লজ্জা।

অদ্ভুত রহস্যের মায়াজাল সেদিন মনের আকাশে। টেবিলে মুখ লুকিয়েছি কিন্তু চেতনাকে নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে সে আরও উদগ্র হয়ে নিজেকে মেলে দিয়েছে অসীম নির্লজ্জতায়। আমার কাণ আমার চোখ তুর্ণিবার আগ্রহে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। গভীর অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের চোখ যেমন আরও তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। চোখ ঢেকেছি, কিন্তু চোখ যেন তবু দেখছে! যেন বলছে, কী সুন্দর ঐ মাধুরীদি! আর কাণ? মাধুরীদির পায়েচলার মৃদু ধ্বনিটুকু, কণ্ঠের সামান্য স্বরটুকু শোনবার জন্য একান্ত আগ্রহে উন্মুখ হয়ে রইল যেন।

শুনতে লাগলাম। ভাই হঠাৎ চুপ করেছে। 'ক্ষুধায় ককিয়ে কেঁদে উ মামীমার কাছে গিয়ে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন হঠাৎ-ই চুপ হয়ে যা

তেমনি চুপ। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। আবার কান্না। যেন একটা খেলনা দেওয়া হয়েছিল ওকে ভোলাবার জন্য; একটুক্ষণ হাতে রেখে ওটা ওর পছন্দ হলো না, দিলো ফেলে! মাধুরীদির পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শুনতে পেলাম কণ্ঠস্বর, গানের মত, কোনো তার-যন্ত্রেব ঝংকারের মত।

"মা, ভাইকে নাও, চুপ করছে না, ক্ষিদে পেয়েছে বোধহয়!"

"এই যে আমারও কাজটা শেষ হলো। এইবার দে ওকে।"

মামীমাব কোলে গিয়ে ভাই শান্ত।

আবার শান্ত হয়ে গেল ছুটীব দিনের সোনার রৌদ্র-ভরা মধ্যাহ্নটা। বাঁধানো ঝক্‌ঝকে খাতাটায় ইংরাজী তর্জমা করতে কবতে বড়ো টেবিলটার ওপর মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে সুকুমাব। তাব ভারী নিশ্বাস-পতন শুনতে পাচ্ছি। সুকুমার আমার মামাতো ভাই, মাধুরীদির পবেই ও। আমাবই বয়সী, তার ওপব একই ক্লাসে পড়ি আমবা।

কিন্তু মাধুরীদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ কাকে মনে পড়ল? গামছায হাত-পা-বাঁধা, কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, সর্বাঙ্গে বেত্রাঘাতের চিহ্ন। মনে পড়ে সেই গম্ভীর চাপা অথচ স্পষ্টকণ্ঠে রবীন্দ্রকাব্য-আবৃত্তি! বুকের ভিতরটা গুম্‌রে উঠল। আর কি দেখতে পাবো না তাঁকে?

"এই বুঝি সব লেখাপড়া হচ্ছে?"…

ভয়ানক চমকে মুখ তুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। অথচ বিস্ময়ের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তথাপি আমার এই মুহূর্তের বিচিত্র মনে বিস্ময়ই জাগল—ভয়-মিশ্রিত লজ্জা-মিশ্রিত। আমাদের টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরীদি। আমি মুখ তুলতেই কাছে এগিয়ে এলো। কী তীব্র দৃষ্টি! যেন তন্ন তন্ন করে দেখছে আমাকে।

"এই বুঝি অঙ্ক কষা হচ্ছে, কেমন?"

লজ্জায় ভয়ে অপরাধে আবার মুখ লুকিয়েছি ততক্ষণে। প্রচণ্ড ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামতে লাগল দেহের মধ্যে। অথচ মাধুরীদিকে আমরা কেউই ভয় করি না। মাধুরীদি আমাদের সমপর্যায়ের, আমার থেকে মাত্র তিন বছরের বড়ো। আমাদের সঙ্গে কত গল্প করে, হাসে—আমরা যেন ওর বন্ধু, কিন্তু এই মুহূর্তের মাধুরীদি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"আর ওটা বুঝি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে, ঐ সুকুটা? ঘুমুকগে, আমার কী! পড়া না পারলে বাবা যখন আচ্ছা ঘা-কতক দেবে, বুঝবে তখন ঠ্যালাটা!…

তারপর ···আমাদের নিখিলবাবু? কী খবর? তুমি তো শুনতে পাই লেখাপড়ায় খুব ভাল ছেলে। এই তার নমুনা না কী, অ্যাঁ?"

ঠিক যেন চাবুকের তীব্র একটা কশা মনে আগুনের ঝলক হেনে গেল! কিন্তু আশ্চর্য, মনে মনেও ওর মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারছি না! ওর কথাই যেন সত্য! ভাল ছেলে আমি নই, মুহূর্তের মধ্যেই আমার সমস্ত ভালত্বের মুখোস খসে যেতে পারে!

মাধুরীদি অতি কাছে ঘন হয়ে এলো, বললে, "দেখো বাপু, স্পষ্ট কথা বলি, এতে তুমি রাগ করো আর যাই করো। পরের আশ্রয়ে এসেছ পড়াশুনা করতে। নিজের অবস্থার কথা ভেবে ভাল করে পড়াশুনাই করো, অন্য দিকে মন দিয়ে বয়ে যেও না। আমার আর কী, পিসীমা অনেক ভরসা করেই বাবার কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন, বাবার বদনাম না হয়, সেই জন্যই এত কথা বলছি, বুঝলে? বুঝেছ নিশ্চয়ই, নেহাৎ কচি খোকাটি তো তুমি নও।"

আর দাঁড়াল না, আরেকবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল।

কিন্তু কী হলো আমার? টেবিলে অঙ্কের খাতাখানার ওপর মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম। মা-বাবা-দাদু-কমল। কবে যে আবার তাঁদের দেখতে পাবো! মা-মাগো! আমি যাবো তোমার কাছে, এখানে থাকব না। আমি নেই, কে এখন দাদুর হাতখানি ধরে ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এসে আমাদের সেই পুরাণো ইজিচেয়ারটায় বসিয়ে দেয়, শোনে তাঁর গল্প, তাঁর মহাকাব্য!

এই সময় আমার তখনকার মনের একদিনকার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। আমি স্বভাবতই নিরীহ নির্জনতাপ্রিয়। গ্রাম আমার ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পল্লী-মাতৃকার সহজ শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তিটি। জীবনে পরবর্তীকালে বহু পল্লীপথই অতিক্রম করতে হয়েছে, কিন্তু প্রথম দেখা এই অপূর্ব সৌন্দর্য ভুলবার নয়। সেই জন্যই এর নাম লিপিবদ্ধ করলাম না, দিলাম না ওর ভৌগোলিক নির্দেশ, শুধু বলে গেলাম—আমার জন্মভূমির এ এক পল্লী। সমস্ত গ্রামের যেন প্রতীক, বাংলার গ্রাম বলতে এরই চিত্র আমার মানস-পটে সর্বপ্রথম ভেসে ওঠে!··· মা-বাবা সবাইকে ছেড়ে কেমন করে থাকব, প্রথম এই সমস্যাই ছিল মনে। কিন্তু এখানে এসে যতখানি ভেবেছিলাম, ঠিক ততখানি বিচ্ছেদের বেদনা

অনুভব করি নি। বৈকালের স্তিমিত আলোয় বাড়ীর পিছনের আম্রবীথির ছায়া-ঢাকা ছোট্ট পুকুরটায় টলটলে কাকচক্ষুর মত নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জলের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকতে থাকতে কত কী চিন্তা আসত মনে, কিন্তু কই, ওঁদের কথা তো তত ভাবি নি! কিন্তু মনে এসে আকস্মিক কোন আঘাত যখন বাজত, তখনই কেঁদে উঠত অন্তরটা! ইচ্ছা হতো এই মুহূর্তেই চলে যাই ওঁদের কাছে! আঘাত খেয়েই চোখের মোহজালটুকু ছিঁড়ে যেতো। এ যেন বিধাতার সচেতন-করে-দেওয়া আমাকে। আমি কী? কী অবস্থা আমার?

কতক্ষণ ধরে কাঁদছিলাম কে জানে। মাধুরীদি আবার এলো।

"ও বাবা! ওর আবার চোখ দিয়ে নেবুর রসও গড়ায় দেখছি! এদিক নেই ওদিক আছে!"

এতক্ষণে মুখ তুললাম। কিন্তু কিছু বললাম না, নীরবে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগলাম।

"কী, ব্যাপার কী? কান্না কিসের? আমি ও কথা বলেছি বলে?"

আমি তথাপি নিরুত্তর লক্ষ্য করে বলে চলল, "কিছুই বলা যায় না, হয়ত মিথ্যামিথ্যি মা-বাবার কাছে সাতঝুড়ি নালিশ করবে গিয়ে আমার নামে। ওরাও নিপাট ভালোমানুষ। কথায় বলে মামাবাড়ীর আদর!"

ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলাম, "নালিশ করা আমার স্বভাব নয়।"

"কে জানে! ওসব তোমাদের মত কলকাতার চালিয়াৎ ছেলেদের কথায় কোন বিশ্বাস নেই। তোমাদের গুণ আমার বেশ জানা!"

মুখ নীচু করে রইলাম। সইতে হবে। আমি যে আশ্রিত। মাধুরীদি আরও কাছে এলো, খুব কাছে।

"কী, কান্নাটা কিসের, শুনতে পাই কী?"

উত্তর দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বর ঈষৎ কেঁপে গেল—"মার জন্য বড্ড মন কেমন করছিল!"

"আহা!" ওর মুখ বিকৃত বীভৎস দেখাল—"কচি খোকাটি একেবারে!"

ক্ষিপ্র পায়ে চলে গেল, আর দাঁড়াল না।

কিন্তু আর নয়। আমি পালাব। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবো। কেন মাধুরীদি আমার সঙ্গে এমন করছে? আগে তো করত না। আবার এলো কয়েক মুহূর্ত পরেই।

"কী গো কলকাতার ছেলে, লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড়া হচ্ছে নাকি আজকাল?"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"ড্যাব ড্যাব করে বেহায়ার মতো চেয়ে আছ কী আমার দিকে! বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখা হয়! এই দেখ!"

আঁচলের তলা থেকে একখানা বই বের করে ধরল সামনে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের একটা খণ্ড।

বললাম, "ওখানা মামাবাবুই দিয়েছিলেন পড়তে লাইব্রেরী থেকে এনে।"

একটুক্ষণ থেমে রইল, তারপরে বলল, "ও, তাহলে তো কথাই চলে না। সাধে কি আর বলে, মামাবাড়ীর আদর। নাও বাবু, তোমার যা খুশী করো। এসেছ মামাবাড়ীতে, তা যে সম্পর্কেরই মামা হোক না কেন, তোমার তো পোয়া বারো।"

"মাধুরীদি?"

"ব-লু-ন।"

"আপনি এমন করছেন কেন আমার সঙ্গে?"

"ও মাগো, আমি আবার তোমার সঙ্গে কী করলাম। রক্ষে করো, এই কান মলছি, নাক মলছি, আর তোমার সঙ্গে কথা কইব না। ওরে, ঐ? সুকু, ওঠ্-ওঠ্! দিনে-দুপুর ছেলের ঘুম দেখ না। পড়তে পড়তে দিব্যি ঘুম হচ্ছে। ডাকব নাকি বাবাকে?"

ধড়মড় করে জেগে উঠল সুকুমার। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে উঠল, "কি রে দিদি?"

"একচোট খুব ঘুমিয়ে নিলি তো?"

"ট্রানস্লেসনের প্যাসেজটা শেষ করে ঘুমিয়েছি। হুঁ-হুঁ বাবা, চালাকী না।"

হাসল মাধুরীদি, "বেশ করেছিস। এই সুকু একটা কথা শোন?"

"কী রে?"

"পুকুরপাড়ের বড়ো পেয়ারা গাছটায় যা পেয়ারা হয়েছে। চল্। যাবি?'

"চল্।"

সুকুমার উঠে এলো।

"আয় নিখিল।"

"আমি যাব না ভাই, তুই যা।"

আবার ব্যঙ্গের বিদ্যুতই ঝলসে উঠল মাধুরীদির চোখে, বলল, "না রে স্কুকু ওকে ডাকিস না, ও যে আবার ভালো ছেলে!"

একটু চুপ করে থেকে তারপর উঠে দাঁড়ালাম, বন্ধ করলাম খাতা, বললাম "চলো ভাই সুকুমার, আমি যাচ্ছি।"

"আয়।"

মুখ টিপে হাসল মাধুরীদি—"তবু ভালো, আমি ভাবলাম, নেবুর রস আবার গড়াল বুঝি!"

পুকুর-পাড়ে মাধুরীদির বেশীক্ষণ থাকা হলো না, একটু পরেই বাড়ী থেকে ডাক পড়ল। ও যেতেই আমরা গাছতলা ছেড়ে পুকুরের পুব পাড়ে যেখানে একটা মোটা দড়ির মত শক্ত কুঁচ-লতা দুটো বুড়ো আম গাছের মাঝে দোলনার মত দুলছিল, তার ওপর গিয়ে বসলাম। সুকুর কথা বলি। ছেলেটা পড়াশুনায় খারাপ না। ভালই লেগেছিল ওকে। ওর মনের স্বপ্ন আশা আকাঙ্খার ধারার সঙ্গে আমারও কোথায় বেশ একটা মিল ছিল। ওর আরো একটা গুণ ছিল, ঐ বয়সেই বেশ ছবি আঁকতে পারত, আঁকায় বরাবরই হতো ফার্স্ট।

আমাদের গল্প চলল। একসময় বলে উঠল সুকুমার, "আজ একটা ব্যাপার ঘটেছে! লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা ছবির স্কেচ্ করে ফেলেছি খানিকটা। ট্রানশ্লেসনের খাতাটার মধ্যে আছে। কাউকে বলিস না যেন। দিদিটা যা আচ্ছা গোয়েন্দা, টের না পেলে হয়। বুঝলি নিখিল, এখন ট্রানশ্লেসন করেছি না আরো-কিছু। দিদিটাকে দিলাম এক ভাঁওতা!"

হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসিতে পারলাম না যোগ দিতে। বললাম, "সুকুমার?"

"কী রে?"

"মাধুরীদি আমাকে দেখতে পারে না!"

আবার হেসে উঠল, "কাকেই বা পারে? বুঝেছি, তোর ওপর আজ কিছু মোড়লি করেছে তো? ওর স্বভাব। আমার পেছনে কী কম লাগে? বিয়ে হবে কি-না, তারই আহ্লাদে গেলেন একেবারে!"

"বিয়ে! কবে!"

"রাঙা শুক্রবারে!" হেসে উঠল, "হাসালি তুই। দিন কি ঠিক হয়েছে? কিছুই ঠিক নেই। সম্বন্ধ সবে আসছে, ওই পর্যন্ত। তবে যা সব রূপের আকৃতি! কী করে যে কী হবে কে জানে! কিন্তু তাতেই অহংকার দেখ না

মেয়ের! যেন পা পড়ে না মাটীতে! কে তোকে বিয়ে করবে বাপু? না হয় রঙ্‌টাই ফরসা, কিন্তু যা মুখ! বাক্যবাণের জ্বালায় অস্থির হয়ে বরগুলো সব দেশছাড়া হবে।"

হেসে উঠলাম, বললাম, "থাকগে! তোর ছবির কথা বল।"

"ছবি? ওয়াণ্ডারফুল! যদি আঁকতে পারি।"

"বল্ না?"

"শোন্ তবে। চাঁদ উঠেছে বাবলা বনের ফাঁক দিয়ে।"

"ব্যস্? আর কিছু না?"

"আবার কী! বাবলার বন, আঁকাবাঁকা ডাল, আর ছোট-ছোট পাতার ঝিলিমিলি—তারই মধ্য দিয়ে চাঁদ উঠছে! আর কী চাই! ওই দিয়েই অদ্ভুত জিনিষ গড়ে তুলব!"

"ভারী সুন্দর বললি তো! এবার তুই ভাই বাংলায় ফার্স্ট হবি!"

"যা-যা, বকিস না। এবার ফার্স্ট-আসনটি মারছ বাপু তুমি। জানো না, স্কুলে কী রটনা? কী বলিস, পারবি তো? তাহলে ঐ সলিল ভটচায্যের থোঁতামুখ ভোঁতা হয়ে যাবে! দেখিস না, প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হয় বলে ওর কী গুমোর?"

ঐ আর-একজন—সলিল ভটচায! এখানকার সব ভাল, কেবলমাত্র দুটি ছাড়া। এক—বাড়ীতে মাধুরীদিদি। আর এক—স্কুলে সলিল। এদের দুজনের কী যে অহেতুক আক্রোশ ছিল আমার ওপর! ভ্রমরের মত গুণ-গুণ করে কাছে না এসেও পারত না, কিন্তু ফোটাত হুল। কখন যে কোনদিক দিয়ে আক্রমণ করবে ঠিক নেই, সর্বদা সশঙ্কিত থাকতে হতো, একটু অসতর্ক হলেই সমূহ বিপদ।

ক্লাসের ফার্স্ট বয়—সলিল। ভয়ানক গম্ভীর, নিজের সম্বন্ধে বেশ সচেতন, বেশ অহঙ্কারী বলা যায়। ক্লাশে কোন কোন দিন একাধিকবার উৎকর্ষ দেখিয়ে সলিলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করেছিলাম। দু-একটা কথার বিনিময়ও হয়েছিল, কিন্তু উন্নাসিক ভাবটা ওর কিছুতেই গেল না! মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আগামী যাণ্মাসিক পরীক্ষায় ওকে ছাড়িয়ে যাবোই। পরীক্ষা এলো, প্রতিজ্ঞা সফল হলো আংশিকমাত্র। আমি সেকেণ্ড হলাম, কিন্তু একমাত্র অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়েই ওকে গেছি ছাড়িয়ে। মামাবাবু সন্তুষ্ট হলেন। সুকুমার তো আহ্লাদে জড়িয়ে ধরল আমাকে! নম্বরের কাগজটা নিয়ে সলিলের কাছে

গেলাম। ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে ও একমনে নিজেরটা দেখছিল। বললাম, "দেখি ভাই, কিসে কত পেলে ?"

কাগজটা মুড়ে বলল, "ক্লাস-টিচার তো পড়ে শোনালেন, আবার কেন ?"

"তবু দেখি।"

কাগজটা খুলতে গিয়েও আবার মুড়ে ফেলল। একটু সরে গিয়ে আমার দিকে ফিরে বললে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

"কী কথা ?"

একমুহূর্ত চুপ থেকে বলল, "তোমার বাবা তো একজন জেলের কয়েদী, তাই না ?"

"তার মানে !"

"মানে আবার কী ? কয়েদীর ছেলের সেইভাবে থাকা উচিত।"

রাগে জ্বলে উঠলাম—"সলিল !"

"কী, মারবে না কি ?"

"আমার বাবাকে অপমান করছ ! জানো তিনি কে ?"

"থাক বক্তৃতাটা দিও না।"

"তুমি আমার বাবাকে…।"

"মন্দ কিছু বলি নি। কয়েদীকে কয়েদী বলেছি।"

"সলিল ! মুখ সামলে !"

"যাও যাও, ঢের ঢের গুণ্ডা দেখেছি তোমাব মত !"

উত্তেজনার চরমতম সীমায় উঠেছি। কী হয়ে যেত বলা যায় না, পিছন থেকে হঠাৎ-ই সুকুমার এসে সরিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। স্কুলের ছুটি হযে গেছে। বাড়ীর দিকে যেতে যেতে বললাম, "শুনলি ভাই সুকুমাব, আমার বাপ তুলে সলিলটা কী বলল !"

"তুই যেমন ! ও দাম্ভিকটার কথায় আবার কান দেয় ! চল্-চল্।"

সন্ধ্যায় আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক সভা বসল। মাঝে মাঝে এ রকম বসে। উঠানে খাট পাতা। তার ওপর মামাবাবুকে ঘিরে আমরা বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সবাই। এমন কি ফাঁক পেলে মামীমাও এসে বসেন কিছু একটা সেলাই হাতে নিয়ে টিম্‌টিমে আলোটার সামনে। মামাবাবু দেশবিদেশের কত বিচিত্র গল্প বলেন। বলবার ভঙ্গীও চমৎকার। মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

সেদিন উঠল বাবার কথা। মামাবাবু বললেন, "নিখিল; আজকের খবরের কাগজ দেখেছ? দেখো নি? কাল স্কুলে লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখো। তোমার বাবার খবর। বিচার হয়েছে। মোটকথা, সবশুদ্ধ তিন বছর, তবে বিনাশ্রম দণ্ড। মেদিনীপুরে পাঠিয়েছে।"

তিনটী বছর! মনের মধ্যে সলিলের সেই কথাটা তখনও কেবলই পাক খাচ্ছে। মামাবাবু বলতে লাগলেন, "তোমার বাবার ছেলেবেলার গল্প জানো? কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। তোমায় বলব কী, আমিই তো তোমার বাবা-মায়ের বিয়ের সম্বন্ধ আনি। আমিই তো মেসোমশাইকে প্রথমে বিনয়ের কথা বলি। কী চমৎকার না বিনয়! কলেজের মধ্যে নাম-করা ছাত্র। অমন চরিত্রবান স্বাস্থ্যবান ভাল ছেলে কটা পাওয়া যায় দেখতে? নেশা তো ভাল, একটা পান পর্যন্ত খায় না! পড়ার সময়টা বেচারীর কী কষ্টেই না গেছে! পরের বাড়ী ছবেলা ছেলে পড়িয়ে, পরের বাড়ী খেয়ে, পরের বাড়ী থেকে ওকে কম কষ্ট করে পড়া চালাতে হয়েছে!"

বলে যেতে লাগলেন বাবার কলেজী জীবনের কত ছোট-খাটো ঘটনা। এত বড়, এত মহৎ আমার বাবা! তন্ময় হয়ে ওঁর গল্প শুনে চলেছি। খাবার ডাক আসতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "ভাল কথা, নিখিল, এ গরমের ছুটিতে তোমার কলকাতা যাওয়া হলো না, কার সঙ্গে পাঠাই? থাক, পূজার সময়ই যেও, কেমন?"

কিন্তু ছুর্ভাগ্য আমার বলতে হবে, পূজাতেও যাওয়া হলো না। অবশ্য মায়ের চিঠি মাঝে মাঝে পাই, যেদিন পাই, সেদিন যেন স্বর্গ পাই হাতে! ভারী সুন্দর কেটে যায় সে দিনটা!

গেল পূজা। শেষকালে যাওয়া ঘটল বড়দিনের সংক্ষিপ্ত ছুটিতেই। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে চলেছি, আসবও তাঁর সঙ্গে।

আসবার সময় কষ্ট হলো সুকুমারের। আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল বেচারী। মাধুরীদি বলল, "মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে আমাদের খুব নিন্দে করবে তো!"

"কী যে বলেন মাধুরীদি!"

"সত্যি কথাই বলি। আর কারুর না হোক আমার নিন্দে তো করবেই. কী বলো? কত বকাঝকা করি।"

"সে তো আমার ভালোর জন্যই!"

"বোঝ তাহলে? থাক থাক, আর পায় হাত দিতে হবে না, আমি এমনিতেই আশীর্বাদ করছি।"

সেই ক্ষুদ্র স্বচ্ছতোয়া নদী। চলল স্টীমার। বাঁধাঘাট পেরিয়ে গ্রামটী সম্পূর্ণ পিছনে ফেলে স্টীমার চলল এগিয়ে! রেলিং-এ ঝুঁকে আমি বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

॥ দুই ॥

আবার কলকাতা। কিন্তু কয়দিনের জন্যই বা! দেখতে দেখতে সংক্ষিপ্ত ছুটী ফুরিয়ে গেল। যেন গল্পে গল্পেই গেল কেটে। মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্তই জেনে নিতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো বেদনার ছায়া মাত্র নেই, বিপুল উচ্ছ্বাসে মাকে বলে যাচ্ছি গ্রামের কথা।

"জানো মা, কী চমৎকার আমাদের পুকুর-ধারটা! ডাহুকের ডাক শুনেছ? ডাহুক? দুপুর বেলায় যখন ঝোপের আড়ালে ডাকে! আঃ, সে কী অদ্ভুত! আর কাঠ-ঠোক্‌রা? গাছের ওপরে ধারালো ঠোঁট ঘস্‌ছে—ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌!"

কমল চুপচাপ শুনছিল, বললে, "দাদা, কাঠ-ঠোক্‌রা এনে দাও!"

"দূর পাগল!"—আমি হেসে উঠলাম, "সে কী খাঁচায় পুষবার জিনিষ? আর জানো মা, একরকম কাক আছে, এখানকার মত না, সে আরো বড়ো, তার নাম দাঁড়কাক। আর দোয়েল? সরষের ক্ষেতের বেড়ার পাশে সজনে গাছটার ওপর বসে যখন শীশ্ দেয়, এমন চমৎকার লাগে! আর সবচেয়ে মজার পাখী হচ্ছে ফিঙে!"

"হয়েছে!"—মা হেসে বললেন, "এখন গল্প থাক, আগে খেয়ে নে। জানিস খোকন, আজ কী করেছি? পায়স। যা তুই খেতে ভালবাসিস।"

"সত্যি! আর তরকারীর মধ্যে কী করেছ? ধোঁকার ডালনা?"

মা হাসছেন, "তা-ও করেছি। যাও, দাদুর হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে এসো, একসঙ্গে আজ সব খাবে।"

দাদুর কাছে গেলাম। চেহারা আরো খারাপ! আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়েছেন, প্রায়ই বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ থাকবে। কিন্তু আমাকে দেখলে আজও হয়ে ওঠেন উচ্ছ্বসিত।

"দাতুভাই, এবার অনেকদূর বেড়িয়ে এলাম।"

যেমন উত্তর দেই, তেমনি আগ্রহেই উত্তর দিলাম, "কতদূর দাতু ?"

"ওঃ! সে অ-নে-ক দূর! অমরনাথ!"—দাতুর মুখচোখ স্বচ্ছ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—"অত বেড়িয়ে শরীরটা একটু কাহিল হয়ে গেছে। এই দেখছ না, মাথায় কী একটা ওষুধ দিতে হয়েছে!"

সত্যই তো! দাতুর মাথার ঠিক মাঝামাঝি খানিকটা চুল কামিয়ে ফেলে তার ওপর সবুজ বর্ণের কী একটা ওষুধের চাপড়া বসানো। কবিরাজী ওষুধ।

"কাশ্মীর জানো, কাশ্মীর ?"—দাতু বলতে লাগলেন, "কাশ্মীর হয়ে যেতে হয়েছিল। বাবা অমরনাথ! শ্রীনগর থেকে পাহালগ্রাম। পাহালগ্রাম থেকে তুধগঙ্গার তীর ধরে যেতে যেতে চন্দনওয়ারীর কী চমৎকার রূপই না চোখে পড়ে! এর পর শোষনাগ হ্রদ, ওয়াজওয়ান, পঞ্চতরণী, তারপরেই হিমগিরির পুণ্যতীর্থ অমরনাথ! বুঝলে দাতুভাই, শ্রাবণের পূর্ণিমাতে যে অমরনাথ দর্শন করে নি, তার জীবনটাই বৃথা!"......

তন্ময় হয়ে শুনছি। বলতে বলতে মুখচোখ ওঁর হয়ে ওঠে দীপ্তিতে অপরূপ চোখে লাগে স্বপ্নের স্পর্শ! কে বললে, কে বললে আমায় দাতু পাগল? ওঁর মন ঘুরে বেড়ায়! লোকালয় ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের তীর্থপথে ওঁর পরিব্রাজক মন একাকীই হেঁটে চলেছে। মনের চোখে দেখা যে-সৌন্দর্যভাণ্ডার, তার কথা মুখে বললেই সেটা হলো পাগলের প্রলাপ! শৈশবে ওঁকে ওঁর বিপুল কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে রাত জেগে অজস্র ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে দেখেছি আজ বড়ো হয়ে ওঁর এই নিদারুণ মর্মবেদনাকে অনুভব করতে পারি। প্রচুর সম্পদের সচ্ছল দিনে এসেছে অর্থ ও সম্মান, কিন্তু সৌভাগ্যের স্বর্ণস্তূপের অন্তরালে বসে ওঁর অন্তরাত্মা কেঁদেছে; সে চায়নি অর্থ, সে চেয়েছে দীনতা ভিক্ষুকের মত বিভিন্ন তীর্থভূমির ধূলি কুড়িয়ে নিয়ে তার সঞ্চয়টি পূর্ণ-করা রেখে যাওয়া স্বাক্ষর ওঁর একান্ত কামনার ধন জীবনভোর -স্বপ্নে-দেখা "মহাতীর্থ' গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়! আজকের দাতু সেই দাতুরই অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ।

বাণী-পিসীমা প্রায়ই আসেন। একবার তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে এসেছিলেন্ ওঁদের সমিতির। মা হাসলেন,—"সংসারের বিরাট বোঝা আমার মাথার ওপর, আমার কি আর ওসব করা সাজে? সেধে সেধে ওরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, আর আসে না,—অবশ্য এক বাণী ছাড়া।"

পিসীমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি প্রণাম করতেই তর্জনীর অগ্রভাগ চিবুকে ছুঁইয়ে আপন ঠোঁটে স্পর্শ করালেন। কিন্তু এই কি আমি চেয়েছিলাম? কই আগের মত জড়িয়ে ধরে কোলের কাছে তো টেনে নিলেন না! কেন? বড়ো হয়েছি? আমার সমস্ত চেতনা ঘিরে একটা অব্যক্ত নিরাশার বেদনা বেজে উঠল। মনে পড়ল, আমার মাও আমাকে এবার তাঁর দু'হাতের নিবিড় স্নেহে কাছে টেনে নেয় নি! শুধু একবার মাথার চুলের ওপর হাতখানি বুলিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কেন? হয়ত বড়ো হয়েছি বলেই। অথচ মন মানে না প্রবোধ। অশান্ত শিশুর মত এ কী তার গুমরে গুমরে কান্না! একটা অমূল্য সম্পদ যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেললাম।

মনে এই কী-যেন-না-পাওয়ার বেদনা নিয়েই এবার মহানগরী ত্যাগ করলাম। কোথায় আমার সেই পরিচিত সহুরে বন্ধুর দল, দেখা মিলল না, অথবা আমিই দেখা করিনি। সমর নাকি একদিন এসেছিল মায়ের কাছে আমার ঠিকানা জানতে। মা দেয় নি।

আবার সেই মামার বাড়ী। ঘাটে দাঁড়িয়েছিল সুকুমার। স্টীমার তীরে ভিড়তেই প্রায় লাফিয়ে ডেকের ওপর এসে পড়ল।

"রাস্কেল! একখানা চিঠিও দিসনি? দুদিন ধরে ঘাটে এসে স্টীমার দেখছি। কাল স্কুল খুলে গেছে, একটা দিন কামাই করলি তো?"

একটু হেসে সঙ্গী ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বললাম, "এঁরই জন্য।"

চাপাগলায় সুকুমার বললে, "একা চলে আসতে পারলি না?"

নিরুত্তরে হাসলাম একটু।

ওপর থেকে নীচে নামতে নামতে আবার বলল, "আসল কথা আমাদের তুই ভুলেই গেছলি।"

"দূর বোকা!"

"বোকাই তো!" চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুকুমার বলল, "আর আমার ব্যাপার জানিস?"

"এখন থাম, নেমে নেই; কথা বলতে বলতে মানুষের ধাক্কা খেয়ে পড়বি নাকি জলে? যা ভীড়!"

ঘাটে নেমে পথের একপাশ দিয়ে চলতে চলতে সুকুমার বলতে লাগল, "সত্যি ভাই, তুই চলে গেলে মনটা আমার এত খারাপ হয়ে গেল যে কী বলব!

জানিস, এর মধ্যে একদিনও খেলার মাঠে যাইনি, একা-একা বিকেলে এদিক-ওদিক একটু বেড়িয়ে এসেছি শুধু।"

"বটে!"

"আবার কী! দিদিটা কী ইয়ে ভাই, বলে, নিখিলের হাওয়া লেগেছে তোর গায়ে। বলে, মাণিকজোড়!"

উচ্চকিত হেসে উঠলাম।

"তুই হাসলি!"—ওর চোখ অভিমানের স্পর্শে গাঢ় হয়ে গেল, "সবাই তো আর তোর মত মায়া মমতা-হীন হয় না! আমাদের শরীরে মায়া আছে মমতা আছে, তাই বন্ধুলোক কাছে না থাকলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।"

স্কুলের পিছনে আমাদের বাড়ীর দিকের রাস্তায় পৌঁছে বললাম, "এ কী স্কুলের সময় হয়ে গেছে নাকি? স্টীমার তো আজ তাহলে বড্ড লেট!

"লেট-ই তো! বাড়ী গিয়ে এখুনি চান করে মুখে দুটি গুঁজবারও সম থাকবে না!...তা হোক, ক্ষতি কী? না হয়, একটু দেরীতেই আজ আস যাবে। বাবা বকবে ভাবছি? বকবে না। তুই আজ এসেছিস যে!"

"ভাল কথা, সুকু?"

"কী রে!"

"কতগুলি ছবি আঁকলি বল?"

"ছাই। তুই না থাকলে মন বসে বুঝি ছবি-আঁকাতে?"

হেসে উঠলাম মনে মনে, একটা অদ্ভুত উল্লাস অনুভব করলাম বই কি।

"কিন্তু ভাই," সুকুমার বলল, "তুই বিশ্বাস করবি কি না জানি না, আমা মধ্যে একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। একদিন চাঁদের আলোয় চুপচা বসেছিলাম নদীর বাঁধাঘাটে, আর একদিন জমিদারবাড়ী পেরিয়ে বনের মধে দিয়ে গিয়েছিলাম বিলের দিকে। কী যে অদ্ভুত সব ভাবনা আসতে লাগ মনের মধ্যে! সে সব শুনলে লোকে হাসবে। তুই ঐরকম একা একা ব থাকতিস বলে তোকে কত ক্ষ্যাপাতুম! কিন্তু আজ বুঝছি, ঐরকম একা এব থাকা কত চমৎকার! সত্যি নিখিল, খেলাধুলো একেবারে ছেড়ে দিয়েছি ভাল লাগে না! একটা কিছু যেন করতে হবে। কিন্তু কী করব বুঝে উঠতে পারছি না!"

"ছবি এঁকে যা।"

"তাই আঁকব!" এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলল, "বাঁধাঘাটে বসে দেখা নদী

ওপারে বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে চাঁদ-ওঠা! ও তো আর শুধু চাঁদ-ওঠা নয়, সমস্ত আকাশ আর পৃথিবীতে কী যেন ঘটে গেল!"

"বাঃ! চমৎকার বললি তো!"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুকুমার, "জানি ভাই, একমাত্র তুই-ই বুঝতে পারবি আমার কথা! তোতে-আমাতে এমন চমৎকার মিল! জানিস নিখিল, কি অদ্ভুত যখন বনের মধ্যে বিলের ধারে হঠাৎ ঝড় উঠল! কী ভীষণ হাওয়া, হুটোপাটি, শোঁ শোঁ শব্দ! লোকে বলল, শীতকালে আবার ঝড় কী! আরে ভাই, ওকি ঝড়? ও যে আরেক জিনিষ! কিন্তু কী জিনিষ তা ভাই বোঝাতে পারব না! একটা-কিছু না-দেখতে-পাবার-জিনিষ, এটুকু বলতে পারি!"

সুকুমারের হাতখানা চেপে ধরলাম গভীর আগ্রহে। অনন্ত অম্বরে একাই ডানা মেলে চলছিলাম, এতদিনে উধাও-উড়ে-চলার সঙ্গী পাশে এলো।

সুকুমার বলল, "ভাল কথা! জানিস?"

"কী?"

"ওঃ। আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। কত যে বলার আছে তোকে! এবার আমাদের স্কুলের ফাউণ্ডেশন-ডে উৎসব। ষোলোই ফেব্রুয়ারী।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ রে। কত কী হবে! স্পোর্টস্, থিয়েটার, আবৃত্তি, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, কত কী! আঃ! তোকে যে কখন বলব সব! আর হ্যাঁ, থিয়েটারে পার্ট নিচ্ছিস তো?"

বললাম, "মামাবাবু বকবেন না?"

"মোটেই না, বাবার বেশ উৎসাহ। আরে, আমি শুদ্ধ পার্ট নেবো।"

"কী বই?"

"রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন।"...

"আচ্ছা সুকু, সলিলের খবর কী রে?"

"প্যাঁচা মুখ আরও প্যাঁচা হয়েছে। তুই সেকেণ্ড হয়েছিস কিনা, ওর নাক নড়েছে।"

"তারপর, নতুন ক্লাশ কেমন?"

"চমৎকার! আমাদের এবার ক্লাশ-টিচার কে হলেন জানিস?"

"না।"

"নতুন মাস্টারমশাই—সুরেশবাবু। কী সুন্দর লোক! উনিই তো এবার থিয়েটারের সব ভার নিয়েছেন!"

সুরেশবাবু গতবছর নতুন এসেছেন স্কুলে। বয়স বেশী না, অর্থাৎ কোনপ্রকারেই প্রবীণ বলা চলে না, মনে তো নয়ই। ওঁর সদা হাস্যমুখ, আড়ম্বরহীন সাধারণ বেশবাস, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার,—সব দিক থেকেই উনি ছিলেন আমাদের আদর্শ!

অতীতের শতস্মৃতিভরা বিদ্যামন্দির! স্মরণে আসতেই মনে পড়ে যায় সুরেশবাবুকে। মনে পড়ে সকলকেই। অনুকূলবাবু, সত্যবাবু, ভূপতিবাবু পতিতপাবনবাবু, একে একে সবাই চোখের সামনে এসে দাঁড়ান, যেন কালের দুস্তর ব্যবধান নিমেষে মুছে যায়, হাসিহাসি মুখে কাছে এসে বলছেন, "কীরে ভালো আছিস?"

কিন্তু সকলকে ছাড়িয়ে প্রভাতমামা আর সুরেশবাবু। আমার ছাত্র-জীবনে এঁরা অবিস্মরণীয়।

বাড়ীর মধ্যে এসে মামীমাকে প্রণাম করলাম। মামা খেতে বসেছিলেন। ভাইবোনেদের জন্য মা কী-সব খাবার করে দিয়েছিলেন সঙ্গে। সেগুলি মামীমার হাতে তুলে দিয়ে আমি আর সুকু পুকুরের দিকে গেলাম। আবগাহন-স্নান। বেশ শীত তখন। তবু ভাল লাগল।

খাওয়া সেরে পড়ার ঘরে এসে জামা-জুতো পরে বই গোছাচ্ছি, হঠাৎ একসময় মুখ তুলে দেখি, কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মাধুরীদিদি। চোখোচোখি হতেই ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে হলো যেন, বলল, "অনেক-কিছু তো অনেকের জন্য আনা হয়েছে দেখছি বড়-মানষি ফলিয়ে. আমার জন্য কী এনেছ, শুনি?"

অপ্রস্তুতের মত বললাম, "আপনার জন্য···মানে···ভয় হলো···যদি··· রেগে যান!"

"আমাকে বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভয় করে!"—মুখ ঘুরিয়ে কী রকম বিরস ভঙ্গীতে চলে যাবার উদ্যোগ করল।

"মাধুরীদি, দাঁড়ান?"

"কী?" থমকে দাঁড়াল।

এগিয়ে গেলাম। নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই শশব্যস্তে

ছু'পা সরে গেল। তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার পা ছুঁতে তোমার বড্ড লোভ, না?"

আর দাঁড়াল না, দ্রুতপায়ে চলে গেল। সেই জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টি! যেন ঝকঝকে ধারালো ছুরির ফলা! স্তম্ভিত হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার আজকের সমস্ত আনন্দ যেন নিমেষে তিক্ত বিস্বাদ হয়ে গেল!

সুকুমার এলো, বলল, "চল চল, বইগুলো নে। কী রে, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? রুটিন দেখছিস নাকি? ও বাবা! পৌনে এগারোটা! পনেরো মিনিট লেট! শীগগির আয়। জানিস? ফার্স্ট পিরিয়ডেই সুরেশবাবু।"

এলাম স্কুলে। সবেমাত্র কাল স্কুল খুলেছে, সুতরাং পড়া আরম্ভ হলো না, সুরেশবাবু আগামী উৎসবের কথা সুরু করলেন। অভিনয়ের কথা।

"অচলায়তন—তোমরা কেউ পড়েছ?"

ক্লাশ-শুদ্ধ নীরব। আমিও পড়িনি। সলিল সকলের দিকে পলক তাকিয়ে নিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমি পড়েছি।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই চোখ গেল ওর ওপর। সুরেশবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক-ইউ! এবার সংক্ষেপে আমাদের শুনিয়ে দাও তো গল্পটা!"

সলিল সুরু করল। যেন দিগ্বিজয়ী কোনো দৃপ্ত বীরপুরুষ! ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্য হিংস্রতা অনুভব করলাম! জ্বলতে লাগলাম একটা অব্যক্ত ঈর্ষার বিষে। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তমাত্র! ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল আমার মন। তখন ওর গল্পের মধ্যে চলে গেছি। আশ্চর্য! কোথায় গেল ঐ উচ্ছৃঙ্খল বন্যতা! ওর প্রতি কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করছি। সুভদ্র, পঞ্চক, মহাপঞ্চক, দাদাঠাকুর, ওদের মধ্য দিয়ে আমি ওকে দেখতে লাগলাম। উন্নত প্রশস্ত কপাল, উজ্জ্বল বড়ো-বড়ো দুটি দৃঢ় আবদ্ধ ঠোঁটের বিস্তৃতি, সুগঠিত চিবুক, সব মিলিয়ে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের বাণী বহন করত মনে হতো, আজ তা অপরূপ মনে হচ্ছে! সলিল এত সুন্দর, তাতো আগে জানতাম না।

গল্প শেষ হলো। সুরেশবাবু বললেন, "গুড। বেশ বলেছ সলিল। তোমরা সব শুনলে তো গল্পটা? এবার ওর আইডিয়াটা কী বলতে পারো? মন দিয়ে শোন সকলে।"

শুনতে লাগলাম! শুনতে শুনতে মনে হলো, এ ধরনের চিন্তা কি একেবারেই আমার অপরিচিত? চারিদিকের বিধিনিষেধের কঠিন বন্ধন,

আমিও কি কোনদিন কোন সময় অনুভব করিনি? কোনো সন্ধ্যায় একা একা পুকুরের ধারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি মনে হয়নি, একটা কঠিন শৃঙ্খলে আমাকে যেন আগাগোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে? কিন্তু কাকে বলি। সবাই হাসবে। বাস্তবিক, যা কিছু তখন বইয়ের মধ্য থেকে আহরণ করছি, মনে হতো,—আরে, এ তো সবই জানা!…

কিন্তু, আমার এ বিচিত্র মনোভাবের গুণ্ঠন-মোচন করি কেমন করে? কেমন করে বোঝাই রবিন্সন ক্রুসো পড়তে পড়তে মন বলল, এ যে আমারই কথা! উধাও সমুদ্রে পাল তুলে উড়ে যেতে গিয়ে জাহাজডুবি হয়ে সাঁতরে উঠিনি কোনো দ্বীপে? রবিন হুডের মত শেরহুডের ঘন বনান্তরালে করিনি দস্যুতা সমাজের অত্যাচারী ক্ষমতাধারীদের ওপর? গ্যালিভারের মত চলে গেছি বামনদের দেশে, দৈত্যদের দেশে। সার্লক হোমস হয়ে বাস্কাভিলের রহস্য করেছি ভেদ, আইভ্যান হো হয়ে রাজা রিচার্ডের সঙ্গে গেছি জেরুসালেমে ধর্মযুদ্ধে, ফরাসীদের ট্রু বেডুর হয়ে কত রোমাঞ্চক কাহিনীর করেছি সৃষ্টি, রাজা আর্থারের সম্মাননীয় নাইট হয়ে কত অত্যাচারী পিশাচের বক্ষ ভেদ করেছি তীক্ষ্ণ বল্লমে, গ্যাঁগোয়ার হয়ে নতরদামের গীর্জায় দেখেছি সেই কুঁজো কদাকার কোয়াসিমোদকে। প্রতি সন্ধ্যায় বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মামাবাবু দেশ-বিদেশের কত বিচিত্র গল্প বলতেন, তা কি ব্যর্থ হবার? মামাবাবু আর স্কুলের পুরাণো বড় লাইব্রেরীটা! আমাকে পথে পথে দেশে দেশে সমুদ্রে সমুদ্রে কত অদ্ভুত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই না টেনে বেড়াল!

শুধু এ নয়, আরো আছে। আরও এক ধরনের চিন্তা অলক্ষ্যে কখন প্রবেশ করত মনে। সবটা বুঝি না, কিছু বুঝি, কিন্তু বহুলাংশই তখন তমসাবৃত। তবু অন্ধ কৌতূহলের আবেগ ঘুরে ফিরে তারই দরজায় অবোধ শিশুর মত গিয়ে দাঁড়াত। কিন্তু প্রবেশ নিষেধ। নীতি-শৃঙ্খলার ঝঞ্ঝনা বাজিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত অতিকায় স্বার্থপর দৈত্য! হাতের কাছে তার একটি কাষ্ঠফলক। কঠিন অক্ষরেই খোদাই করা,—"Tresspassers will be prosecuted!"… শিউরে উঠে ফিরে আসতাম দরজা থেকে।

যথারীতি ছুটি হলো স্কুলের,—আমরা বাড়ী এলাম। সুকুমার বই রেখে হাতে পায়ে জল দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসল। একটুক্ষণ পরে আমিও গেলাম। মামাবাবু তখনো ফেরেন নি। ভাইবোনদের খাওয়া শেষ, উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি পড়ে আছে। রান্নাঘরে আমি আর সুকু। আমাদের আজ খাওয়ার তদ্বির

করছে মাধুরীদিদি। মামীমা পাশের বাড়ীতে কী একটা কাস্মিজ-কাটার শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত।

আমি বসতে-না-বসতেই সুকুমারের খাওয়া হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েই সে গেল উঠে। মাধুরীদিদি খাবারের পাত্র দিল সামনে। চিঁড়ে-দুধ-কলা। অন্যমনস্ক স্তব্ধ বসে আছি, হঠাৎ কাণে এলো মাধুরীদির হাস্যতরল কণ্ঠস্বর, কিন্তু কী যে বলল বুঝলাম না। আমাকে অপ্রস্তুতের মত তাকাতে দেখেই কাছে এগিয়ে এলো, খুব কাছে। বসল, বলল, "মেখে দেই ?"

ঠিক বুঝলাম না।

"দূর হাঁ-করা ছেলে! সুকুকে যেমন দিলুম, তেমনি খাবারটা ভাল করে মেখে দেই ?"

তথাপি অন্যমনস্কতার ঘোর কাটেনি, বললাম, "দিন।"

একটু হেসে মাখতে সুরু করল। দুধের মধ্যে ডুবান ওর আঙ্গুলগুলির খেলা দেখছি। মাখা শেষ হতেই বলল, "কী, খাইয়ে দেবো নাকি ?"

হঠাৎ অবচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠলাম যেন। চাইলাম ওর দিকে ভাল করে। এ কী হলো ? হঠাৎ এত সাজগোজ, এত হাসিখুসী ? গায় সবুজ বর্ণের সাটিনের ঝলমলানো ব্লাউজ, ফিকে সবুজ ঝিলমিল ফুল-বসানো শাড়ি, গায়ে কিছু কিছু গয়নাও। মাধুরীদিদি ততক্ষণে সত্যিই আমাকে খাইয়ে দেবার উদ্যোগ করছে। একটা হাত আমার মাথার পিছনে, অপর হাতটা খাবারের গ্রাস নিয়ে মুখের কাছে।

হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম, বললাম, "যাঃ!"

"যাঃ কী ?"

"আমি নিজেই খাচ্ছি।"

সরে গিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল মুখে আঁচল গুঁজে, বলল, "কেন, ওটাই বা বাকী থাকে কেন ? আমার হাতে খাবার সখটি তোমার কম নাকি!"

স্তম্ভিত আমি। মাধুরীদি হাসতে হাসতে চলে গেল ঘরের বাইরে, মুখ ফিরিয়ে একবার বলল, "খাওয়া হলে রান্নাঘরের আগডটা বন্ধ করে দিও। বাইরে যাবে নিশ্চয় ? তা আর যাবে না! আজ যে সোনায় সোহাগা! বাবা মহকুমায় গেছেন যে। তা যা হোক, হরিকে বলে যেও বাড়ী থাকতে, আমি ওবাড়ী গেলাম মায়ের কাছে, বুঝলে ?"

হাসির আরেকটি লহর তুলে চলে গেল। একটু পরেই হরি চাকরটার দেখা

পেলাম। প্রশ্ন করলাম, “হ্যারে, আজ বাড়ীতে কী হয়েছিল, দিদিমণির এত সাজগোজ ?”

“আজ ভুপুরে মহকুমা থেকে দিদিমণিকে দেখতে এয়েছিল যে! বাবুরে দেখেন নাই, স্কুল থেকে ভুপুরে চলে আইছিলেন ?”

বুঝলাম। খাওয়া শেষ করে হরিকে রান্নাঘর বন্ধ করতে বলে আমি আর স্বকু চলে গেলাম স্বরেশবাবুর কাছে। ফাউণ্ডেশন-উৎসব অর্থাৎ ষোলই ফেব্রুয়ারী দ্রুত এগিযে আসতে লাগল।

॥ তিন ॥

আমি ‘পঞ্চক’। আমার চারিদিকে অসংখ্য বিধিনিষেধের স্বকঠিন প্রাচীর! ওখানে যেতে পারবে না, ওর সঙ্গে মিশতে পারবে না, বাঁধাঘাটে বসে থাকতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেলে চলবে না, কারুর বাডী যেতে গেলে চাই অনুমতি, এটা করো না, ওটা করো না,—বিরাট অনুশাসন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! আমি হাঁপিয়ে উঠছি! বহুদূর! ঐ আকাশের ওপার থেকে, মেঘের পরপার থেকে কে যেন পাঠাচ্ছে তার মুক্তিব বাণী—কে যেন ডাকছে! কিন্তু কাকে এ অদ্ভুত মনোভাবের কথা বলি? মহাপঞ্চক-উপাধ্যায়েব দল তীব্র ব্যঙ্গে হেসে উঠবে বাতুলের প্রলাপ বলে! ওগো, কোন সকালে তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ, সেকথা তো কেউ জানে না! আমার মন কাঁদছে আপন মনে, কেউ কি তা বোঝে? বন্ধ এ ঘর বারবার উঠছে কেঁপে, তুমিই তো বন্ধদুয়ারে বাইরে থেকে কর হানছ, আর কেউ তো না!

আমার অভিনয় ভাল লেগেছিল স্বরেশবাবুর। এর পর থেকে তাঁর ঘরে আমার ঘন ঘন যাতায়াত চলল। তিনিই আমার সামনে খুলে দিলেন কাব্যের ভাণ্ডার—রবীন্দ্রনাথ।

স্বরেশবাবু চিরকুমার। সংসারে কেউ কোথাও নাকি নেই। পরনে মোটা কাপড়, মোটা জামা। নিজেকে যথাসাধ্য বঞ্চিত করে ব্যয়টা বেশীই করতেন পরার্থে। বহু দেশী-বিদেশী পত্রিকা আনতেন নিজে। আমরা ক্ষুধার্ত কাঠ-ঠোকরার মত তার মধ্যে ঠক-ঠক স্বরু করলাম দিনরাত!

মাঝে মাঝে মনে হতো, আমি যেন অনেক বদলে গেছি। আগের চেয়ে

গম্ভীর—আগের চেয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকি বেশী! সুকুমার ফাঁক পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে বাগানের মধ্যে কোথায় যেন যায়। একদিন চুপি চুপি গিয়ে ধরে ফেললাম। তন্ময় হয়ে বসে কী একটা বই পড়ছে। দেখলাম শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'!

একদিন সুকু বলল, "তোর সঞ্চয়িতাতে একটা কবিতা আছে 'বধূ'। পড়েছিস? মনে পড়ে?—'অশত্থ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি, সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'! এই দেখ ছবি। এঁকেছি। কেমন দেখ তো?"

ইটের প্রাচীর টুটে সত্যিই অশত্থ মাথা তুলেছে। ডুরে-লালশাড়ী-পরা একপিঠ-এলানো-চুলে ফুটফুটে সুন্দর একটি কিশোরী মেয়ে ঐদিকে ছুটে আসছে! বললাম, "চমৎকার তো!"

"মেয়েটাকে কেমন এঁকেছি? মার্ভেলাস না? মডেল হে, মডেল। মডেল থেকে আঁকা। ও বাড়ীর চাঁপাকে দেখেছিস তো? হাঁ করে পড়লি যে! নগেন বাঁড়ুয্যের মেয়ে চাঁপা! তার মুখখানা আসে কিনা দেখ তো? হুঁ-হুঁ বাবা! আর্টিস্টরা মডেল থেকে আঁকে, আমি এক বইতে পড়েছি!"

চাঁপাকে দেখব না কেন, কিন্তু হায় রে, কোথায় তার সঙ্গে এব মিল? তবুও হাসি চেপে বললাম, "তাই তো, ঠিকই তো!"

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, "শিগগির দে, দিদিটা আসছে।"

"আসুক না? ছবি এঁকেছিস, তাতে কী হয়েছে?"

ছবিটা কেড়ে নিয়ে খাতাব ভাঁজে লুকিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, "দিদিকে বিশ্বাস? এখ্খুনি দেবে ছিঁড়ে! একে ওর ঐ সম্বন্ধটা ভেঙে গিয়ে মেজাজখানা যা দাঁড়িয়েছে! আহা, বেচারী!"

ভ্রূ-দুটো একটু কুঁচকে মাধুরীদি কিন্তু এদিকেই এলো। আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কাছে এসে প্রশ্ন করল, "কী রে, কী বলছিস?"

তাড়াতাড়ি সুকুমার বললে, "ও কিছু না। বলছিলাম, দিদিটা কি সুন্দর হয়েছে দেখ।"

চকিতে আমার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, বলল, "একথা কে বলল?"

"আমরাই বলছি।"

"আমরা মানে তুমি আর নিখিল, কেমন? তা নিখিল তো বলবেই। ওর এসব কথা চিন্তা না করলে চলবে কেন!"

সেই তীব্র দৃষ্টি! চলে গেল। খানিকক্ষণ থমকে থেমে স্কুমার বলল, "আচ্ছা মোড়ল তো! কী যে বলে গেল তার মানেই বুঝলাম না ছাই। চল ভাই চল, আজ বিলের ধারে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখব চল!"

বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যেমন করেই হোক এবার থেকে যতদূর সাধ্য মাধুরীদিকে এড়িয়ে চলবই।

বই আর বই, টিফিনের ঘণ্টাতেও লাইব্রেরী ঘাঁটছি। কথা বলি খুব কম, কেন যেন অযথা বকতে আর ভাল লাগে না! বিকালে স্কুর সঙ্গে বেড়াতে যাই অনেকটা দূর,—মন খুলি একমাত্র ওর কাছেই।

সলিলকেও এড়িয়ে চলছি। এতদিন বন্ধুত্বে বাধা ছিল ও নিজে, এবার আমি। ওর দিক থেকে আগ্রহের আভাস পাই, কিন্তু আমি সাড়া দিই না, হয়ত দেবোও না। পাশাপাশি ক্লাশে বসি, কিন্তু ব্যবধান দুস্তর।

বাঁধাঘাটে বসে সেদিন স্কুমারকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম আমার নূতন কবিতাটি। স্বচ্ছতোয়া ভীরু ছোট্ট নদী। তাকেই উদ্দেশ্য করে কবিতাটি। বয়ে চলেছ কোথায় কত দূর দেশের দিকে নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। তোমার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যায় ডিঙিগুলো। ওদের কাজ ফুরায়, ফিরে আসে গৃহকোণটিতে। কিন্তু, আমি তো আসব না! আমার নৌকায় সাদা পাল তুলে দিয়ে হয়ে যাবো নিরুদ্দেশ!...মুগ্ধ অন্তর নিয়েই শুনছিল স্কুমার, শেষ হতেই বলে উঠল, "আমি আঁকব!"

"কী আঁকবি?"

"তোর কবিতা। তুই দিবি ভাষা, আমি দেবো ছবি।"

"চমৎকার হবে!"

"হবে না! তুই যখন বড় হবি, তোর বই বেরুবে, কবিতার বই!"

"কবিতার বই!"

"নিশ্চয়ই। বুঝলি নিখিল, তোর কবিতা, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আমার ছবি,—কী চমৎকার একখানা বই হবে বল তো! কত লোকে আমাদের বই পড়বে! কে? না,—কবি নিখিলেশ মুখোপাধ্যায়, আর চিত্রশিল্পী স্কুমার চট্টোপাধ্যায়! আঃ! সে যা হবে!"...

আজ সেই সেদিনকার গগনচুম্বী উচ্চাশার স্বপ্ন-সৌধকে মনে পড়ে! আজকের এই বিপুল ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সেই অত্যাশ্চর্য স্বপ্নকে মাঝে মাঝে হঠাৎ-ই মনে পড়ে যায়! কোথায় স্কুমার—কোথায় আমি! এক-

একবার ভাবি, বোধ হয় জীবনের এই একান্ত অবোধ স্বপ্নগুলিই সত্য, বাস্তবের নিদারুণ সংঘাতে ধূলিম্লান হয়, কিন্তু মুছে যায় না!

এলো গ্রীষ্মাবকাশ। কলকাতা যাওয়া হলো না। তারপর এলো পূজার ছুটি। এবারেও হলো না যাওয়া, পরীক্ষাও সামনে, পড়ার চাপ। বাৎসরিক পরীক্ষায় এবার অদ্ভুত বিপর্যয়! সুকু হলো থার্ড। আর সলিলকে ডিঙিয়ে আমি হলাম ফার্স্ট! প্রবেশিকার পাঠ্য হলো সুরু।

সুকু একদিন বললে, "কী রে ফার্স্ট হলি, অথচ এত মনমরা কেন?"

একটু থেমে বললাম, "ক্লাশে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হবার প্রতি আর মোহ নেই।"

"সত্যি ভাই, আমারও তাই মনে হয়।"

"দেখ সুকু,"—আমি বললাম, "আমার আনন্দ করা সাজে না ভাই। বড় হয়েছি, এখন কিছু কিছু ভাবতে পারি। আমাদের অবস্থার কথা ভেবে দেখ। মায়ের ওপর সংসারের ভার চাপানো, দাদুর অবস্থা ঐ, আব আমার বাবা— জেলে। কী যে হবে আমি ভেবে পাই না!"

আমার হাতখানায় মৃদু চাপ দিয়ে সুকুমার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। এই আমার একটিমাত্র সুহৃদ যে আমাকে অনুভব কবে।

ইতিমধ্যে একদিন প্রবাসী-পাত্রিকায় একটি ছবি দেখে রীতিমত চমকে উঠলাম। সত্যাগ্রহ-দণ্ডে দণ্ডিতা মহিলা শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী। চিনলাম, বাণী-পিসীর সেই মৃণালদি! বুকটা দুরুদুরু করে উঠল, বাণী-পিসীমা এর মধ্যে নেই তো! ছবি ওলটালাম, না, নেই। কিন্তু তবুও শঙ্কা গেল না। অদূরে দাঁড়িয়ে মাধুরীদি আমাকে লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে ছবিটা দেখে প্রশ্ন করল, "চমকে উঠলে যে? কে-এ? চেনো না কি?"

"না।"

আর দাঁড়ালাম না, চলে এলাম পড়ার ঘরে। ঘরে আমি একা। একটুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করলাম, নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মাধুরীদি। প্রায় ফিসফিসিয়েই বলল, "মৃণালিনী দেবী-টা কে? নিশ্চয়ই তুমি চেনো। বলবে না আমাকে?"

বললাম, "চিনি।"

"আত্মীয়?"

"না।"

একটুক্ষণ স্তব্ধ। আবার বলল সেইরকম চাপা গলায়,—"আচ্ছা নিখিল, ইনিই কি সেই…?"

আশ্চর্য হয়ে বললাম, "সেই…কী ?

"সেই—তিনি। যাকে তোমার বাবা…মানে…পিসেমশাই…। শুনেছি গো শুনেছি। বাবা-মা গল্প করছিল, আমি আড়াল থেকে সব শুনে নিয়েছি। তোমার বাবা…।"

"বলুন—বলুন ? আমার বাবা…কী ? বলতেই হবে !"

"তোমার বাবা কাকে যেন ভালবাসতেন, বিয়ে হলো না তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত।"

ভালবাসতেন ! ভালবাসা কথাটার অর্থ তখন আমি কিছু কিছু বুঝি…।

"কী, ভাবছ কী অত ?"

"মাধুরীদি ?" রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলাম, "ইনি নন। ইনি তাঁর বন্ধু। তাঁকে…তাঁকে আমি চিনি।"

"কে ?"

"বাণী-পিসীমা !"—হঠাৎ মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে গেল কথাটা।

"পিসীমা !"

"তাঁকে আমি পিসী বলি। কিন্তু আপনি যেন কাউকে এ সব কথা বলবেন না মাধুরীদি !"

"পাগল ! দাঁড়াও আসছি, তোমার কাছ থেকে সব শুনব আজ। বলবে তো ?"

কিন্তু এ কী ! এসব কী বললাম মাধুরীদিকে ! এসব কী সত্যি ! দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজলাম। কী করেছি আমি, কী করেছি ! মাধুরীদি সামনে থেকে সরে গেছে। উপায় নেই ! মুখের কথা আর হাতের ঢিল, একবার ছুঁড়ে দিলে আর কি ফিরে আসে ?…

কেটে যায় দিন। আবার ফিরে এলো গ্রীষ্ম। স্কুল বন্ধ হলো। মামাবাবু বললেন, "নিখিল, এ ছুটীতে তোমার যাওয়া দরকার। আর কিছুদিন পরেই তোমার বাবা বোধহয় মুক্তি পাবেন।"

আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম যেন,—"বাবা…মুক্তি পাবেন !"

"হ্যাঁ। কিন্তু কার সঙ্গে তোমাকে পাঠাই ? এক আমাকে নিজে যেতে হয়, কিন্তু তাতো আর হবে না, এখন কাজকর্মে জড়িয়ে আছি !"

"মামাবাবু,"—আমি বললাম, "আমি একাই যেতে পারব।"

"পারবে? পারো তো যাও, মন্দ কী।"

আবার কলকাতা। মাকে প্রণাম করতেই মা বলল, "এইমাত্র প্রভাতদাদার চিঠি পেলাম, ডাকের গোলমালে চিঠিটা কত দেরীতে এলো দেখ। তা, হ্যাঁরে খোকন, একা একা আসতে পারলি?"

"পারলামই তো!"

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল মায়ের মুখ,—"তাইতো, সেই খোকন আজ দেখতে দেখতে কত বড়ো হয়ে গেল! ওরে, তুই যে মাথায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেছিস রে, অ্যাঁ?"

"গেছিই তো।"

মা হাসল।

বললাম, "মা, তুমি এত রোগা হয়ে গেলে কেন?"

আবার হাসল, ম্লান হাসি।

"আরে বাস্, কমল? তুইও যে দিব্যি লম্বা হয়ে গেছিস!"

কমল কোথায় গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে, কাছে এসে শান্ত ছেলেটির মত আমায় প্রণাম করল, মাকেও সঙ্গে সঙ্গে করতে ভুলল না। এ সুন্দর শিক্ষাটি দেওয়া আমার মায়েব।

"মা?"

"কী রে খোকন?"

"বাবা আসছেন। বাবাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে পাবো, না মা?"

বিছানা গোছাতে গোছাতে নতমুখে মা বলল, "হ্যাঁ, আর দিন পনেরো বোধহয় আছে, সেদিন বাণী ঠাকুরঝি বলছিল।"

"পিসীমা আসেন? আমার কথা বলেন?"

মা হাসল, বলল, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, যাস একবার দেখা করতে।"

"দাঁড়াও, দাদুর কাছ থেকে আসি। দাদু কেমন আছেন মা?"

"ভাল না। যা না, দেখ গিয়ে, উনি আর বেশীদিন নেই!"

একমুহূর্ত থমকে থেমে দাদুর ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। কমল আসছে পিছু পিছু। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম একবার। এমন সুন্দর শান্ত হয়েছিস ভাইটি আমার! কমল আনন্দে আমার বুকে মুখ লুকাল।

দাদুকে দেখে চেনা যায় না—বিদীর্ণ-বিশীর্ণ বনস্পতি। মাথার মুখের

চুল-দাড়ী কামানো, ফ্যাকাসে দেহের বর্ণ। এমন হয়েছে, রাত্রিদিন শুয়ে থাকতে হয়, বিছানা ছেড়ে পর্যন্ত উঠতে পারেন না। শিয়রের কাছে সেই ময়লা পুরানো খবরের কাগজগুলো জড়-করা। নির্জীব আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন বিছানায়। কাছে গিয়ে ডাকলাম, "দাদু?"

"উঁ?"

"দাদু, আমি এসেছি!"

"উঁ?"

"আমি এসেছি!"

চোখ খুললেন, বললেন, "জাহাজ! আমাকে একটা জাহাজ দিতে পারো? আমি জাহাজে করে সোনা আনব। খুকুর গয়না গড়াতে হবে।"

"দাদু, আপনার মহাকাব্য?"

"চুপ! নীলাম হয়ে যাবে এখুনি। আমার বাড়ীখানা ওরা কেমন নীলাম করে কেড়ে নিলো, মনে নেই?"

এইটুকু কথা বলেই হাঁপাতে লাগলেন। ঠোঁটের ফাঁকে সাদা-সাদা ফেনা আবার ঘুম পাবার মত চোখ বুজে এলো। নির্জীবের মত চুপচাপ পড়ে রইলেন। আমিও সরে এলাম।

বাণী-পিসীমার কাছে যাচ্ছি। সেই রাস্তা, সেই পার্ক, সেই গলি, বাড়ীটার সামনে সাইনবোর্ডটি তেমনি ঝুলছে। পিসীমার মৃণালদি কারাগৃহে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কাজ ঠিকই চলছে মনে হলো।

বারান্দা পার হয়ে চললাম। ঐ যে কোণের দিকে ওঁর ঘরটা। কী করছেন কে জানে? হয়ত বসে বসে এখন চরকা কাটছেন। আমাকে দেখে চমকে যাবেন নিশ্চয়।

কিন্তু দরজার চৌকাঠে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো! সেই ঘর সেই আসবাব, অথচ পিসীমা ঘরে নেই, দরজার দিকে পিছন ফিরে জানালার দিকে মুখ করে টেবিলের উপর ঝুঁকে বই পড়ছে একটি অপরিচিতা অল্পবয়সী মেয়ে! গালের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছি, কানে চিকচিক করছে ঝুমকো পরনের সাড়ীটা ঈষৎ লাল। ভুল করে অন্যের ঘরে আসি নি তো? না তাতো নয়। হঠাৎ কী মনে করে মেয়েটী পিছনে মুখ ফেরাল। নিমেষের জন্য চোখের সঙ্গে চোখ গেল মিলে। কিন্তু কে এ?

॥ চার ॥

একটি মুহূর্ত। তারপরেই উজ্জ্বল হাসিতে ঝলমল করে উঠল মেয়েটা। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "নিখিলদা! কবে এলেন? বা রে, চিনতে পারছেন না বুঝি?"

"গৌরী!"

হেসে উঠল, "যাক, চিনেছেন তাহলে!"

নিরুত্তরে কতকটা বিহ্বল হয়েই চেয়ে রইলাম ওর দিকে। সেই গৌরী! বিশ্বাস হচ্ছে না! এ যেন আরেকটি মেয়ে। কী চমৎকার মুখশ্রী, কী চমৎকার চুল, কী চমৎকার হাসির ভঙ্গী।

"ও কী, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি? আসুন—ভেতরে আসুন?"

ভিতরে কয়েক পা এগিয়ে একটু সহজ হবার চেষ্টা করলাম, "আপ··· আপনি···এখানে?"

খিল খিল করে হেসে উঠল, "ওমা আমাকে আবার 'আপনি'! আমি না আপনার ছোট নিখিলদা?"

অপ্রস্তুতের মত একটু হাসলাম। সত্যি, দ্বিধায় পড়েছিলাম বই কি। একবার মনে হল, বলি, তুমিও তো আমাকে আপনি বলছ। কিন্তু না, বললাম না,—ওর মুখে আজ ঐ ডাকই শুনতে ভাল লাগছে।

"বা রে, বসুন?"

টেবিলের কাছ থেকে চেয়ারটা একটু ঠেলে এগিয়ে দিলো। বসলাম, বললাম, "তুমি?"

একটু হাসল, "আমি? কেন, এই যে টুলটা রয়েছে?"

সামনের টেবিলে দুই বাহুর ওপর ভর দিয়ে বসল একটু ঝুঁকে। সরু-চুড়ি-পরা হাতদুটি-জোড়-করা তার ওপর মাথাটা একটু হেলানো,—উজ্জ্বল দুটি চোখ আমার ওপর স্থাপিত করে বলল,—"কী জিজ্ঞাসা করছিলেন নিখিলদা? আমি এখানে কেন? জানেন না বুঝি? আমি তো অনেকদিন চলে এসেছি এখানে। এখন মার কাছেই তো থাকি।"

"হঠাৎ পিসেমশায়ের কাছ থেকে চলে এলে যে ?"

"সে অনেক কথা। আমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন শুনেছেন তো ? তুটি ভাই-ও হয়েছে। কিন্তু কী জানেন, নতুন মা ভাল লোক নন। তাই একদিন চলে এলাম মার কাছে। এখানে বেশ আছি।"

"পিসীমা কোথায় ?"

"মা ? কী কাজে যেন বেরুল, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে নিশ্চয়।"

"তাহলে তো অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় !"

"বসুন না। কতদিন পরে আপনাকে দেখলুম, একটু গল্প করবেন না ?"

সস্মিত মুখে চুপ করে রইলাম।

বলল, "ভাল কথা নিখিলদা, চা খাবেন ? চা করব ?"

"আমি তো চা খাই না। বাড়িতে কেউ খায় না, খেলে মা রাগ করে।"

হেসে উঠল, বলল, "আপনি খুব ভাল ছেলে।"

"কে বললে ?"

"জানি মশাই, জানি। আমি আপনার সব খবর জানি। মামীমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। সেদিন মামীমার কাছ থেকে সব খবর শুনে নিয়েছি।"

"মামীমা কে ?"

"আপনার মা। আমার মামীমা হলেন না সম্পর্কে ? আচ্ছা, নিখিলদা, এবার আপনার কোন্ ক্লাশ ?"

"সেকেণ্ড ক্লাশ।"

"আর একবছর পরেই তো ম্যাট্রিক দেবেন ?"

বললাম, "গৌরী, মনে আছে ? তুমি আমায় বাঁচাতে গিয়ে নিজের পিঠে…।"

বাধা দিয়ে হেসে উঠল, হাসতে হাসতে রাঙা হয়ে গেল মুখ, মুখখানা একটু নীচু করে বলল, "আছে মশাই আছে, সব মনে আছে।"

"সেই গৌরী কত বড়ো হয়ে গেছ !"

"সত্যি নিখিলদা,"—মুখ তুলল, "আমার বড্ড বাড়ন্ত গড়ন। বিশ্বাস করুন, সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছি। মা বলে, এলি, একেবারে মাথায় মস্ত ভাবনা চাপিয়ে দিয়ে এলি। দেখুন দেখি, আমার বিয়ের জন্য এখন থেকেই মাথাব্যথা ! মাকে বলেছি, বিয়ে দিও না। আমি পড়ব। কোন ক্লাশে পড়ছি জানেন তো ? ফোর্থ ক্লাশে।"

"স্কুলে পড়ো বুঝি ?"

"হ্যাঁ, মা যে স্কুলে চাকরী করে।"

"চাকরী !"

হেসে উঠল, "হ্যাঁ। না করলে চলবে কেন ? 'আমি এসে তো আরও খরচ বাড়ালুম। স্কুলে-পড়ানো, তার ওপর এখানকার কাজ, ভয়ানক খাটতে হচ্ছে মাকে।"

তখন জানালার বাইরে আকাশে বৈকাল স্তিমিত হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা আসছে। সেইদিকে তাকিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে আছি। এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি ! এইভাবে বসে থাকতেই ভাল লাগছে। কিন্তু তবু উঠতে হবে ! মার কথা মনে পড়তেই উঠবার প্রেরণা অনুভব করলাম।

"গৌরী ?"

অন্যমনস্ক অর্দ্ধস্ফুট উত্তর এলো, "উঁ ?"

"এবার যাঁই।"

"আরেকটু বসুন না ! মা এখুনি এসে পড়বে। দেখা করে যাবেন না ?"

অগত্যা বসতে হলো। বললাম,—"গৌরী, তুমি আমার বাবার কথা শুনেছ ?"

"বা রে, তা আর শুনব না ! মা-র কাছে কত গল্প শুনেছি ! আর দিন পনেরো। তারপরেই ওঁর মুক্তি। আমরা সব ফুলের মালা গেঁথে রাখব ওঁর জন্য। আপনিও যাবেন তো, নিখিলদা ?"

"নিশ্চয়ই। আমার বাবা। আমি যাবো না।"

"মা যাবেন। মামীমাও যাবেন শুনছি।"

"মা ! আমার মা !"

"সত্যি নিখিলদা, সেই কথাই হয়েছে। একটা মোটরে সবাই মিলে আমরা যাবো ওঁকে আনতে।"

"তাই নাকি !"

"কে, নিখিল না ?"

উঠে দাঁড়ালাম। পিসীমা এসেছেন। প্রণাম করতেই বললেন, "ছুটীতে এসেছ বুঝি ? কেমন আছ ? ভাল তো ? তারপর, বাবা ছাড়া পাচ্ছেন, শুনেছ ?"

"শুনেছি পিসীমা !"

"জানো মা?"—গৌরী বলল, "নিখিলদা প্রথমে আমাকে চিনতেই পারেন নি!"

পিসীমা মৃদু হাসলেন।

বললাম, "সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার যাই পিসীমা?"

"এসো। তোমার মাকে বলো আজ নানান ঝঞ্ঝাটে ওঁর কাছে যেতে পারি নি, কাল নিশ্চয়ই যাব।"

"আচ্ছা।"

গৌরী বলল, "মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।"

"আসব।"

অবশেষে সময় হলো। কেটে গেল প্রতীক্ষমান কয়েকটা দিন। সকাল বেলাতেই পিসীমা এলেন। হাতে অনেক ফুল। মাকে বললেন,—"বউদি, চন্দন বাটুন। আর ফুলগুলি রাখুন জলে ভিজিয়ে।"

"তা বলে অত কেন, ঠাকুরঝি?"

"অতই। আমার নতুনদা কী যে-সে লোক! যোগ্য অভ্যর্থনা চাই।"

প্রশ্ন করলাম, "কখন আসবেন পিসীমা?"

"বিকেলে। পাঁচটা তেত্রিশে হাওড়ায় গাড়ী এসে পৌছুচ্ছে। চিঠি দেখো নি? চিঠি এসেছে যে! আমরা সাড়ে-চারটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। কী বলেন, বউদি?"

মা কিছু বললেন না।

"বৌদি মালা গাঁথুন। আপনি দেবেন মালা, আমি পরিয়ে দেবো চন্দন। শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন দুই-ই বাটবেন কিন্তু।"

আবার প্রশ্ন করলাম, "গৌরী যাবে না পিসীমা?"

"যাবে বই কি! তার নতুন-মামা। না গিয়ে পারে? বউদি, ভারী চমৎকার হবে কিন্তু। নতুনদা এতটা ধারণা করতে পারবে না। ট্রেণ থেকে নেমেই সামনে মাল্য-চন্দন নিয়ে দাঁড়িয়ে আমি, আপনি, গৌরী, নিখিল, কমল। ওঁর দেখে যা আনন্দ হবে!"

মা তথাপি নিরুত্তর। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে মনের আবেগে ছেলেমানুষের মত বলে চলেছেন বাণী-পিসী—"জানেন, বৌদি? নতুনদার পৈতের সময় যখন রাজবেশ পরাচ্ছে, আমি তখন আঙুলে ছুঁইয়ে চন্দন পরিয়ে দিয়েছিলুম। কী গরীব-অবস্থা তখন! বাড়ীতে তো আর কোনো মেয়েছেলে

নেই। মা-মরা ছেলের কাজ করাচ্ছেন নতুনদার বাবা—আমাদের জ্যেঠামশাই।"

মা স্তব্ধ। বাবার মত আমার উপনয়নও ঐরকম অনাড়ম্বরে ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছিল। হয়েছিল একটু ছোটবেলাতেই, কলকাতার স্কুলেই তখন পড়ি।

পিসীমার ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য এলো, এবার বললেন, "এবার যাই। আমি ঠিক সময়ে গাডী নিয়ে আসব। আপনি তৈরী থাকবেন বৌদি।"

চলে গেলেন। কিন্তু সময় আর কাটতে চায় না। কতক্ষণে সাড়ে চারটে বাজবে? ঘন ঘন ঘড়ি দেখা সুরু হলো, আর, একবার-ঘর একবার বারান্দা——এই-ই চলল সমস্ত দিন। অবশেষে বাজল সাড়ে চারটে। এলো গাডী। গৌরীকে নিয়ে পিসীমা নামলেন।

"কই বৌদি, কতদূর?"

ঘরের মধ্যে আটপৌরে সাজে সেই ফুলগুলির সামনে চুপচাপ গম্ভীর বসে আছেন। চন্দনও বাটা হয়নি, মালাও গাঁথা হয়নি, উপরন্তু ফুলগুলো শুকনো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—এলোমেলো।

"সর্বনাশ! এ কী করেছেন!"

স্থির কঠোর দৃষ্টি তুলে ধরলেন মা, বললেন, "ঠিকই করেছি।"

সুকঠিন বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন বাণী-পিসী—নির্বাক—নিশ্চল।

"আমি যাবো না,"—বলতে বলতে মা উঠে দাঁড়ালেন, "আর তোমাকেও যেতে দেবো না।"

"কেন?'

"কেন যাবে? তুমি তার কে? কী আকর্ষণ তোমার ওঁর প্রতি?"

"এ কী বলছেন বৌদি!"

"ঠিকই বলছি। জানি না আমি, বুঝি না কিছু? কিসের আকর্ষণে তুমি মেয়েমানুষ হয়ে নিজের স্বামীর ঘর ছেড়ে ওঁর পিছু-পিছু ঘুর-ঘুর করছ, শুনি?"

"বৌদি?"—দুঃসহ বেদনায় চোখ ফেটে যেন এখুনি অশ্রুর প্রবাহ নামবে!

কিন্তু মা তথাপি অবিচল নিষ্ঠুর। বলতে লাগল, "তোমাকে অনেক সহ্য করেছি, আর না। তুমি সামনে থেকে চলে যাও।"

"যাচ্ছি। কিন্তু···যে অপবাদ···!"—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

"অপবাদ!"—মা গর্জে উঠল, "তুমি অতি বেহায়া, অতি নির্লজ্জ! তোমার লজ্জা করে না! কেন ওঁর দিকে তোমার এত নজর!"

কবাটটা ধরে নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করলেন বাণী-পিসী। অদূরে স্তব্ধ নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। তার হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল, সেটা কখন হাত থেকে খসে গেছে। আমি ধীরে ধীরে ওটা কুড়িয়ে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। রুক্ষ আক্রোশে ক্রোধে দুঃখে মর্মবেদনায় মার চোখ দিয়ে জল পড়ছে,—"তুমি ডাইনী! আমার হাত থেকে আমার স্বামী-পুত্র সব তুমি কেড়ে নিতে চাও। কিন্তু তা তো পারবে না। এখনো পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য উঠছে।"—উত্তেজনায় মা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

শূন্য দৃষ্টি মেলে পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন পিসীমা। তাঁর অত সাধ, তাঁর নতুনদার কপালে দেবেন চন্দন, হাতে দেবেন ফুল,—সব পড়ে রইল। আর একটি কথাও না বলে গৌরীর হাত ধরে স্খলিত পায়ে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগলেন। হিংস্র সর্পিণীর মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মা,—"তুমি যদি ওঁকে আনতে স্টেশনে যাও তো অতি বড়ো দিব্যি রইল!"

বাইরের দরজার কবাটে টলে-পড়া দেহটার ভর রেখে একটিবার মুখ ফেরালেন পিসীমা, বললেন,—"যাবো না, বৌদি।"

উঠলেন গাড়ীতে। হুড্ খোলা মোটরে কোনরকমে দেহটাকে গদীর ওপর ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়লেন। গৌরী একটু ঝুঁকে ওঁর কপালে-মুখে হাত বোলাতে লাগল। ছেড়ে দিল গাড়ী।

আমিও পা বাড়ালাম। পিছন থেকে মা বলে উঠল—"কোথায় যাচ্ছিস?"

"বাবার কাছে।"

"লুকোচ্ছিস! ওদের কাছেই যাবি! না-না, নিশ্চয়ই যাওয়া হবে না তোমার!"

"আমি যাবো।" বলে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। একবার থমকে ফিরে তাকালাম, বললাম, "বাবার প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে।"

মা ততক্ষণে সেখানেই বসে পড়েছে। গোলমাল শুনে মামুদি আর কমল ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে ওঁর কাছে। পলকের জন্য একবার দেখে নিয়ে আমি এগিয়ে চললাম।

হাওড়া স্টেশন। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে ট্রেণের সময় হলে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভীড়। কোলাহল। প্রবল ঔৎসুক্যে প্রত্যেক যাত্রীর ওপরেই দৃষ্টি ফেলছি। কোথায় আমার বাবা? ঐ, না? হ্যাঁ, ঐ! কিন্তু

এ কী চেহারা হয়েছে বাবার! শীর্ণ চোখ দুটি কোটরে বসে গেছে, চিনে বের করা কষ্টকর। ছুটে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। একটু চমকে তারপরে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

"খোকা?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"ভাল আছিস?"

"হ্যাঁ।"

"তোর দাদু?"

"ভাল নেই। পাগল হয়ে গেছেন!"

"শুনেছি। তারপরে, কমল?"

"ভাল।"

"তোর মা ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বাড়ীতেই আছিস তো?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাশ এবার তোর? কোন স্কুল?"

"সেকেণ্ড ক্লাশ। আমি তো আর কলকাতায় থাকি না, ছুটীতে এসেছি। থাকি প্রভাতমামার কাছে।"

"প্রভাত? ও বুঝেছি, আমার বাল্যবন্ধু প্রভাত। কেমন আছে সে?"

"ভাল।"

"দাঁড়া খোকা, এইখানটায় একটু দাঁড়ানো যাক।"

"কেন, বাবা?"

"কেন?"—একটু ইতস্ততঃ করলেন, তারপরে বললেন, "তোর বাণী-পিসীকে মনে আছে তো? একটু দাঁড়া। সে হয়ত এখুনি আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"পিসীমা আসবে না বাবা।"

"দূর। কে বললে?"

"পিসীমা আসছিলেন। কিন্তু…"

"কিন্তু?"

"মার সঙ্গে হঠাৎ…।"

"হঠাৎ—কী ?"

সব বললাম। বাবা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপরে চলতে চলতে বললেন, "ওদের বাড়ীটা চিনিস ?"

"চিনি।"

"চল, আগে ওখানেই যাবো।"

চলা সুরু হলো। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি আসতে আসতে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, চারিদিকে চেয়ে বললেন, "চমৎকার! এত বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সহকর্মী ছিল, একটি লোকও দেখা করতে এলো না। সংসারটাই অকৃতজ্ঞ! দাঁড়া খোকা একটু, চুরুট কিনে নিই।"

থমকে দাঁড়ালাম। চিত্রটা আমার কাছে একটা বিস্ময় বই কি! ওঁকে তো এর আগে কোনদিন কোন নেশা করতে দেখিনি!

বাস ছুটল। সেই গলি, সেই পার্ক। নেমে পড়লাম। বাবার প্রশ্ন, "কোন বাড়ীটা রে ?"

"ঐটা।"

পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে বাবাকে নিয়ে চললাম। ঐ যে কোণের দিকের সেই পিসীমার ঘরটি।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছেন। মাথার কাছে বসে গৌরী।

"বাণী ?"

ধড়্ মড়্ করে উঠে বসলেন পিসীমা,—"নতুনদা!"

"হ্যাঁ, আমিই।"

মুখে হাসি, চোখে জল, পিসীমা খাট থেকে নেমে এলেন। আলুথালু বেশবাস, চুলের রাশি খোঁপা ভেঙে এলিয়ে পড়েছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, এগিয়ে এসে প্রণামের ভঙ্গীতে বাবার পায়ের কাছে নীচু হলেন। চুলের গোছায় ঢেকে গেল বাবার পা। কয়েকটি মুহূর্ত এইভাবে কাটল। বাবা একটু নীচু হয়ে দুই হাতে তুলে ধরলেন পিসীমাকে।

ইতিমধ্যে গৌরী কখন এসে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। ওর হাতে তখন একটা লাল গোলাপের কুঁড়ি। আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে নীরবে একটু হাসল। বলল—"নিখিলদা, শুনুন ?"

"কী ?

"এদিকে আসুন ?"

অঙ্গুলি-সংকেতে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি নেমেছে। অন্ধকার বারান্দার এক প্রান্তে ডেকে নিয়ে চলল। এদিকে বড়ো কেউ আসে না, একটু নির্জন। খোলা জানালার মত খানিকটা ফাঁক। তারই মধ্য দিয়ে রাস্তার একফালি আলো তির্যক ভঙ্গীতে এসে পড়েছে। আমরা দুজনে এইখানে এসে দাঁড়ালাম। গৌরী বলল, "আপনিই নিয়ে এলেন নতুন-মামাকে, তাই না? ভাল করেছেন নিখিলদা। নইলে মা বোধহয় সারারাত আজ কাঁদতো।"

আর কোন কথা নেই! দুজনে চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে চেয়ে আছি। একসময় চমক ভেঙে গৌরী বলল,—"এই ফুলটা নেবেন ?"

"নিয়ে কী করব ?"

"আপনার কোটের কলারে পরিয়ে দিই ?"

এক মুহূর্ত থেমে বললাম, "দাও।"

কাছে এলো। ওর হাত স্পর্শ করল আমার বুকের ওপর কোটের কলারের অগ্রভাগ। অতি যত্নে ফুলটা পরাচ্ছে। ওর স্পর্শ! যেন আবরণ ভেদ করেও তার আতপ্ত মাদকতা অনুভব করছি। আস্তে আস্তে আমার জামার ওপর ওর হাতদুটি চেপে ধরলাম। হাত সরাল না, যেন আমার মুঠোর মধ্যে আশ্রয় নেবে বলেই ওর নরম ক্ষুদ্র মুঠি দুটি এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল।—"কী নরম তোমার হাত!"

মধুর স্তব্ধতায় কতক্ষণ কেটে গেল এই ভাবে কে জানে,—একসময় বলে উঠল, "আঃ ছাড়ো, লাগে।"

বাবার গলা ভেসে এলো,—"খোকা কইরে ?"

চট করে সরে এসে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম বাবার কাছে।

"বাড়ী চল। রাত হয়ে গেল।"

চললাম। নিঃশব্দে পথ পার হয়ে চলেছি বাড়ীর দিকে। আমি আর বাবা। কিন্তু বাড়ীতে কী অভিনব দৃশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, কে জানে?

॥ পাঁচ ॥

মৃতের মত নিঝুম স্তব্ধ বাড়ীটা, মনে হলো। কোলাহলমুখর মহানগরীর পথিপার্শ্বে এ কী অস্বাভাবিক স্তব্ধতা! যেন পথের-ধারে-বসে-থাকা কোন ক্লান্ত পথিক—অবিশ্রান্ত কথা কইতে কইতে হঠাৎ-ই অবাক হয়ে চুপ করে চেয়ে আছে চলমান জনস্রোতের দিকে!

দরজা ভেজানো ছিল, আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বড় ঘরটায় কেউ নেই, অন্ধকার। অদূরে রান্নাঘরে স্তিমিত একটু আলোর আভাস। বাবার পিছন-পিছন গেলাম এগিয়ে। কমল এসে বাবাকে জাপটে ধরল। বাবা ওকে কোলে তুলে নিলেন।

উনুনে ভাত চাপানো। গনগনে আগুনের আঁচ। তারই দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে মা বসে আছে রান্নাঘরে। বাবা ঘরের চৌকাট ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখ তুলে মা একবার চাইল মাত্র, কিছু বলল না। যেন সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা! বাবা যেমন রোজই সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরেন, তেমনি ফিরেছেন যেন, এতে আর নূতনত্ব কিছু নেই। অনেকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকবার পর বাবা বললেন, "ভাল আছ?"

"আছি।"

সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট উত্তর। এর পর আর কী কথা বলবার আছে? বাবা তবু আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়ত আরও কিছু বলতেন। বললেন না। ধীর পায়ে কমলকে কোলে নিয়ে সরে এলেন দাদুর ঘরে।

শান্ত হয়ে বিছানায় তেমনি পড়ে আছেন দাদু। দাদুকে দেখে বাবা একটু চমকে উঠলেন। দাদুর শরীর যে এতটা খারাপ হয়ে গেছে, উনি তা ভাবতে পারেন নি। আস্তে আস্তে শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"বাবা!"

"কে?"

"আমি বাবা, আমি বিনয়।"

"বিনয়!"

"চিনতে পারছেন না, বাবা ?"

"ও ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা তুমি ফিরে এলে যে ?"

"ছাড়া পেলুম বাবা।"

"ছাড়া পেলে ! ছেড়ে দিলে তোমাকে ! তোমায় না নীলাম করে নিয়েছিল ? তোমাকে, আমার বাড়ীটাকে !"

বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে বললেন, "এত মাথার গোলমাল ! কে চিকিৎসা করছে রে নিখিল ?"

বললাম।

"উঁহু, ওতে হবে না। ভাল চিকিৎসা চাই। কাল একজন ভাল ডাক্তারকে নিয়ে আসতে হবে।"

দাদু ডাকলেন, "বিনয় ?"

"কি, বাবা ?"

"খুকু ? খুকু কই ?"

"রান্নাঘরে।"

"খুকুর গয়নাগুলো—সব ঠিক আছে তো ?"

দাদু হাঁপাতে লাগলেন। বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনি আর কথা বলবেন না বাবা। চুপ করুন।"

দাদু তবু বলতে লাগলেন, "সোনার মুকুটটা ? পাক্কা নয় ভরি সোনা আছে ওতে। বুঝলে বিনয়, অনেক কষ্টে···। যাক, সেটা আছে তো ? না, সেটাও ওরা নীলাম করে নিয়ে গেছে !"

বাবা বললেন, "সব ঠিক আছে। আপনি এখন চুপ করুন তো ? নিখিল, যাও, মাকে খাবার নিয়ে আসতে বলো।"

"দাদুভাই ?"

চলতে চলতে দাদুর ডাকে থমকে দাঁড়ালাম।

"দাদুভাই, শরীরটা একটু ভালো হোক,—এবার ঋষিকেশ !"

মা তখনও সেইভাবে বসে। কেমন একটু সংকোচ, একটু ভয়ও করছে যেন। একটু দ্বিধার পর বললাম, "মা, দাদুর খাবার ?"

মুখ তুলে তাকাল, বলল, "নিয়ে যাচ্ছি।"

সরে যাচ্ছি দরজা থেকে, মার কণ্ঠস্বর কানে এলো, "নিখিল !"

ফিরে এলাম। অজানা ভয়ে পা কাঁপছে। বললাম, "কী মা !"

"তোমার কোটে ফুল লাগানো, কে দিলে ?"

সর্বনাশ ! ফুলটা যে ওখানে আছে, একেবারে মনেই ছিল না ! কী উত্তর দিই ? ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল।

"বাণীর ওখানে গেছলি বুঝি ? সত্যি বল। কী, চুপ করে আছিস যে ?"

ঢোঁক গিলে কোনরকমে বললাম, "হ্যাঁ।"

"হুঁ, বুঝেছি। তাই এত দেরী হলো ?"

নিরুত্তরে মুখ নীচু করে রইলাম।

"সব সমান। যেমন মা, তেমনি মেয়ে !"

আমি অবাক। মা কী অনুমান করল কে জানে।

এর পরে ছুটী ফুরানো পর্যন্ত যতদিন কলকাতায় ছিলাম, বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। সর্বক্ষণ মায়ের চোখে-চোখে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত উন্মত্ততা অনুভব করি। ইচ্ছে করে, সব কিছু ভেঙে চুরমার করে ছুটে পালাই। কেন, কেন যাবো না ? কেন মা ওখানে দেবে না যেতে ? গৌরীকে দেখতে ইচ্ছা করত। ইচ্ছা করত, ওর সঙ্গে তেমনি বসে খানিকক্ষণ গল্প করি। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রইল। আমিও যেতাম না, ওঁরাও আসতেন না আমাদের বাড়ী। তবু একদিন চকিতে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। মাকে নিয়ে কাদের বাসায় যেন যাচ্ছিলাম বেড়াতে। আমরা এ ফুটপাতে। মাঝখানে রাস্তা। ও ফুটপাতে স্কুল-ফেরৎ মেয়েদের ছাড়া-ছাড়া কয়েকটি দল ফিরছে। তারই মধ্যে ছিল গৌরী। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। ও-ও আমাকে দেখে থেমে পড়েছে। মা ধমক দিয়ে উঠল, "দাঁড়িয়ে পড়লি কেন ? শীগগির আয় !"

নিতান্ত অনিচ্ছায় পা দুটো চলতে লাগল। একটু এগিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্টের কাছে এদিকে মুখ করে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। নীলাভ একখানা সাড়ী পরা, বুকের কাছে দুহাতে চেপে-ধরা বই-খাতা-পত্র।

ছবিখানি যেন নিমেষে মুদ্রিত হয়ে গেল মনে। ছুটী ফুরিয়ে গেল, চড়লাম ট্রেনে, স্টীমারে, তবু মনে জাগছে সেই মুখখানি।

বিপুল জলকল্লোলের মধ্য দিয়ে পথ কেটে চলেছে স্টীমার। এবারকার পথের দৃশ্য—অপরূপ। বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষার প্রারম্ভ। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, নদী বিল এক হয়ে গেছে। যেদিকে চাই, উধাও বিস্তীর্ণ জলরাশি দূরে অস্পষ্ট শ্যামল তটরেখা। মধ্যে বিলের বুকে মেঘমুক্ত রৌদ্র-

সেই পুকুর, সেই বাড়ী, সেই মামা মামীমা, ভাই বোন, সেই জীবন। দিন এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে বাবা মার চিঠি পাই। দাদুর অবস্থা একই রকম। বাবা আর কিছু না করে এখন চাকরীর চেষ্টা করছেন, কিন্তু বাজার বড মন্দা।

গৌরীকে প্রথম-প্রথম ভয়ানক মনে পড়ত। সেই ছবি। গ্যাসপোস্টের কাছে বই-হাতে দাঁড়িয়ে থাকা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সময়ের ধূলিকণা জমল তার ওপর। ছবিখানা কখন অলক্ষ্যে অনাদরে ঝাপসা বিবর্ণ হয়ে গেল টেরও পেলাম না। সুকুমারকে ওর সম্বন্ধে বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু বলা হয় নি।

সুকুমারের ছবি-আঁকায় হাত আরও খানিকটা ভাল হয়েছে। ওর খাতাখানা কত বিচিত্র রেখাচিত্রে ভরা, কোনটায় রঙ্, কোনটায় রঙ্ নেই। একদিন আমাকে হঠাৎ-ই বলল, "তোকে ধরে পিটব!"

"সে কী রে!"

"রাস্কেল! কত দিন তুই তোর কবিতা পড়ে শোনাস নি, মনে আছে?"

"শোনাব রে, শোনাব।"

"বের কর খাতা। এখনো একটা পুরো খাতা ভরাতে পারলি না, কী-রকম লিখিস তুই? বের কর।"

"এখন থাক। মাধুরীদি হঠাৎ এসে পড়তে পারে।"

"দূর! দিদিটাকে তুই এত ভয় করিস কেন, বল তো?"

"ওরে বাবা! যা ঠাট্টা করবে!"

"করুক। আমার ছবি তো আজকাল খুব দেখে।"

"ক্ষ্যাপায় না?"

"কোনবার ক্ষ্যাপায়, কোনবার ক্ষ্যাপায় না।"

চুপ করে রইলাম।

সুকু বলল, "সত্যি নিখিল, এত চমৎকার লিখিস, আর কাউকে জানতে দিস না।"

"না ভাই, আমার বড়ো লজ্জা করে!"

"দাঁড়াও না, এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙব।"

"লক্ষ্মীটি ভাই সুকু, অমন কাজটি করিস নি!"

সুকু হাসল, "যাক গে। এবার বের কর তোর খাতা।"

"বের করছি। কিন্তু এখানে না, বাগানে যাই চল।"

"না, এখানেই। এমন চমৎকার ছুটীর দিনটা। এমন স্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্ন! না কী বল না, ভাষা-টাষা একটু-আধটু জুগিয়ে দে!"

হেসে উঠলাম।

"দরজাটা ভেজিয়ে দে। আমি খাতা বের করছি। কিন্তু তুই একবার দেখে আয় না স্থকু, মাধুরীদি কী করছে।"

"আচ্ছা ভীতু তো!" স্থকু বলে উঠল, "কী করবে আমাদের? আর ত ছাড়া, তুই ভেবেছিস কী? দিদিটা কী করছে এখান থেকে বলে দিতে পারি দেখ্ গে যা, বড় ঘরে ঢালা বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুম মারছে!"

"এই—আস্তে। শুনতে পাবে।"

"বয়েই গেল। নে এবার বের কর।"

চাবি দিয়ে আমার বাক্সটি খুলে অতি সন্তর্পণে খাতাটা বের করলাম।

"দেখি—দেখি? বাঃ, এ যে ভরে গেল। নে ভাই, তোর এই শেষের কবিতাটা আগে পড়।"

"তুই পড় না?"

"না, তোর মুখেই শুনতে ভাল লাগে।"

অনেক দ্বিধা, অনেক সংকোচের পর ধীরে ধীরে আরম্ভ করলাম। "কো অজানা দেশের মেয়ে তুমি আমার ঘাটে হঠাৎ তরী ভিড়ালে। আকাশের নীল রঙে ছুঁপিয়েছ তোমার শাড়ী, কালো মেঘের রঙে চুল। তোমার দুই গভীর কালো চোখ আমার ওপর রেখে চুপচাপ রইলে বসে। আমি তোমা দেখলাম। তোমার ছবি আঁকা রয়ে গেল মনে। রঙের ছবি মুছে যায়, মনের ছবি মোছে কী!"

শেষ হতেই যেন লাফিয়ে উঠল স্থকুমার,—"অপূর্ব! করেছিস কী! দেখি-দেখি?"

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই খুলে গেল ভেজানো দরজা। হাতের খাতাট তাড়াতাড়ি টেবিলের ছড়ানো বইগুলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম মাধুরীদি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। "এই যে, দুই মূর্তিমান রয়েছ এখানে!"

আকস্মিক লজ্জায় এবং ভয়ে আমার পা দুটি তখনও রীতিমত কাঁপছে।

মাধুরীদি আমার দিকে চোখ ফেরাল, তারপরে আঁচলের তলা থেকে বা করল একটা খোলা খাম আর চিঠি, বলল, "নিখিলবাবু, তোমার চিঠি এসেছে

এই নাও। কিছু মনে করো না, ভুল করে খামটা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। আমি ভেবেছি, পিসিমা বা পিসেমশাই লিখেছেন বুঝি। তা তোমার যে এত বন্ধু আছে, বান্ধবী আছে, ওরা যে আবার চিঠিও লেখে, এ'কে জানত? কলকাতার ছেলেগুলোর রকমই আলাদা!"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে দুঃসহ আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি!

সুকু বলল, "কে লিখেছে রে নিখিল?"

"গৌরী!"

"গৌরী আবার কে ভাই? কখনো তো বলিস নি ওর কথা!"

মুখটা একটু নামিয়ে, একটু বাঁকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠল মাধুরীদি, —"তোর অতশত-তে কী দরকার রে সুকু? জ্যেঠামি দেখ না ছেলের! তুই এখনো ছেলেমানুষ। তুই ওসব বুঝবি কী?"

"তুই থাম দিদি, তোকে আর মোড়লি করতে হবে না!—হ্যাঁ ভাই নিখিল, গৌরী কে, বললি না?"

বললাম, "বাণী-পিসিমার মেয়ে।"

"ও, তাই নাকি!"—কৃত্রিম বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে মাধুরীদি বলল, "যাক, আমার অনুমান তাহলে ঠিক! কিন্তু এ-ও ভাবি, এইটুকু বয়সেই এই, আরও জীবন পড়ে রয়েছে! বাব্বা, কলকাতার জ্যেঠা ছেলেদের খুরে খুরে প্রণাম!"

"খুব হয়েছে!"—সুকুমার বলল, "আর মোড়লি করুতে হবে না! আয় নিখিল। আয় পুকুর ধারে। কুঁচলতার দোলায় বসে চিঠিটা পড়া যাবে, কেমন?"

"তাই চলো।"

মাধুরীদি মুখে আঁচল গুঁজে হাসির উচ্ছ্বাসকে রোধ করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণ. ওর দিকে একবার তাকিয়েই আমরা দুজন ঘর ছেড়ে পুকুরধারের বাগানের দিকে চলতে লাগলাম! মাধুরীদির এই অকারণ হাসি অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

কুঁচলতার ওপর না বসে আরও একটু আড়ালে একটা আমগাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। সুকুমার বলল, "পড়ে শোনাবি তো?"

"নিশ্চয়ই। শোন।—শ্রীচরণেষু। পূজনীয় নিখিলদা!"...

"তারপর?"

"শুনে যাও... আপনাকে কেবলই মনে পড়ে। রোজ ভাবতুম, আজ

নিশ্চয়ই আসবেন। কিন্তু এলেন না। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া মনে পড়ে? আমি স্কুল থেকে আসছি, আপনিও মামীমাকে নিয়ে ও-ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলেছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু একটা কথাও কইলেন না। সেরাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। নিখিলদা, আমাকে এত বড়ো আঘাতটা দিলেন!"

স্কুমার মন দিয়েই শুনছিল, বলল, "কী হলো? থামলি যে?"

কেন থেমেছিলাম কে জানে। বললাম, "আরও পড়ব?"

"নিশ্চয়, সবটা।"

স্বরু করলাম,—"ভেবেছিলাম, জন্মের মত নিখিলদার সঙ্গে আড়ি। কিন্তু পারলাম না। আমার এই চিঠি, বিশ্রী হাতের লেখা, হয়ত আপনার খুব খারাপ লাগছে। নিখিলদা, আমার খালি জানতে ইচ্ছা করছে, আপনি কেন আমার সঙ্গে একবারটিও দেখা করে গেলেন না! আমি কি কোন দোষ করেছি?…নিখিলদা, আমি চিঠি পেতে বড্ড ভালবাসি। চিঠি দেবেন কী? যদি দেন তো এই ঠিকানায় দেবেন না। কারণ, দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। নতুন-মামা আর আসেন না। তিনি আসতেন বলে এখানে অনেক কথা উঠেছে। সে সব কথা চিঠিতে লেখা যায় না। এসবের জন্যেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ছাড়তে হলো। কোথায় যাই ঠিক নেই। বোধহয় মা যে-স্কুলে পড়ান, তার কাছাকাছি কোন বাসা নেওয়া হবে। হলে আপনাকে ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখব, তখন আপনি এ চিঠির উত্তর দেবেন। আর কী লিখব নিখিলদা, ওখানে গিয়ে হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন। সারাদিনের মধ্যে একটি বারও আমাকে মনে পড়ে না, না? প্রণাম নেবেন।"

শেষ। ভাঁজ করে খামে পুরলাম

কী যেন ভাবছে স্কুমার। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠল—"তোর কবিতার স্থর এইবার বুঝতে পারছি।"

"কী রকম?"

উঠে দাঁড়াল, বলল, "সত্যি ভাই, তুই-ই সত্যিকারের ভালবেসেছিস।"

চমকে উঠলাম, "দূর পাগল! কী যা তা বলছিস!"

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে আনল, "পরে মিলিয়ে নিও। আমি ঠিকই বলছি।"

ভালবাসা! আশ্চর্য হবার কথাই বটে! আমার তরুণ মন ভালবাসার রূপটি কল্পনায় এঁকেছিল আরও গভীরভাবে, আরও বিস্তৃততর পটভূমিকায়। অত সহজ ভালবাসা? না। এর অর্থ একটা মস্ত-কিছু—মহত্তর-কিছু। যা আমি এখনো অনুভব করিনি। আর গৌরী? ভাল মেয়ে। ওকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু, এ কী ভালবাসা? না-না-না। সে এ নয়, সে অন্য কিছু। সে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অপূর্ব নূতনত্ব!

"তোকে আজ একটা কথা বলব?"

"বল।'

হাতদুটো পিছনে নিয়ে পায়চারী করতে লাগল সুকুমার।

"অনেকদিন থেকেই বলব বলব করছি। কিন্তু কেমন একটা সংকোচ, কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। আজ তোকে বলব। একথা যদি কেউ বোঝে তো, সে—তুই।"

"কী ব্যাপার?"

"দেখ নিখিল," পায়চারী করতে করতে গম্ভীর ভঙ্গিমায় সুকুমার বলতে লাগল, "আমি লভ-এ পড়েছি।"

"মানে!"

"মানে—সোজা কথায় যাকে বলে—প্রেম। হ্যাঁ নিখিল, একথা সত্যি, আমি প্রেমে পড়েছি!"

আজ সমগ্র চিত্রটি মনে হলে এ নিদারুণ ছেলেমানুষী কথার প্রচণ্ড কৌতুকে হেসে উঠতে ইচ্ছা করছে! কিন্তু তখন চিন্তাশীল দার্শনিকের মতই বসে বসে ভাবছিলাম। যেন বিপুল কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা দুজন।

"মেয়েটি কে জানিস্? ও বাড়ীর চাঁপা।"

"চাঁপা! ঐ একরত্তি বাচ্চা মেয়েটা!"

"ঠিক একরত্তি না! কিন্তু, কী হল তাতে?"

"চাঁপা জানে?"

"জানবে! জানতে দেবো কেন? আমি শিল্পী। আমার প্রেম আমার শিল্পে! শিল্পের আবরণ খোলো, কিন্তু শিল্পীকে রাখো ঢেকে। এই রকম একটা কথাই আছে ইংরাজীতে।"

আজ সেদিনকার সেই নভেল-থেকে-ধার-করা সুকুমারের মুখের বড় বড় বুলিগুলি স্মরণ করে ভয়ানক হাসি পায়, কী ছেলেমানুষীর দিনই না গেছে

তখন! আজ হাসি। কিন্তু সেদিন হাসি নি। সেদিন ঐ কথাগুলোই মনে উত্তাল ঢেউ জাগিয়ে তুলেছিল। সে এক অভিনব রসাস্বাদন।

"চাঁপা মেয়েটা কী অদ্ভুত! আমার মডেল! আমার মোনালিসা।"

মেয়েটি নয়, মেয়েটিকে কেন্দ্র করে সুকুমারের শিল্পী-মনের আত্মপ্রকাশ, সেইটাই ছিল সবথেকে বড, কিন্তু তখন এ কথা বুঝবার সামর্থ হয়নি।

বিকেল হয়ে আসছিল দেখে পুকুর-ধার ছেড়ে আমরা বাড়ী এলাম। মামার ঘরে মামা শুয়ে-শুয়ে বই পডছেন, বড-ঘরে মামীমা করছেন সেলাই। মাধুরীদি কোথায় গেল?

সুকুমার বলল, "তুই পডার ঘরে গিয়ে বোস, আমি চট করে একবার ও বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি। চাঁপাকে দেখব। দেখব কিন্তু দেখা দেব না।"

হেসে পডার ঘরের মধ্যে এলাম। ঐ তো মাধুরীদি! কিন্তু টেবিলের সামনে বসে ওটা কী পডছে? আমার কবিতা! সর্বনাশ, গৌরীর চিঠি-পাওয়ার আনন্দে খাতাটা যে লুকিয়ে রেখে যাবো, তা আর মনে হয়নি, টেবিলের ওপরেই পডেছিল। গভীর লজ্জায় যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম। —"খাতাটা দিন, মাধুরীদি!"

খাতাটা নিয়ে উঠে দাঁডাল, বলল, "এই বয়সে দিব্যি পেকে গেছ। এই সব পদ্য লেখা হয়? পিসীমাকে লিখে দিই, আর কেন, ছেলের এবার বিয়ে দিন। যে-রোগে ধরেছে, পডাশুনা হবে কাঁচকলা। শুধু শুধু গুচ্ছের টাকার শ্রাদ্ধ!"

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, "ওটা দিন।"

"দাঁডাও, সকলকে দেখাই?"

"মাধুরীদি!"

"কাকে নিয়ে পদ্য লেখা হয়েছে? গৌরী? গৌরীকে বিয়ে করবে নাকি?'

"ছিঃ! কী বলছেন! আপনি ওটা দিন।"

"ইস্, অত সহজে! ও কী, আমার কাছ থেকে কেডে নেবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"ওমা, কী সর্বনেশে ছেলে গো! এই নাও বাপু, এই নাও, আমাকে আর ছুঁতে হবে না তোমার! দাঁড়াও, মাকে আমি বলছি গিয়ে সব।"

"মাধুরীদি, দাঁড়ান!".

"কী?"

নির্মম হস্তে আমার প্রাণের গোপন স্পন্দন খাতাখানি দুইহাতে টেনে-টেনে ছিঁড়ে ফেললাম।

"এ কী!"

ছেঁড়া টুকরোগুলো তীক্ষ্ণ নখে আরও টুকরো-টুকরো করে ফেললাম। সুকুমার ছুটে এলো,—"এ কী! এ কী করলি নিখিল!"

দুই চোখে বাষ্পের জ্বালা, ঠোঁট কাঁপছে, কম্পিত কণ্ঠে বললাম,—"কবি নিখিলের মৃত্যু হোক!"

মাধুরীদি বাঁকা হাসল, "কবি না কপি! এদিক নেই ওদিক আছে। রাগটি ষোল আনা!"

চলে গেল দ্রুত পায়ে। রুদ্ধ কণ্ঠে সুকু বলল, "কী কবলি, নিখিল!"

"আর কবিতা লিখব না!"

বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোর ওপরে ততক্ষণ উপুড় হয়ে পড়েছে সুকুমার। আমার কবিতা ও সত্যই ভালবাসত। কিন্তু আমার চোখে তখনও জ্বালা, মাথায় আগুন। হাতে ছিল গৌরীর চিঠিখানা। সেখানাও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

॥ ছয় ॥

যেন কোন বিরাট অগ্নিকুণ্ড! তারই মধ্যে অর্ঘ দিলাম আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ! চোখের সামনে লেলিহান আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, আর আমি সামনে চেয়ে-চেয়ে দেখছি। এই তো জীবন। এই তার একান্ত আশা—একান্ত স্বপ্নের মূল্য!

ভাল লাগে না। চোখের সম্মুখে মানুষের চলমান জীবনযাত্রা দেখছি। রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, যেন ছায়া। ছায়াছবি দেখছি! সলিল ভাব জমানোর চেষ্টা করে, আমি এড়িয়ে যাই। প্রিয়বন্ধু সুকুমার, তাকেও মাঝে মাঝে আজকাল অসহ্য ঠেকে। কথা কইতে কইতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চুপ করে যাই। সুকুমার বোঝে না। কিন্তু কী করে বোঝাই, কী করে বোঝাই আমার এই অদ্ভুত মনোভাবকে?

সুকুমার একদিন একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে এলো। ভারী সুন্দর

ঝকঝকে চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতা। বলল, "এই নে, সলিল তোকে প্রেজেণ্ট করেছে।"

"কী করব ও নিয়ে?"

"লিখবি। আবার সুরু কর ভাই নিখিল।"

"মাপ কর ভাই। যার খাতা তাকে ফিরিয়ে দাও। কবিতা আর আমার আসে না।"

"তুই নিবি কিনা বল?"

"না।"

"নিবি না?"

"না।"

রুদ্ধ অভিমান-ভরা কণ্ঠে বলল, "তোর সঙ্গে তা হলে আড়ি।"

"বেশ।"

"আর কোনদিনও মিশব না তোর সঙ্গে।"

"মিশো না।"

নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডের মত দাঁড়িয়ে রইল সুকুমার,—"বলতে পারলি ও কথা?"

"পারলামই তো!"

আর একটিও কথা না বলে চলে গেল। মনে মনে বললাম, এই তো বেশ। মনের দোসর কেউ রইল না। কারুর ভালবাসা নেই, স্নেহ নেই, ধূ-ধূ মরুভূমি দিগন্তে বিলীন। মনে হল, এই-ই তো সংসারের প্রকৃত রূপ! আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্ন-ভালবাসা, ওরা মরীচিকা! ওদের টানে মূঢ় মানুষ অন্ধের মত ছুটোছুটি করে, পায় না!

সুকুমারের সঙ্গে সত্যিই 'আড়ি' হয়নি। কিন্তু কোথায় যেন ধীরে ধীরে একটা ব্যবধানের চরভূমি জেগে উঠেছে। আমার সে মন আস্তে আস্তে পরিবর্তনের মুখে এগিয়ে চলেছে। সলিলের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আরও ঘন হচ্ছে লক্ষ্য করছি। সলিল আমার সঙ্গেও কথা বলে, আমি উত্তর দেই, আমল দিই না। একদিন সলিল ডেকে বলল,—"আমার সামান্য উপহার তুমি নিলে না নিখিল?"

"তার জন্য ক্ষমা করো ভাই। কবিতা আর লিখি না, শুধু শুধু ও খাতা নিয়ে কী করব? আর তাছাড়া, তুমিই তো বলেছ একদিন, কয়েদীর ছেলের সেই ভাবেই থাকা উচিত। আমার কী ভাই সাজে কোন বিলাস?"

অতর্কিত আঘাতের বেদনায় বিবর্ণ হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, একটি কথাও পারল না বলতে। ওর ব্যথিত স্তম্ভিত মুখের দিকে চেয়ে মনের মধ্যে তখন একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করলাম।

সে রাত্রে সুকুমার বলল, "তুই কী হচ্ছিস বল তো দিনকে দিন! একে তো মায়া-মমতা তোর মধ্যে বরাবরই একটু কম, তার ওপর এখন আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিস।"

"কী রকম?"

"সলিলের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছিস! ও তোকে কম ভালবাসে? বেচারী ভয়ানক মনমরা হয়ে গেছে।"

একটু বাঁকা হাসলাম।

সময় পার হচ্ছে। গেল শীত, গেল বসন্ত, এল বৈশাখ গ্রীষ্মের খর-প্রদাহ নিয়ে। বাবার চিঠি পাই। চাকরীর জন্য বহু চেষ্টার পর পঞ্চাশ টাকার একটা মাস্টারী জুটেছে। খাতায় লিখতে হয় পঁচাত্তর, পান পঞ্চাশ, সাধারণ স্কুলের যা দুর্গতি। নূতন বাড়ীতে উঠে এসেছেন, দাদুর অবস্থা একটু ভাল। আমার ওপর ছুটীতে যেতে নিষেধ করে মন দিয়ে পড়াশুনা করবার আদেশ হয়েছে। বাণী-পিসীদের কোনো উল্লেখ নেই চিঠিতে।

আর একটি আঘাত দিয়েছিল গৌরী। সে চিঠি দেবে লিখেছিল. কিন্তু দেয়নি। নূতন ঠিকানা জানাবার কথা ছিল, কথা রাখে নি। কোন খোঁজ খবর নেই। প্রথম-প্রথম চিঠির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। কখন ডাক আসে, কখন ডাক আসে। কিন্তু দিনের পর দিন কাটল, চিঠি আর এলো না। ক্রমে ক্রমে সবই সয়ে গেল। ধীরে ধীরে সমস্তই ভুলে যেতে আরম্ভ করলাম। এমনই হয়, ধূ-ধূ বালুর ওপরে কত পদচিহ্নই পড়ে, কিন্তু সবই একদিন মুছে যায়।

সুকু বলল,—"ওহে দার্শনিক!"

দার্শনিক! কথাটি বেশ। আমি কি দর্শন করছি? প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত কী লীলা ঘটছে মহাবিশ্বে, সব কি ধরা পড়ে আমার চোখে? সুকুর সম্ভাষণে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আগে ডাকত কবি। আর আজ—বোধ হয় আজকেরটাই সত্য।

হেসে কাছে এলো,—"কী ভাবছিস? বলি, ওহে মহেশ্বর, মর্ত্যধামের খবর কিছু জানো? তুমি তো তোমার অধ্যয়নের তপ নিয়েই ব্যস্ত। না, এবার নির্ঘাত ফার্স্ট হবি!"

হাসলাম, "কী বলবি বল।"

"আমার চাঁপা।"

সাগ্রহে বললাম, "কী ব্যাপার ?"

"চাঁপা নয়, নাম তার চম্পা। পাতার আড়ালে ফুটেছে গোপনে-গোপনে, তারি ছবি আমি এঁকেছি স্বপনে-স্বপনে!"

"ওরে বাবা, এ যে কবিতা!"

"হ্যাঁ কবিতা," স্নকুমার বলল, "দিদির ভাষায় 'পদ্য' নয়। কী করব, তুই ছেড়ে দিলি, এবার আমিই স্নরু করলাম। আমি কবি স্নকুমার। জানিস, সলিলও লিখছে। দিদিটা কী বলে জানিস ? বলে, কপির চাষ হচ্ছে!"

হেসে উঠল। আমি তাতে যোগ দিলাম না, বললাম, "মাধুরীদিকে বলিস, চাষ হয়েছে সত্যি। কিন্তু একটি মূল্যবান ফসল মরে গেছে!"

নিমেষে গভীর হয়ে উঠল আবহাওয়া। ও বলল, "চমৎকার লিখতিস ভাই, কেন ছেড়ে দিলি ?"

চুপ করে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে স্নকু বলল, "তারপরে শোন, যা বলছিলাম। সেদিন চাঁপাকে দেখে গেছে। বর নিজেই এসেছিল দেখতে। বেশ ছেলেটা। দিদিটা বুড়ো ধাড়ী পড়ে রইল, আর ঐটুকু মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে। কবে জানিস্? বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ্র রজনীতে, মোর প্রিয়া হয়ে যাবে পর! হাঃ হাঃ! কেমন? 'শুভ্র রজনী' কথাটা চলতে পারে তো ?"

স্নকুমার হাসতে লাগল।

এলো বৈশাখী পূর্ণিমা। পাশের বাড়ীতে উৎসব-সমারোহ। আমি-স্নকু দুজনেই বিয়েতে খাটছি। মাঝে একবার আমাকে অন্ধকারে নিয়ে এসে স্নকু বলল,—"শুভদৃষ্টির সময়টা লক্ষ্য করেছিস ? সত্যি, আমি ছবি আঁকব। কিন্তু রেখায়, না লেখায় ?"

বললাম, "দুয়েতেই।"

"রাইট!"—স্নকু বলল, "চাঁপাটা এত স্নন্দর!—এত অপরূপ রূপ কোথা ছিল ওগো অপরূপা চম্পা!—কেমন লাইনটা ? বা! বেশ কবিতা হয় তো ? কিন্তু চম্পার সঙ্গে কী মিল দেবো বলত ?"

"আস্তে, আস্তে। চারিদিকে লোকজন! শুনতে পাবে কেউ।"

"এদিকে সরে আয়। ওরা থাক আলোয় স্পষ্ট হয়ে। আমরা অন্ধকারের আবরণে ঢাকা! ছবিখানি একবার ভেবে দেখ। রাঙা চেলির ঘোমটায়

মুখটি লুকানো। পিঁড়িতে কবে নিয়ে এলো বরের সামনে। তোল মুখ—তোল মুখ। ধীরে ধীরে লাজারুণ মুখখানি তুলল। কাজল-ছোঁয়ানো দুটি কালো চোখ। চোখদুটি একমুহূর্ত রাখল ববের চোখে। ঠোঁটের ফাঁকে চকিতেব জন্য একটু হাসির রেখা। হাতের মালাগাছটি এগিয়ে দিলো। কী চমৎকার বল তো!"

হেসে উঠলাম, "লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে নিয়েছিস তো?"

'কেন দেখব না। চাঁপা ইজ্ মাই ক্রিয়েশন। আমি দেখব বই কি। অলক্ষ্যে ভালবাসাব ডালি তুলে দিয়েছি হাতে। ডু ইউ ফিল্ মি?"

মুখ টিপে হাসলাম, "কষ্ট হচ্ছে বুঝি?"

"কষ্ট!"—সুকুমারেব চোখদুটো প্রদীপ্ত দেখাল, "কামনাব ধন নয়, স্বপনেব ধন। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্? আমাকে কি রাম-শ্যাম-যদু-মধু পেলি নাকি? নিখিলেশ, এ আর কেউ না, এ আমি। আমি কবি সুকুমার।" বলেই কোমরের গামছাটা শক্ত করে ধুতিব ওপবে জড়িয়ে নিতে নিতে বলল, "নে আয়, লুচিব ধামাটা তুলে নিবি। ববযাত্রী খেতে বসেছে।"

অন্ধকারের আত্মগোপনতা থেকে দ্রুতপায়ে আলোয় এলাম।

বিয়ের বাজনা শীগগির আমাদের বাড়ীতেও বাজল। গেল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, এলো শ্রাবণ। মাধুরীদিব বিয়ে হয়ে গেল। দূরে নয়, কাছেই। মহকুমার সার্কেল-অফিসার,—তারই ছেলে কলকাতায় এম্ এ আর ল' পড়ছে। [illegible] জামাইবাবুটি আমাদেব বেশ লোক। আমাদেব সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। মাধুরীদির সঙ্গে আমি আর সুকুও গিয়েছিলাম। ওঁরা সকলেই খুব ভাল লোক। অষ্টমঙ্গলায় জোড়ে একবার এসে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল মাধুরীদি। ওর হাসি-হাসি মুখ দেখে আমাদের সকলেই খুব খুশী হলেন।

এর পরে মাঝে দীর্ঘদিন মাধুরীদির সঙ্গে দেখা হয়নি। পূজায় ওঁরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই ছুটীতে ওঁদের নিজেদের দেশে গিয়েছিলেন।

মাধুরীদি নেই, বাড়ীটা সত্যই কী রকম ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। পড়ার চাপ। মাঝে মাঝে তার মধ্য থেকে হঠাৎ মাধুরীদিকে মনে পড়ত, কিন্তু এ-ও মনে হতো, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি! আর আশ্চর্য, ধীরে ধীরে মনের মুহ্যমান অবস্থাটা কেটে যেতে লাগল, আবার পূর্বের মত সহজ হয়ে উঠছি। সলিলের সঙ্গেও আর খারাপ ব্যবহার করি না। আর কদিন? কদিনই বা আছি এই পল্লীর পরিবেশে? পরীক্ষা আসছে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিদায় নেবো। পাতার

আড়ালে-মুখ-লুকিয়ে বাসন্তী-মধ্যাহ্নে কোকিলের কুহু-কুহু,—তা আর শুনতে পাবো না। আর বসতে পাবো না বাঁধাঘাটের ধারে, শুনব না ছোট্ট নদীটির ছলোছল ভাষা! শরতের কাশগুচ্ছের শুভ্র সমুদ্রে বাতাসের দোল, বাঁশ বনের মধ্য দিয়ে দমকা হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস,—বিলের অগাধ উধাও বর্ষার জলরাশির ধারে দাঁড়িয়ে আর দেখব না সূর্যাস্ত!

সেদিন বিকেলটা হঠাৎ-ই মেঘ-থমথমে হয়ে এলো, অদ্ভুত হয়ে উঠল সেদিনকার পল্লী-পরিবেশ! বই রেখে উঠে পড়লাম। একা একা এসে বসলাম নদীর ধারে বাঁধাঘাটে। বৃষ্টি নেই, ওপরে হিল্লোলিত কাশের বনের প্রান্তে আকাশে বিদ্যুৎ উঠছে ঝলসে। একটা নৌকা এসে লাগল ঘাটে। নামলেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। কাছে এসে বললেন, "খোকা, প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী চেনো?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম, "উনি তো আমারই মামা!"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, বললেন, "ভালই হলো। চলো বাড়ীতে। অনেক দূর থেকে আসছি। তোমার মামা আমার ছাত্র ছিল, বুঝলে?"

বাড়ীতে নিয়ে যেতে সমারোহ পড়ে গেল। মামা নিজে এসেই ওঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। ক্রমে সবই শুনতে পেলাম, উনি পরিব্রাজক, বহুদিন থেকে বহুদেশ পর্যটন করছেন, আরও করবেন। বয়স বললেন, সত্তর পেরিয়ে গেছে, অথচ স্বাস্থ্য কী চমৎকার! আমাকে দেখিয়ে প্রভাত-মামা ওঁকে এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "একে চিনতে পারেন?"

আমার দিকে খানিকক্ষণ রইলেন তাকিয়ে, বললেন "না তো! কে ও?"

"বিনয়ের ছেলে—নিখিল। আমার কাছে থেকে পড়ে।"

"কোন বিনয়? মুখুজ্যে? ও হো—আমাদের বিনয়! তাই বলো!"

প্রভাত-মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "নিখিল, ইনি তোমাদের দেশের লোক। তোমার বাবা ঠাকুর্দা সবাইকে চেনেন।"

দেশের লোক! কোথায় আমাদের দেশ? জন্ম থেকেই তো দেখছি কলকাতা। শুনেছিলাম মায়ের কাছে, বর্ধমানের ওদিকে কোথায় নাকি আমাদের বাড়ী ছিল।

"খোকা?"—উনি বললেন, "দেশে গেছ কোনদিন? দেখেছ দেশ?"

মাথা নাড়লাম।

"তোমরা অনেকদিন থেকেই দেশছাড়া। তোমার ঠাকুর্দা বাড়ীঘরদোর

বিক্রী করে সহরে চলে গেল। কী লাভ হয়েছে বলতে পারো? আমি বুঝি না কেন যে মানুষ আপন গাঁ ছেড়ে সহরে যায়। বুঝলে খোকা, আমি তোমাদের সব জানি। গ্রাম-সম্পর্কে আমি তোমার ঠাকুর্দা। তোমার বাবা আমাকে 'কাকা' বলতো।"

গড়গড়ার নলে টান দিয়ে আরামে চোখ বুজলেন, "আঃ! কেন যে লোকে বিড়ি সিগারেট খায়! দু চক্ষে দেখতে পারি না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দাদার যে কী দুর্মতি হলো, দাদা মানে তোমার নিজের ঠাকুর্দার কথাই বলছি। বৌদি মারা গেলেন, বিনয় খুব ছোট। তার হাত ধরে চলে গেলেন কলকাতায় পিতৃ-পিতামহের অতদিনকার ভিটে বিক্রী করে। কী লাভটা হলো? কলকাতায় নিজের বাড়ী বলতে কিছু নেই, পরের বাসায় ভাড়াটে হয়ে মাথা-গুজড়ে থাকা। এখন তোমাদের বাড়ী কোথায় বলতে বুঝব কী? না রইল দেশে বাড়ী, না সহরে। পরগাছের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ানো!"

একটু থেমে, গড়গড়ায় টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলেন, 'অথচ তোমাদের সবই ছিল। প্রকাণ্ড মজবুত আটচালাগুলা, প্রকাণ্ড মাছভর্তি পুকুর, প্রচুর ধানের জমি, বড়ো বড়ো ধানের গোলা। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তা সরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের অংশগুলো সব বিক্রী করে দাদা ন্যাড়া হয়ে বসলেন! তা-ও বলি, কত টাকাই বা দাম উঠেছিল? শেষ বয়সের সন্তান—বিনয়, কতো আদরের। সেই বিনয়কে কতো কষ্টই না সহ্য করতে হলো! দাদাও তো আর বেশীদিন বাঁচলেন না। আরে ছ্যাঃ, সহরে নাকি আবার স্বাস্থ্য টেঁকে?"

সৌম্য শান্ত চেহারা, বাক্যে ও ব্যবহারে তিক্ততা নেই, ওঁর সমস্তটাই যেন খুসী হওয়ার জ্যোতিতে ঝলমল! এলেন সামান্য দিনের জন্য, গল্পও বললেন সামান্য, কিন্তু যেটুকু দিয়ে গেলেন, তা আমার চিরদিনের সম্পদ হয়ে রইল! কল্পনায় দেখি আমাদের সেই অতীত সমৃদ্ধি! মরাই-ভর্তি ধান, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ। স্নিগ্ধ পল্লীশ্রী! হয়ত ওখানকার মতই কোন সমৃদ্ধ গ্রাম। এমনই নির্জন নদীতীর, এমনই ডাহুক-ডাকা তন্দ্রালস ক্লান্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

রূপোপজীবিনী নগর-সভ্যতা মদির কটাক্ষের সম্মোহে ডেকে নিয়ে গেল গ্রামের সহজ সরল মানুষকে। সেই মানুষেরই নাগরিক বংশধর আমরা, তার প্রলোভনজাত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, যাযাবরের মত নগরের কোটরে কোটরে বাসা বাঁধছি, বাসা ভাঙছি! অভিশপ্ত

মধ্যবিত্ত জীবন। এ জীবনের উৎপত্তি কিসের থেকে? পূর্বপুরুষদের স্খলন
থেকে নয় কী?

যে-সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী চলে গেলেন, সেরাত্রে অকস্মাৎ স্বপ্ন দেখলাম,—বড়ে
একটা রেল-স্টেশন, এ-লাইনে ও-লাইনে অনেকগুলো গাড়ী রয়েছে দাঁড়িয়ে
এদিক-ওদিক বিশৃঙ্খল জনতা। ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ-ই দেখতে পেলাম দাদুকে
হাতে একটা ছড়ি, একটা কামরার দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমাকে দে
সহাস্যে বলে উঠলেন, "দাদুভাই, চল্লাম।"

"কোথায়?"

চোখমুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল, হাতের ছড়িটা উর্ধে তুলে বলে উঠলেন
"কৈলাস!"

"আমি যাবো।"

জিভ্ কাটলেন, "তা কি হয়!"

"না, আমি যাবো।"

আমাকে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দিলেন, "তোমাকে তো এ
যেতে দেবে না ভাই!"

কেঁদে উঠলাম, "দাদু, আমি যাবো।"

নির্মম হস্তে নিজেকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ির কামরা
উঠলেন, "দাদুভাই, আমি চললাম। এবারে কৈলাসে যাবই!"

ট্রেন ছাড়ল। আমি পিছনে পিছনে দৌড়াতে সুরু করলাম। অদূরে
অপস্রিয়মান কামরা থেকে হাসিমুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে দাদু এইদিকে চেয়ে হা
নাড়ছেন। দেখতে দেখতে ট্রেন হয়ে গেল একটা কালো বিন্দু। আমি ধ
করে স্টেশনের ওপরই বসে পড়লাম।

ধড়মড় করে জেগে উঠতেই দেখি, দুচোখ কান্নায় ভরে গেছে। এ
অদ্ভুত স্বপ্ন! এর দু তিন দিন পরেই কলকাতার চিঠি এলো, দাদু মা
গেছেন।

প্রভাত-মামাকে বাবা লিখেছেন, আমাকে যেন আসতে না দেওয়া হয়
কারণ, পরীক্ষা সামনে। শ্রাদ্ধের দিন পুরোহিত ডেকে কয়েকটা মন্ত্রপাঠ এ
একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে দক্ষিণা দান করলেই চলবে।

দাদু নেই! উধাও মাঠের পাশের রাস্তাটা দিয়ে একা হন্‌হন্ করে নিজে
অজ্ঞাতসারেই হেঁটে চলেছি। দাদু নেই! তাঁকে আর পাবো না দেখতে

াবো না শুনতে তাঁর কল্পকথা। কথাটা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।
াড়ীতে মামাকে তুফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখলাম; তিনি নাকি দাত্নর
াছেই ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়ে উঠেছেন, দাতুও নাকি খুব স্নেহ করতেন
কে। কিন্তু কই, আমি তো কাঁদতে পারছি না, আমার চোখে জল কই! এই
য পৃথিবী, এটা কী সত্য? এই যে আমি, আমি কী সত্য? ঐ যে দূরের জলের
াশি দেখতে পাচ্ছি, ও কি সত্য? হয়ত সব মিথ্যা। একদিন চোখের পর্দা কেউ
য়ত দেবে সরিয়ে, সেদিন দেখব সমস্তই ভুল, সমস্তই বাজে, সমস্তই মিথ্যা!……

"নিখিলেশ?"

হাতটা ধরে শক্ত করে কে যেন অকস্মাৎ নাড়া দিল! চমকে জেগে
ঠলাম। এ আমি কোথায়? আমি না আমাদের বাড়ীর পুকুর-ধারটায়
সেছিলাম? এখানে এলাম কেমন করে? দূরে যেদিকে চাই উধাও মাঠ,
দূরে একটা খাল বয়ে চলেছে। আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সলিল,
পর হাতে ধরা সাইকেলের হাণ্ডেল।

"কোথায় যাচ্ছ ভাই, ফিরে চলো। ডাব্‌ল্ রাইড্ করবে।"

"না

নিশ্চুপ পথ পার হচ্ছি। সলিল বলিল, "আমি সব শুনেছি। কী বলে যে
ান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না ভাই। দাত্ন যে তোমার কতখানি ছিলেন তা-ও
নেছি। কিন্তু কী করবে, জন্ম-মৃত্যুর ওপর মানুষের হাত নেই।"

এতক্ষণে ঝর্‌ঝর্ করে ঝরে পড়ল চোখের জল। একহাতে সাইকেল, অপর
াতে আমাকে নিবিড় বন্ধুত্বে কাছে টেনে নিল, একটু থেমে রুমালে সযত্নে
ছিয়ে দিল চোখ। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলল—"বন্ধু!"

সাড়া দিলাম। আজ অতি তুর্দিনেই ও কাছে এসেছে, নিবিড় আগ্রহে ওর
াতখানা চেপে ধরলাম।

ও বলল—"স্বকুও তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে গেছে মহকুমার
াস্তায়। পা চালিয়ে চলো, বাড়ীতে সব ভয়ানক ভাবছে!"

ওর হাত ধরে চুপচাপ এগিয়ে চললাম। এই সলিল আমাকে কতো ব্যথাই
দিয়েছে একদিন! আর আজ? সব বেদনায় ব্যথিত, স্নেহে নিবিড়,
ালবাসায় ভরপুর। কী বিচিত্র!

টেস্ট হয়ে গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে বিশ্ববিত্থালয়ের পরীক্ষা। প্রস্তুতির
াকে ফাঁকে মাঝে মাঝে আলোচনা করি ভবিষ্যতের কথা। তিনজনের

চোখেই তখন স্বপ্নের উজ্জ্বলতা! সলিল বলল,—"আমি বোধহয় কলকাত যাবো। কী নিখিল, আমি আর তুমি। বেশ এক কলেজে পড়া যাবে। সুকু তুই-ও চল না ভাই ?"

মাথা নাড়ল সুকু, বলল—"রাম না জন্মাতেই রামায়ণ হয়ে গেছে। আমা ব্যবস্থা বাবা মা সব ঠিক করে রেখেছেন। বহরমপুরে আমার নিজের মা প্রফেসর, আমি সেখানে পড়ব।"

সলিল বলল—"আরে, আমার এক কাকাও ওখানে থাকেন। কে জানে বাবা শেষকালে কলকাতা না পাঠিয়ে আমাকে ওখানেই পাঠান কি না!"

"নিখিল তো এবার পুরো ক্যালকেসিয়ান্ হয়ে যাবে।"

একটু হাসলাম! উচ্চাকাঙ্খার মোহে মন স্বপ্নময়।

অবশ্য ওরকম আলোচনায় মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যেতো। কিন্তু কতব ক্ষণের জন্য? নিমেষে মনের আকাশে মেঘের আনাগোনা। দাদুর কথা মে পড়তেই মনটা হু হু করে উঠতো!

সুকুমারের সেদিন একটু জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। মামাবাবু বললেন- "নিখিল, তোমাকে তো একটা কাজ করতে হয়।"

"বলুন ?"

"মহকুমা চলে যাও। তোমার দিদিকে নিয়ে এসো। মোটর পাওয়া যা না, নৌকোতেই আনতে হবে। ঘাটে যাও, বুড়ো রহমানকে বলে এসেছি সে ঘাটে নৌকো নিয়ে বসে আছে। নৌকোয় যাও, নৌকোয় আসবে একখানা চিঠি দিচ্ছি, বেয়াই মশায়ের হাতে দেবে। আর দেখ, খুব দের করো না, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে এসো।"

"আচ্ছা।"

আবার মাধুরীদি! প্রস্তুত হয়েই ছিল, বেশী দেরী হলো না। লালরঙে জমকালো সাড়ী পরনে, ঠোঁট দুটি পানের রসে টুকটুকে লাল, পায়ে আলত ঘোমটার নীচে সীমন্তে সিঁদুরের প্রসারিত রেখা। নৌকায় উঠতেই নৌ দিল ছেড়ে। ছোট্ট নৌকা। বুড়ো রহমান পিছনের গলুইয়ের ওপর ব শক্ত হাতে বৈঠা ধরেছে। আমি ছইয়ের বাইরে অপরদিকে বসে আ সামনে তাকিয়ে। ছইয়ের মধ্যে মাধুরীদি। তরতর করে জল কেটে নৌ চলল। অনেকক্ষণ চুপচাপ চলে আসার পর ভিতর থেকে মাধুরীদির সা পেলাম—"নিখিল ?"

"বলুন ?"

"কতদিন পরে মা বাবার কাছে যাচ্ছি, তাই না ? ওকি, তুমি মুখ ফিরিয়ে রে বসে যে ? ওখান থেকে বাইরেটা বেশ দেখা যায় না ? দাঁড়াও, তামার কাছে যাচ্ছি। ও কী রহমান, নাও টলে যে !"

"টলবে না দিদিমনি, এই বুড়ো রহমান যতদিন বৈঠা ধরবে। আপনি াস্থির হবা না, চুপ করে বসো।"

মাধুরীদি কাছে এসে বসল,—"আঃ, কী সুন্দর ! হ্যাঁ রে নিখিল, বাড়ীর ব ভালো ? দাদু মারা গেছেন শুনলাম। আহা ! অবশ্যি, গেছেন ভালই গছেন, বয়সও তো হয়েছিল।"

চুপ করে রইলাম !

মাধুরীদি বলল—"সুকু এলো, তুই আমাকে কিন্তু একদিনও দেখতে যাস নি ! ক্ষী ভাইটি, তোর চেহারা এত খারাপ হল কেন ? খুব ভাবিস বুঝি দিনরাত ? ক্ষীটি, অত ভেবো না, জন্মমৃত্যুর ওপর মানুষের হাত আছে ?"

বিদ্যুৎ বেগে মুখ ফেরালাম। আমার খুব কাছেই মাধুরীদি, একেবারে াশে বলা যায়, ছইয়ের বেড়ায় আলগোছে মাথা রেখেছে, ঘোমটাটা খসে গছে। মাধুরীদি সুন্দর, আজ আরও সুন্দর আরও মহনীয় দেখাচ্ছে। সেই াধুরীদি ! কিন্তু আজ ওর কণ্ঠে এ কী অভাবনীয় সুর ! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ইলাম কয়েকটা মুহূর্ত !

"কী দেখছিস ? লজ্জা করছে বুঝি ? দূর বোকা, বড়ো বোনের কাছে াইয়ের আবার লজ্জা কী ? আয়, কাছে সরে আয় দেখি ?"

নিবিড় স্নেহে হাতখানা বাড়িয়ে আমার রুক্ষ চুলের মধ্য দিয়ে চালনা করতে াগল, বলল—"তোদের জামাইবাবুর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে রে ?"

"হ্যাঁ, খুব ভালো লোক।"

"ভালো না ছাই। ন'মাসে ছ'মাসে একখানা চিঠি, তা-ও সময় মত য় না !"

একটু হেসে উঠলাম। নৌকা তখন একটা বাঁকের মুখ দিয়ে চলেছে। লের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—"সেই নিখিল ! কতো বকা-ঝকা রেছি। সত্যি, কি রকমটাই না ছিলাম তখন ! হ্যাঁ রে, সেই গৌরী আর তাকে চিঠি দেয় ?"

"না।"

"কেন রে ?"

"জানি না।"

"নিখিল, ঐ না আমাদের স্টীমারঘাটটা দেখা যাচ্ছে ?"

"হ্যাঁ।"

"অত লোক কেন ? ও, আজ তো হাট।"

মনে-মনে তখন বিস্ময়ের সীমা নেই। কী মন্ত্র বলে মাধুরীদি এম মধুর হয়ে উঠল। ওর বিপুল স্নেহের মাধুর্যে আমি ভরে উঠলাম। আমা কাঁধটার ওপর হাত রেখে বাইরে চেয়ে আছে মাধুরীদি। একস বলল—"নিখিল, পরীক্ষা দিয়েই তো চলে যাবি। আবার কবে দে হবে কে জানে! মাঝে মাঝে ফাঁক পেলেই আসিস কিন্তু। আসি তো ?"

"আসব মা

"ঐ যে আমাদের বাঁধাঘাট। ওখানেই নৌকো লাগবে তো ?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাঁরে, স্বকুটার আবার এ সময়ে জ্বর হলো কেন ? রাত জেগে বুঝি ? তুই-ও পড়িস তো ? লক্ষ্মী ভাইটি, শরীরের ওপর অত্যাচার করো না ভালো কথা, নিখিল ?"

"কী দিদি ?"

"তুই কবিতা লিখিস তো ?"

মুখ নীচু করলাম।

"লিখিস তো ?"

"না।"

"লক্ষ্মীটি ভাই," মাধুরীদি বলল—"বোনের এই কথাটা রাখ। এবার লিখবি, কেমন ? তোর লেখা বাস্তবিকই খুব ভালো হতো!"

বিস্ময়ে হতবাক। মাধুরীদি বলে কী!

"বল এবার লিখবি তো ?"

"লিখব।"

"আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর ?"

তাই করতে হলো।

এতক্ষণে হাসি ফুটল, বলল—"ভাইটি আমার যা অভিমানী!"

হেসে উঠলাম। মেঘ কেটে গেছে, আবার পূর্বের মতই উৎফুল্ল মনে হলো নিজেকে।

"এই তো ঘাটে এসে গেল। রহমান, আস্তে।"

নৌকা বাঁধতেই উঠে গেলাম।

"ও ভাইটি, আমার হাতটা একটু ধর দেখি? এই যে হরি এসেছ, ভাল আছ তো হরি? বেশী মোট নেই, একটা ট্রাঙ্ক, আর একটা ছোট স্যুটকেশ। নিয়ে এসো।"

বাড়ীর দিকে চলতে চলতে মাধুরীদি বলল, "বুঝলি নিখিল, এবার একদিন 'ফিস্ট' কর, আমাদের পেয়ারা গাছতলাটার নীচে, কেমন?"

"সে বেশ হবে।" হাসিমুখে এগিয়ে চললাম।

পরীক্ষা একদিন হয়ে গেল। এবার বিদায়। আসবার সময় মাধুরীদিকে প্রণাম করতেই চোখদুটি ছলছল করে উঠল, বলল—"পিসেমশাই পিসীমাকে আমার প্রণাম দিস। তুই চিঠি দিস কিন্তু। লক্ষ্মীটি ভাই, না করিস না, এই বাঁধানো খাতাখানা নে, কবিতা লিখবি, কেমন?"

ভাবি, সেই রূঢ় সংকীর্ণমনা মাধুরীদির মধ্যে এই অপূর্ব উদার স্নেহপ্রবণ মাধুরীদি লুকিয়ে ছিল কেমন করে? হয়ত এই রূপটাই সত্য, আগেরটা আবরণ, অনুকূল হাওয়ায় খসে পড়েছে।

পল্লীর তীর থেকে স্টীমার আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে চলল। ঘাটের কাছে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা সুকুমার, সলিল ও বন্ধুদলের মূর্তি ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গেল। ঐ বাঁধাঘাট, ঐ পথ, ঐ অশ্বথতলা।

শেষ হয়ে গেল চার বৎসরের পল্লী-জীবন। আবার ফিরে চললাম নগরের কোলাহলে—আমার পূর্বতন জীবনের মধ্যে।

। পদক্ষেপ ।

আমাদের নতুন বাসা ঠিকানা মিলিয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে বার করতে হলো। বড় রাস্তা, তার মধ্যে সংকীর্ণ গলি, তারই প্রান্তে জীর্ণ পুরানো একখানা টিনের বাড়ী। খুপ্‌রী খুপ্‌রী অনেকগুলো ঘর, অনেক বাসিন্দা। দরিদ্র স্কুল-মাস্টার থেকে স্থুরু করে মোটর-ড্রাইভার পর্যন্ত আছে। এরই একাংশে দুটি খুপ্‌রী নিয়ে আমাদের সংসার।

বাবা মা কমল। মানুদি নেই। আর নেই দাদু। দাদুর তক্তাপোষ, দাদুর ছোট্ট টেবিলটা, ভাঙা আলমারী, ক্যাশবাক্স,—সবই আছে, শুধু দাদুই নেই। আমাকে দেখে দাদুর জন্য মা খুব কাঁদল। শেষ সময়ে নাকি "দাদুভাই-দাদুভাই" করে খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—দাদুভাই ছিল তাঁর প্রাণ!

সাশ্রু চোখে বললাম,—"ঐ সময়ে আমাকে খবর দাও নি কেন মা?"

"কী করে জানব! দিব্যি ভালো হয়ে উঠেছেন, হঠাৎ হার্টফেল করল।'

রাত্রে অপর ঘরখানায় একা শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠত। মনে হতো যেন দাদুর কণ্ঠস্বর শুনছি,—"দাদুভাই—দাদুভাই" আলমারীর মধ্যে দাদুর পেন্সিলে আঁকিবুকি-কাটা ভাঁজ-করা সেই পুরানো খবরের কাগজগুলো। দাদুর মহাতীর্থ!

মা একদিন বলল,—"শুনেছিস? এদিকে তো চাকরী নেই।"

"বাবার চাকরী নেই! কেন, সেই স্কুল-মাস্টারী?"

"সেটা গেছে। যে-কাণ্ড আরম্ভ করল, চাকরী কী আর থাকে? এসেছিস নিজের চোখেই সব দেখতে পাবি।"

"এ বাজারে চাকরী যাওয়া!"

"শুধু চাকরী যাওয়া! আর পাবে নাকি কোথাও? জেল-খাটা কয়েদী শুনলেই লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কী হবে বল? ওর অত্যাচারও সহ্যের অতীত হয়ে দাঁড়াল।"

একটু থেমে মা আবার বলল, "যা করে সংসার চলছে তা আমিই জানি ধাপ্পাবাজী জাল জুয়াচুরি করে মাঝে মাঝে কিছু এনে দেয়। আর ধার

শেষকালে কাবুলীর কাছ থেকেও। সকাল বেলাই লক্ষ্য করে দেখো, লম্বা লাঠি হাতে একটি এসে গলির মাথায় হাজির হয়েছে।"

অবাক হয়ে শুনছি! এ কার কথা বলছে মা? বাবার কথা? যে-বাবার শিক্ষা-চরিত্র আচার-ব্যবহার কর্তব্যবোধের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি!

বললাম, "এ রকম কেন হলো মা?"

"কপাল! কোথা থেকে যে আমার কপালে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেল বাপ-মা তাই ভাবি। এম-এ পাশ। অমন এম-এ পাশের মুখে ছাই!"

অদ্ভুত পরিবর্তন। সমস্ত মহানগরীই বদলে গেছে। আমার ঘরের ছোট্ট জানলাটির পাশে বসে চেয়ে দেখি, কতো বিচিত্র জীবনযাত্রাই না চোখে পড়ে। সবাই চলেছে, কেউ বসে নেই, সমস্তই নিরন্তর রূপাবর্তনের মুখে এগিয়ে চলেছে।

আমার জানলার ঠিক সামনেই গলির ওপারে একটি নতুন ঝকঝকে তে-তলা বাড়ী উঠেছে। বাড়ীর কর্তা-গিন্নী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে। ওরা নাকি জাতে খুব নীচু, এমন কি, মা বলে, ওদের হাতে ছোঁয়া জলও নাকি আমাদের খেতে নেই। উত্তরে আমি হেসে বলি,—"গান্ধীজির 'হরিজন-আন্দোলনের' কথা শোনো নি মা? জাতের কথা আজ আর বলো না, লোক হাসবে।"

"জানি-জানি"—মা সুরু করে, "সমস্তই পালটে যাচ্ছে। যারা ছিল নীচুতে তারা উঠছে, যারা উঁচুতে তারা নামছে। কিন্তু এই কি ভাল হলো?"

"কেন মা?"

"কেন-র উত্তর অত গুছিয়ে বলতে পারব না, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। তবে অবস্থাটা ভেবে দেখ। ধর না আমার কথা। আমার কী থাকার কথা এই রকম বাড়ীতে? অতবড় আমাদের বাড়ী, এক গ্লাস জল চাইলে পাঁচটা ঝি-চাকর ছুটে আসত। আর আজ? অন্ধকার বস্তীর মধ্যে নিজের হাতে বাসন-মাজা, জল-তোলা, কাপড়-কাচা, রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সমস্তই করতে হচ্ছে। যাদের মধ্যে বাস করি, তাদের চাল-চলন ভাব-ভাবনার সঙ্গে আমাদের মেলে না, সঙ্গী নেই, সাথী নেই, মুখ গুঁজে একটি কোণে পড়ে থাকি। এ কার দোষ? বলতে পারিস?"

আমি স্তব্ধ।...

মা আবার বলতে লাগল,..."অথচ আমার আজ অভাবটা কী। বাবা

নেই, কিন্তু স্বামী তো বর্তমান। মুখ্যু নয়, বাজে নয়, দিব্যি কর্মঠ বুদ্ধিমানই ছিল। কিন্তু এ হলো কী?"

"মা!"

"কী রে!"

"বাবা আর দেশের কাজ করেন না, না?"

"না। সে দলেও পাত্তা পায় না। বড় বড় নেতারা, যাদের সঙ্গে একদিন কাজ করেছে, আজ তারা দেখেও চিনতে পারে না। জগৎ-টা তো এমনই। এ তো জানা কথা। এই জন্যই তখন অত কান্নাকাটি করতাম, অত হাতে পায়ে ধরতাম। আমাদের কী সাজে ঐ সব কাজ! কেমন, ফলল তো আমার কথা শেষকালে। এখন চাকরী চাইতে গেলেও লোকে মুখ বাঁকায়।"

"বাণী-পিসীমার খবর কী মা?"

"কে জানে! আমি তো পড়ে আছি অন্ধকার খুপরীর কোণে, কারুরই খোঁজখবর পাই না।"

"বাবা হয়ত জানেন।"

মা হাসল,—"সে গুড়েও বালি। দেখাসাক্ষাৎ নেই। একদিন নিজেই তো গল্প করে, রাস্তায় দেখা,—বাণী কথা বলা দূরে থাক মুখখানা ফিরিয়ে না-চেনার ভাণ করে চলে গেল।"

"বাণী-পিসী!"

মা হেসে উঠল,—"হ্যাঁ রে। সংসারটাকে তো জানিস না। আমি অনেক ঘা খেয়েছি, অনেকটা পারি বুঝতে। এই-ই নিয়ম। এখানে স্বার্থটাই সব থেকে বড়। ও সব শ্রদ্ধা-ভালবাসার কোন মূল্য নেই। এই তোর বাণী-পিসীর কথাই ধর। তোর বাবার ওপর তো এত শ্রদ্ধা, এত ভালবাসা, —আজ লোকটার দুর্দিনে ফিরেও চায় না! আর আমি? যে-এত মন্দ মানুষ, যে-এত বকাঝকা করে, সে-ই বুক দিয়ে সমস্ত আগলে রয়েছে। নইলে আমার কী? আমার খুড়তুতো দাদারা এখনো রয়েছে। তাদের সংসারে কোনরকমে একটা পেট আমার চলে যাবেই।"

অবাক হয়ে শুনছি! সমস্ত মনপ্রাণ তারুণ্যের স্বপ্নে ভরা,—সেইখানেই সংঘাতটা বাজল। এই সংসার!

মা বলল,—"এই রকম দরজায়-দরজায় ঘা খেয়ে খেয়ে তোর বাবার আর মাথার ঠিক নেই. এ অবস্থায় তার ওপর আর ভরসা কী করে করি বল? এখন

ভরসা তোরা। খোকন, তুই বড় হয়ে সংসারের ভার নিবি তুলে, এই আশাতেই বসে আছি। নে খোকন, আমি আর পারি না। যতবারই ঘর গুছিয়ে তুলতে যাই, ততবারই যায় ভেঙে।"

"মা, আমি আর পড়ব না, চাকরী খুঁজব।"

অতি দুঃখীটির মতই ম্লান হাসল মা, বলল, "আমার বাবা কী বলতেন জানিস? তোর অন্নপ্রাশনের দিন তোর সামনে দেওয়া হলো টাকা আর দোয়াত-কলম। তুই হাত বাড়িয়ে টাকা না নিয়ে দোয়াত-কলমই তুলে নিলি। বাবার কী আনন্দ! বাবা তোকে কোলে নিয়ে আমাকে বললেন,—খুকু, এ ছেলে মস্ত পণ্ডিত হবে। ওকে শুধু এখানেই পড়াব তা নয়, এখানকার পড়া শেষ করিয়ে ওকে আমি বিলেত পাঠাব!"

ঝর্‌ঝর্ করে মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, "বাবা—বাবা আজ কোথায়! তাঁর অত সাধ! তাঁর দাদুভাই আজ ম্যাট্রিক পাশ করল, লোকের সুখ্যাতি পেল, কিন্তু তিনি তো আর চোখে দেখে গেলেন না!"

এতক্ষণ বলতে মনে ছিল না। পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমি, সুকু, সলিল তিন জনেই প্রথম বিভাগে ভালভাবেই পাশ করেছি। ওদের চিঠিও পেয়েছি। ওরা দুজনেই বহরমপুরে পড়তে যাবে।

"খোকন!" মা বলল, "আমিও ভেবে দেখলাম, তোর পড়া হবে না!"

পড়া হবে না। সত্যিই পড়া হবে না! কথাটা আমিই প্রথমে বলেছি, অথচ আমারই শুনতে কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকছে! বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আশে-পাশের কলেজগুলোর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঘোরাফেরা করেছি। কতো ছেলে যাচ্ছে-আসছে। ওদের ভীড়ে হবে না স্থান? সুকু সলিল ক্লাশের পর পার হবে ক্লাশ, বেরিয়ে আসবে উচ্চশিক্ষার সম্মান নিয়ে। আর আমি?

"বুঝলি খোকন," মা বলল, "একদিন তোকে নিয়ে আমার এক খুড়তুতো দাদার বাড়ীতে যাবো। তারা এখন খুব বড়লোক। তাকে হাতে পায়ে ধরলে তোর জন্যে একটা চাকরী জোগাড় হতে পারে। খোকন, পড়া তোর হবে না, কী দিয়ে পড়বি, কী খেয়ে পড়বি?"

তাই-ই মেনে নিতে হবে। ভবিতব্যকে নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু অবোধ মন যে কিছুতেই মানে না, নিরন্তর অতৃপ্তিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। নিঃসংশয় হতে পারছি কই? সংশয়ের কালো ছায়া

ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করছে। তরুণ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন—নগ্ন বাস্তবের কঠিন সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গেল!

সলিল-সুকুর কয়েকখানা চিঠি পেলাম পর পর, কিন্তু উত্তর দিলাম না, দিতে ইচ্ছা করল না। ঈর্ষা? হবে হয় তো। যারা সংসারের পথ দিয়ে সৌভাগ্যের রথ চালিয়ে নিয়ে গেল ধুলো ছড়িয়ে আমাদের ওপর,—ধুলোয় দু'চোখ অন্ধ, না হয় চোখ মুছতে মুছতে তাদের প্রতি একটু ঈর্ষাই প্রকাশ করলাম!

এ বাড়ীর কারুর সঙ্গে কিছুতেই খাপ-খাওয়াতে পারছি না। আমার বয়সী দুটি ছেলে আছে। কোথায় কোন কারখানায় কাজ করে বুঝি। জাতে নীচু নয়, ভাল কায়স্থ, ভদ্রলোকের ছেলে, অবস্থা বিপর্যয়ে গরীব হয়ে পড়েছে, শিক্ষারও সুযোগ তেমন পায় নি। একদিন আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, "আমাদের আড্ডায় আসেন না কেন?"

বললাম, "কিসের আড্ডা? কোথায়?"

"এই মশায়, কিছু গান-বাজনার চর্চা,—এই আর কি! মাঝে মাঝে যাত্রার বই ধরলে রিহার্সালও চলে। এবার 'নরকাসুর' ধরেছি। নেবেন পার্ট? আপনাকে 'ফিমেল' সাজালে যা মানাবে!"

অপর ছেলেটা মুখের একটা শব্দ করে উঠল।

"এদিকে সরে আসুন। এই নিন।"

"কী ওটা?"

বিকৃত ভঙ্গীতে হেসে উঠল, "মিলিটারী মশাই মিলিটারী! দেখছেন না খাঁকী রঙ্? বিড়ি মশায় বিড়ি, এইবার বুঝেছেন?"

"মাপ করবেন।" সরে গেলাম। পিছন থেকে হাসি শুনতে পাচ্ছি।

"ওঃ। শালার রোয়াবি দেখ না! যত সব···"

এতটা অতি-অশ্লীল গালাগালি উচ্চারণ করে উঠল। দ্রুতপায়ে বাড়ী চলে এলাম। ওঃ, ভগবান! এই এদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করছি, ওরা আমার প্রতিবাসী। পারব না, পারব না খাপ খাওয়াতে!

এ কেন হয়? ভদ্রলোকের ছেলে, এ মনোবৃত্তি কেন? পলকের জন্য ওদের চেহারাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। কতদিন দেখেছি, সন্ধ্যার সময় বাইরের রকটায় বিরাট জটলা। বসে বসে বিড়ি-টানা, পরচর্চা আর নানারকম অশ্লীল আলোচনা! কিন্তু কেন, আরও তো বহু আলোচনার বিষয় রয়েছে? জীবনে শিক্ষা পায়নি, সৎসঙ্গ পায়নি, এ তারই ফল। ~~মনে~~ মনে

একবার শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, আমারও তো পড়া হবে না, এই অল্প বয়সেই নিতে হবে চাকরী। তবে কি ক্রমে ক্রমে আমিও হয়ে উঠব ঐরকম? অসম্ভব। হে বিশ্ববিধাতা, বাঁচাও আমাকে, উদ্ধার করো এই অন্ধকার পঙ্কিল পরিবেশ হতে!

বিকালের মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। বড়ো রাস্তাটায় যেখানে কতগুলো পুরাণো বইয়ের দোকান সারি সারি সাজানো, সেই পর্যন্ত আমার গতি। মধ্যে যে পার্কটা পড়ে সেখানে গিয়েও বসি।

সেদিন পার্ক ছাড়িয়ে রাস্তাটা দিয়ে ববাবর চলেছি। ঐ সেই বাড়ীটা যেখানে বাণী-পিসী থাকতেন। কিসের আকর্ষণে সেইদিকে গেলাম জানি না, চেয়ে দেখি বাড়ীর চেহারা বদলেছে। কোথায় সেই নারী-কল্যাণ-সংঘের সাইনবোর্ড? সে প্রতিষ্ঠান নেই। জানালায় দরজায় সুদৃশ্য পর্দা, ভিতর থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য পিয়ানোর টুং টাং শোনা গেল। বাড়ীর সামনে মোটর দাঁড়িয়ে। দরজার পাশে নাম লেখা কাষ্ঠফলকে—রায়বাহাদুর বি, সি, লাহিড়ী। নামের পাশে 'In' 'Out', নির্দেশক যায়গাটায় 'Out' ঢেকে দিয়ে 'In' শব্দটা তীক্ষ্ণতায় ঝলমল করছে! চকিতের জন্য একটুকরো হাসি শুনতে পেলাম। পায়ের শব্দ। দরোয়ান গাড়ীর দরজা ফাঁক করে ধরল। বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন প্যাণ্টকোট টাই-পরা জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সঙ্গে অত্যুগ্র ঝলমল পোষাকে এক মহিলা। কে ইনি? চিনতে পেরেছি। বাণী-পিসীর সেই মৃণালদি না? সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলাম ওখান থেকে, দ্রুত পা ফেলে এক গলির মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করলাম।

আত্মগোপন, কিন্তু চেতনাকে গোপন করতে পারিনি, পারিনি মনের উদগ্র প্রশ্নটাকে নিষ্পেষিত নিপীড়িত টুকরো করে ফেলতে। সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ প্রশান্ত মুখশ্রী, খদ্দরের সাধারণ সাড়ী পরনে, আভরণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় বসে চরকা কাটছেন, বহুদিন আগে দেখা বাণী-পিসীর মৃণালদির চেহারাটা স্পষ্ট ভেসে উঠল। নিজের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত জীবন নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, হাসিমুখে কারাবরণ করতেও দ্বিধা হল না, প্রবাসী-পত্রিকার পৃষ্ঠায়-দেখা ওঁর সেই মহিমময়ী মূর্তিটিও মনে পড়ল। কিন্তু কোথায় গেল সেই অদম্য শক্তির প্রখর প্রতিমূর্তি? ঝলমল সাড়ী আর পিয়ানোর টুং ট্যাং আর রৌদ্র ঝলকিত রায়বাহাদুরের কাষ্ঠফলকের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তিনি? কেন হারিয়ে গেলেন?

সংশয়মেঘক্ষুব্ধ কালো আকাশ তার ছায়া ফেলেছে গভীর করে। তিক্ত অভিজ্ঞতা আর এই সংশয়,—পথ হলো দুর্গম, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অগ্রগামিনী, তার পরে ফিরে গেল, ফিরে গেল হাস্তের মধ্যে লাস্তের মধ্যে! এই তো ওঁদের যুগ এবং এই তার দান!

গলি পেরিয়ে আরেকটা রাস্তা। এদিক দিয়ে ঘুরে গেলেও বাড়ী পৌছানো যায়। তাই-ই চললাম। পায়ের পুরানো স্যাণ্ডেলটা ছিঁড়ল নাকি? একটু থেমে দেখে নিয়ে সন্তর্পণে পা চালিয়ে দিলাম। নতুন-নতুন অনেক বাড়ী উঠেছে এইদিকে। রাস্তাটাও নতুন। নতুন রাস্তা পেরিয়ে পুরানো চেনা একটা রাস্তায় পড়লাম। বই হাতে করে রঙ্‌বেরঙের ফ্রক আর সাড়ী-পরা নানান বয়সী মেয়ের দল বাড়ী ফিরছে! মেয়ে-স্কুলের বাসটাও একবার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্কুলের সামনেটায় এসে বুকটা হঠাৎ উঠল ধড়াস করে। এই না সেই স্কুল, যেখানে গৌরী পড়ে? এ স্কুলেই না চাকরী নিয়েছিলেন বাণী-পিসী? থমকে দাঁড়ালাম, যদি দেখা হয়ে যায়! এই এতদিন কোন খোঁজ ওদের পাইনি। মনে হলো, কী বোকামীটাই না করেছি! এখানে এসে একদিন খোঁজ নিলেই তো হতো! অসীম ঔৎসুক্যে স্কুলের গেটের দিকে, পাশের ফুটপাথে তাকাতে লাগলাম, যদি দেখা হয়ে যায়! ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মেয়েরা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসছে, কেউ পায়ে হেঁটেই চলেছে। এমনই একটি দলের কাছাকাছি আসি, আর সাগ্রহে ওদের দিকে তাকাই। কিন্তু কই? গৌরী নেই। ঐ যে চার-পাঁচটা মেয়ে এদিকে আসছে, ওদের মাঝের জন গৌরী না? দুঃসহ উত্তেজনায় যেন মরে যাব। হ্যাঁ, ঐ তো! না-না, আমারই চোখের ভুল, ও গৌরী নয়। কাছাকাছি হতেই লজ্জিত হয়ে চোখ নামালাম, মেয়েটী আর তার সঙ্গিনীর দল কৌতুকে হেসে উঠল। ফিরে এলাম।

কিন্তু কয়েকটা দিন পরেই দেখলাম আবার সেই স্কুলের পাশ দিয়েই চলেছি। এমনি করে হঠাৎ-ই একদিন গৌরীর সঙ্গে দেখা একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঠিক মুখোমুখি, ছুটীর পর। ও তখন বাড়ী ফিরছিল।

"নিখিলদা?"

"গৌরী!"

গৌরী চমৎকার হাসল, "হ্যাঁ আমি। আপনার পাশের খবর আমি জানি, গেজেটে পড়েছি। কই, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে? চলুন! চলতে চলতে কথা হবে।"

নিশ্চুপে চলতে লাগলাম পাশাপাশি। বড় রাস্তা ঐ যে দেখা যাচ্ছে। গৌরী বলল, "না-না ওদিকে না, এদিক দিয়ে চলুন। ওদিকে গেলে মেয়ে-গুলো ধরে ফেলবে, অনেক কায়দা করে ওদের ভাগিয়ে দিয়েছি। তারপর কোথায় চলেছেন ?"

"বাড়ী।"

"আর বলবেন না। আপনাদের বাড়ী খুঁজে খুঁজে হয়রান! কোথায় উঠে গেলেন বলুন তো ? নতুন-মামারও আর দেখা পাই না, কারুর-ই না। ঠিকানাটা বলুন তো ?"

বলব ? আমাদের সেই জীর্ণ টিনের খুপরী, দেবো সন্ধান ? সেই সুকঠোর নগ্ন দারিদ্রের মূর্তি দেখে গৌরী ঘৃণায় মুখ ফেরাবে না তো ?

"বা রে, চুপ করে আছেন যে ? বলবেন না ঠিকানা ?"

একমুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠলাম, বলে দিলাম আমাদের ঠিকানা। ঠিকানাটা মনে-মনে একবার উচ্চারণ করে নিয়ে বলল, "তবু জানা রইল, যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে কোন সময় যেতে পারি। নিখিলদা, মামীমা কিছু বলবেন না তো ?"

"বলবেন আবার কী ?"

"আমার মা কিন্তু বলেন। স্কুল ছাড়া আর কোথাও বেরুনো আমার বারণ। তবে আজ একটু বেড়াবো, এমনি রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে আপনার সঙ্গে গল্প করব। মা যদি জিজ্ঞাসা করে বলব, এক বান্ধবী কিছুতেই ছাড়ল না, তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।"

"পিসীমা ভাল আছেন ?"

"হ্যা। আচ্ছা, নিখিলদা ?"

"কী ?"

আমার চোখের দিকে তাকাল,—"আমার ওপর রাগ করেছিলেন তো ?"

"কেন বলো তো !"

"নিশ্চয় করেছিলেন। আমি আর আপনাকে চিঠি দিইনি। কী করব বলুন ? মা এমন কড়া শাসন সুরু করলো। দেখুন দেখি, আপনাকে চিঠি লিখব তা-ও বারণ।"

"গৌরী ?"

"কী ?"

"পিসীমা এতক্ষণে স্কুল থেকে বেরিয়েছেন, তাই না?"

"স্কুল থেকে বেরিয়েছেন! তার মানে?"

"কেন? পিসীমা স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?"

"হা ভগবান!"—গৌরী হেসে উঠল, "কিছুই জানেন না দেখছি! আমার নতুন মা মারা গেছেন শুনেছেন তো?"

"না!"

"হ্যাঁ, তিনি মারা গেছেন আমার দুইটি কচি-কচি ভাইদের রেখে। বাবা তাই আবার মাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন, বুঝলেন এবার? মা স্কুল করবে কী, কাচ্চা-বাচ্চা সংসার নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। বাঃ। চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? নিখিলদা, পথ চলতে চলতে অত চমকাতে নেই, ঠকতে হয়, বুঝলেন?"

কিন্তু গৌরী জানে না, এ চমক আমার কাছে কী প্রচণ্ড—কী আকস্মিক! জানে না, আমার তরুণ মনের অসামান্য শ্রদ্ধার কোন স্বপ্নময় স্বর্ণশিখরে তাঁকে স্থাপনা করে রেখেছি। মৃণালদি ফিরে গেছেন, কিন্তু উনি ফিরলেন কেমন করে? সেই চাবুক, সেই হাত-পা-মুখ বাঁধা রক্তাক্ত জীবন, কেমন করে ফিরে গেলেন তার মধ্যে! ওঁর কি মনে নেই সেই নির্যাতন? তবে কি এ সংশয়গ্রস্ত যুগ ওঁকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে? ওঁদের যুগকে পুনর্বার অভিসম্পাত জানাই। সংশয়ের বিষে জর্জরিত করে কার প্রাণশক্তিকে হরণ করে নিলে শতাব্দী?

আমার অন্তরের ঝঞ্ঝনা বাইরে থেকে সেদিন কেউ বুঝল না, নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে পথ চলছি। ঘুরে-ফিরে আবার সেই স্কুলের পাশ দিয়ে নির্জন সরু গলিটার সামনাসামনি।

"এ কী, এ যে আবার সেই…"

গৌরী হেসে উঠল, বলল, "পৃথিবীটা গোল, তাই প্রমাণ হলো বুঝলেন না?"

আমিও ওর সঙ্গে হেসে উঠলাম, "গৌরী, এবার তোমার কোন ক্লাশ?"

"সেকেণ্ড ক্লাশ!"

"বাঃ!"—সামনেই মোড়। ভীড়। এবার অন্য রাস্তা, বড় রাস্তা ছাড়িয়ে আরেকটা পীচ ঢালা পথ। নিশ্চুপ। একটুক্ষণ পরে ও-ই কথা বলল, "মাঝে মাঝে এমনই দেখা হয় যেন, কেমন?"

"বেশ!"—আরও খানিকটা এগিয়ে চললাম। এক জায়গায় এসে থমকে

দাঁড়াল, বলল, "ঐ যে আমাদের বাড়ী। ঐ যে হলদে রঙের দোতলাটা। আমরা দোতলাতেই থাকি।"

পরক্ষণেই ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য এলো, বলল, "ঐ যে আমার ভাই দুটি রকে বেরিয়ে এসে খেলা করছে। আমি যাই, কেমন? যাই?"

আমাকে নিরুত্তর স্তব্ধ প্রস্তরের মত দাঁড় করিয়ে রেখে ঝর্ণার মত পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল! একবার ওদের বাড়ী যেতেও বলল না। প্রচণ্ড অভিমানে ভরে উঠল মন। বেশ। নাই বলুক। আর কোন দিন দেখা করব না ওর সঙ্গে। আমরা গরীব, সে কথা বুঝতে পেরেই কি গৌরী আমার সঙ্গে শেষে এই রকম ব্যবহার করল? উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গৌরী! অসম্ভব। ওর কথা আর কোনও দিন মনের কোণে স্থান দেব না। বাড়ী যখন ফিরলাম, তখন একটু রাত হয়ে গেছে।

সেই টিনের বাড়ী। ঘরে ঢুকে সে রাত্রে যা দেখলাম তার জন্যে ইতিপূর্বে কোনদিনও প্রস্তুত ছিলাম না। খাটের ওপর শুয়ে মা জ্বরে কাতরাচ্ছে, কমল তারই পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে মুখ করে। মেঝের ওপর শুয়ে বাবা, উপুড় হয়ে বমি করছেন, কী বিড় বিড় করে বকছেন মাঝে মাঝে। ঘরের বাতাসে কী একটা তীব্র বিদ্‌ঘুটে গন্ধ।

"এ কী মা?"

"এসেছিস? নিজের চোখেই দেখ। উঃ বাবা!"

কমল বলল, "মাথায় জল ঢালো দাদা, জল ঢাললে বাবা ভাল হয়ে যাবে।"

"খবরদার!" মা ধমকে উঠলেন, "ঢালিস না জল। আর পারি না, ও মরুক—ও মরুক। ও-মা মাগো—আর যে পারি না সইতে!"

কী করি? ওদিকে মা—এদিকে বাবা! নিরুপায়ের মত চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কমলকেই বললাম, "কমল যা তো; বাড়ীর কাউকে ডেকে নিয়ে আয়।"

কমল বিছানায় উঠে বসল, বলল, "কেউ আসবে না দাদা। ও-ঘরের ভুপেনদা এসেছিল, বাবা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

বাবা এই সময় আবার বমি তুললেন।

"কমল, তুই মার মাথায় বাতাস কর, আমি বাবাকে দেখি।"

বাবার মাথার কাছে গেলাম, ডাকলাম, "বাবা ?"

হুটি রক্তবর্ণ চোখ আমার ওপর তুলে ধরলেন।

"কাছে যাসনি খোকন," মা বলে উঠল, "ও মদ খেয়ে এসেছে। বিশ্বাস নেই, এখুনি মেরে দেবে !"

মদ ! একি শুনছি !...লজ্জায় দুঃখে আমার কান্না পেলো, দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলাম, "বাবা, এ কী করলেন !"

বমি-মাখা ঠোঁটের ওপর একটুকরো হাসি টেনে আনলেন বাবা, জড়িয়ে-জড়িয়ে বলতে লাগলেন,—"নোংরা—চারিদিকে সব নোংরা !"...

তার পরেই হঠাৎ কেঁদে উঠে,—"Oh God...Oh God, Thy Temple they have defiled !" মাথাটা শ্রান্তিতে নামিয়ে রাখলেন।

জানলার বাইরে কালো রাত !—দমকা হাওয়ায় জানলা ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠছে। ঝড় উঠবে নাকি ?...

"অকৃতজ্ঞ সংসার !"—বাবা বলতে লাগলেন, "শৈলেশ। বড় চাকুরে। তার কাছে চাকরী চাইতে গেলাম, সে দূর্‌ দূর্‌ করে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল !"

আবার বমি তুললেন। আরেকটা পাখা নিয়ে মুখে রুমাল চেপে আমি বাতাস করতে লাগলাম।

"মনোহরবাবু। যিনি হালে নেতা বলে নাম কিনেছেন, যাঁর সঙ্গে এত দিন জেলে কাটালুম, তিনি আমাকে দেখে চিনতেই পারলেন না। চমৎকার !"

"আপনি স্থির হোন বাবা।"

"মরীচিকার পেছনে কেন ছুটেছিলাম বলতে পারো ? যা হবার নয় তার পেছনে কেন ছুটেছিলাম ? এ জগতে মানুষ নেই, আছে শুধু নরখাদক পশুর দল !" হাঁপাতে লাগলেন, "বিশ্বাস করব ? মানুষকে ? কখ্‌খনো না। শিক্ষা দীক্ষা সব বাজে !"

"খোকন ?"—মা বলে উঠল, "দুর্গন্ধে যে আর টেঁকা গেল না ! তুই গিয়ে ওদের ডাক, তোর ডাকে হয়ত আসবে। ওটাও তো গেল, এভাবে রাত কাটালে ওটা নির্ঘাৎ মরবে।"

আমি উঠে কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে এলাম। হয়ত অনেকেই মনে মনে হাসছে, ঘৃণা করছে আমাদের !

"নিখিল ?"—একজন বলল, "চোখ মোছ। কী, হয়েছে কী ? মাথায় জল ঢাললে এখুনি ভাল হয়ে যাবে। না—না বৌদি, আপনি উঠবেন না

অসুস্থ শরীর নিয়ে, আপনি শুয়ে থাকুন। দেখুন না, আমরা পরিষ্কার টরিস্কার করে সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

ভাল করে চেয়ে দেখলাম—লোকটা আর কেউ নয়, সেই ছেলেটা, যে আমার পেছনে সেদিন অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ ওকেই নিদারুণ দুর্দিনে একান্ত সুহৃদের মত সহনীয় মনে হলো।

বাবার দিকে চাইতে চাইতে নিদারুণ ক্ষোভ, দুঃখ আর বেদনা অন্তরে উত্তাল ঝড় তুলছিল সেদিন, কিন্তু আজকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গিয়ে চিত্রটিকে বড় মূল্যবান মনে হয়। জীবনে বাবা যে খুব কথা বলেছেন তা নয়, ঐ কয়টি মুহূর্তই ছিল তাঁর কথা বলার মুহূর্ত,—যার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য স্পষ্ট দেখেছিলাম। আর তো সবই তাঁর ছদ্মবেশ দিয়ে ঘেরা, কী কঠিন, কী নিখুঁত, কী অদ্ভুত সে ছদ্মবেশ! অনেক চিন্তা অনেক বিকলন এসেছে মনের মধ্যে, এসেছে প্রগাঢ় সংশয়ের কাঠিন্য, তবু আজ মনে হচ্ছে, ছদ্মবেশ ছিল তাঁর আদর্শবাদী শাশ্বত পুরুষ সত্তাকে ঘিরে, তাঁর চতুর্দিকে বিকলনের ঝড়, গ্লানির ঝড়, সংশয়ের ঝড, সংঘাতের ঝড!

ঘরের মধ্যে তখনও পরিচ্ছন্নতা-প্রয়াসের পালা শেষ হয় নি, দু'চোখের জিজ্ঞাসা তখনও আমার ললাটে ভ্রূকুটি হয়ে জেগে আছে,—বাবা কান্নাভরা কণ্ঠে হাহাকার করছেন,—"চারদিকে নোংরার স্তূপ!…Oh God…Oh God, Thy Temple they have defiled!"

॥ দুই ॥

বিছানায় শুয়ে সেরাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছটফট করেছি, ঘুম আসে নি। বাবা, বাণী-পিসী, মৃণালদি, ওদের মধ্য দিয়েই কালের পরিবর্তনটাকে অনুভব করছি। জাতীয়তার সংগ্রামে হাসিমুখে সংঘাতের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানো, অদম্য উদ্দীপনা, দু'চোখ ভরে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন,—সে সব কোথায় গেল! সমস্ত আকাশ ভরে সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাসের বিপুল কালো মেঘ। তারই বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হবে আমাদের পথ। ওদের সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস অশ্ববল্গার মত আমাদের কাঁধে জড়ানো, পথ চলতে চলতে পিছন থেকে তারই টান পড়বে।

পরদিন সকালে বাবার ভিন্নরূপ দেখছি। অনুতপ্ত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত, সকলের চোখের সামনেই যেন ছোট হয়ে গেছেন। মার জ্বর। হাসপাতালের ডাক্তারকে বলে কয়ে ওষুধ নিয়ে এলেন। তারপরে আশ্চর্য, বাইরের একটা লোক ডাকিয়ে বাসন কোসন সমস্ত মাজিয়ে জল তুলিয়ে নিজের হাতে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ব্যাপারটা এত অভিনব, যেন চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপরে ওঁরই আহ্বানে সানন্দে আমি ও কমল ওঁকে সাহায্য করতে লাগলাম। সমস্তটা দিন ওঁকে কাছে পাওয়া,—এ তো ঘটেই না। মা মুখ টিপে টিপে হাসছিল, বলল, "এত দরদ কদিনের জন্যই বা!"

বাবা মুখ নীচু করলেন, উত্তর দিলেন না।

"তারপর?"—মা বলল, "এভাবে আর কদিন সংসার চলবে! এতদিন বিক্রী সিক্রী করে চলল, কিন্তু তারপর? আমি তো আর কুবেরের ভাণ্ডার নিয়ে বসে নেই! দু'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে, মুদির টাকা না দিলে সে আর জিনিষ দেবে না। এসব কথা ভাবছ?"

এক মুহূর্তের জন্য বাবা মুখ তুললেন, বললেন, "আমি ব্যবসা করব।"

মা হাসল, "পুঁজি কত?"

"পুঁজির দরকার নেই। কাল থেকে শেয়ার মার্কেটে বেরুচ্ছি। দেখা যাক কিছু হয় কি না।"

কিন্তু হলো না। মধ্যে মধ্যে এমনও হতে লাগল, পাঁচদিন ছয়দিন সাতদিন একাদিক্রমে আর বাবার দেখাই নেই। তখন কিছুই আমার ভাল লাগত না, কুণ্ঠায় শঙ্কায় মনটা মুষড়ে থাকত। মা বলত, "এ তো জানা কথা! টাকা এনে দেবার কথা, এখন তো গা ঢাকা দেবেই। কাপুরুষ! সংসারে এসে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের সামনেই পারল না দাঁড়াতে, তার আবার সংসার করা কেন?"

সময় আর নদীর ঢেউ কারুর জন্য বসে থাকে না। দিন চলতে লাগল। মা বলে,—"তোর তো তবু একটু-আধটু পড়া হলো, কমলকে নিয়ে যে কী করব ভেবে পাই না।"

"কেন মা, প্রভাত মামার কাছেই দাও না পাঠিয়ে।"

মা ম্লান হাসল, "তুই জানিস না, আমি চিঠি লিখেছিলাম, উনি রাজী হন নি। আর না হলেই বা কী করছি বল, কোন দাবী দাওয়া তো নেই, যা করেছেন সেটুকুই যথেষ্ট।"

কমল এমনিতে ভয়ানক দুরন্ত, একগুঁয়ে, কিন্তু পড়াশুনার সময় ভারী শান্ত হয়ে যায়। বাবাকে তো পাওয়া যায় না, ওর পড়া বাড়ীতে বসে আমিই দেখিয়ে দিতে লাগলাম।

পথ চলতে চলতে গৌরীকে মনে পড়ে। না, ভাবব না ওর কথা। রুদ্ধ অভিমান গুমরে ওঠে! কিন্তু আশ্চর্য, কখন অজ্ঞাতসারে ওদের স্কুলের সামনের রাস্তায় চলে গেছি। মনে হতেই দাঁড়িয়ে পড়ি, আবার চলে যাই অন্য দিকে। পার্কে গিয়ে চুপচাপ বসি অথবা কলেজগুলোর সামনে দিয়ে একটু পায়চারী করি। তখনো ছাত্র ভর্তি চলেছে। নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকি। কত বড় বাড়ী, একতলা-দোতলা-তিনতলা! ঢুকবার মুখে বড় বড় থাম—রেলিং। সেখানে এদিকে-ওদিকে ছেলেদের জটলা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, ভর্তির শেষ তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর পর আর ছাত্র নেওয়া হবে না। শেষ তারিখ! আর মাত্র তিনটি দিন। দমন করতে পারি না, বুকের অন্তরীক্ষ থেকে উদ্গত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পরের দিন ছিল রবিবার। মা বলল, "খোকন, আমার সঙ্গে চল আমার সেই দাদার বাড়ী। দেখি, তাঁর হাতে-পায়ে ধরে, যদি তোকে কোন চাকরীতে লাগিয়ে দিতে পারি।"

মাকে নিয়ে চললাম। কমল বাড়ীতেই একটি বউয়ের কাছে রইল। বউটি নিঃসন্তান, কমলকে খুব ভালবাসে!

পরনে ফরসা চওড়া লালপাড় কাপড়, গায়ে সিল্কের চাদর জড়ানো, আর সেই সঙ্গে সুষ্ঠু রুচি, মাকে এখনও অত্যন্ত অভিজাত মহিলার মতই দেখায়। দারোয়ান আমাদের দেখে আন্দাজে সম্ভ্রম করেই আসন থেকে উঠে দাঁড়াল, আমরা দুটি প্রার্থী ধনীর দুয়ার পার হয়ে প্রবেশ করলাম ভিতরে।

মার দাদা প্রখর মধ্যাহ্নে ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন। ফর্সা স্থূল ঝকমকে চেহারা। পরনে পায়জামা আর সিল্কের গেঞ্জি, চোখে রিমলেশ চশমা। শিয়রের কাছে ক্ষুদ্র টেবিল থেকে টেবিল-ফ্যানের হাওয়া আসছে। এটা ঘর নয়, প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার চারদিকে ভিজে খস্‌খস্‌ টানানো। ফলে বারান্দাটি ভারী ঠাণ্ডা, ভারী স্নিগ্ধ, ভারী আরামদায়ক এই প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরে।

"কে ?"—আমাদের দেখে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

"দাদা, আমি।"

মার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চশমাটা একবার নামালেন,

তারপর সহাস্যে বলে উঠলেন, "ও, খুকু? আয়—আয়। কতদিন পরে তোকে দেখলাম। একি চেহারা হয়ে গেছে তোর? অনেকদিন তোদের খবর পাই না। বিনয় কী করছে আজকাল? এটি কে? তোর বড় ছেলে না? তোমার নামটা কী হে?"

বললাম।

মা বলল, "প্রণাম কর। তোর মামা। দাদা, এরই জন্যে আজ আপনার কাছে এসেছি।"

"বেশ। কী ব্যাপার বল তো?"

ইতিমধ্যে ঘরের পর্দা ঠেলে গৃহিণী-গোছের একটি স্থূলকায়া মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মা বলে উঠল, "কী বউদিদি, চিনতে পারেন?"

"পারব না কেন? কী খবর? তুমি যে হঠাৎ?"

"এই এলুম আপনাদের কাছে। —খোকন, ইনি মামীমা, প্রণাম কর।"

করলাম। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বললেন, "কল্যাণ হোক।"

তারপর মার দিকে চেয়ে—"তোমরা সব বসো, আমি আসছি।"

স্থির গাম্ভীর্যে তিনি অপসৃত হলেন। কিন্তু বসব কিসে? দ্বিতীয় আসন নেই। সুতরাং আমরা দুজনে দাঁড়িয়েই রইলাম।

মার দাদা বললেন, "হুঁ, কী সব ব্যাপার বল তো?"

মা সুরু করল বর্তমান সাংসারিক দুরবস্থার কথা। শুনতে শুনতে হঠাৎ-ই ওঁর খেয়াল হলো মা দাঁড়িয়ে আছে, বসে নেই।

"কী আশ্চর্য, তোমরা দাঁড়িয়েই আছ!"

গম্ভীর ধারালো কণ্ঠে ডেকে উঠলেন—"এই রঘুয়া—রঘুয়া?"

"সাব্।"

"উল্লু, মাঈজী কো কুর্শি কেঁও নেই দিয়া?"

সুতরাং এতক্ষণে এলো দুটো চেয়ার। আমরা বসলাম। উনি প্রশ্ন করলেন, "হুঁ, তার পর?"

মা বলে চলল। সমস্তটা শোনার পর তিনি বললেন, "বিনয়ের সব খবরই আমার কাণে আসে। ও গোল্লায় গেছে, ওর ওপর আর ভরসা করিস না। এখন দেখ, ছেলেদের যাতে মানুষ করে তুলতে পারিস।"

"আমার তো এক আপনারই ভরসা দাদা। তাইতো আপনার কাছে এনেছি। ওকে একটা কিছু আপনার করে দিতে হবেই।"

"কী, চাকরী ?"

"হ্যাঁ, দাদা।"

"তুমি কী পাগল। ঐটুকু ছেলে চাকরী করবে কী? ওকে পড়াও।"

"অবস্থা তো সব জানেন। পড়াই কী করে ?"

"তবু পড়াতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল বলছ। ওকে পড়িয়ে যাও। এই সামান্য সতেরো-আঠারো বছর বয়স, চাকরীর বোঝেই বা কী? পড়াও—পড়াও। আমি ওর খরচ দেব।"

"শোনো।"—পর্দার ভিতর থেকে ঠিক এই সময়েই সেই মহিলাটির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"কী, আমায় ডাকছ ?"

"হ্যাঁ।"

"দাঁড়াও খুকু, আমি আসছি।"

ঘরের মধ্যে গেলেন। ফিসফিস কী কথাবার্তা হলো, উনি ফিরে এলেন।

"বুঝলে খুকু, তাই করো, ওকে পড়াও। অনেক কলেজের প্রিন্সিপাল-প্রফেসরদের সঙ্গে আমার তো আলাপ আছে, চেষ্টাচরিত্র করে ওকে ফ্রী করে দেওয়া যাবে'খন, পাশও তো ভালভাবে করেছে।"

"কিন্তু দাদা, সংসার ?"

"চলে যাবে'খন একভাবে। একটু কষ্টেসৃষ্টে চালাতে হবে আর কী। মানুষ কত কষ্ট করে ছেলে-মেয়েদের পড়ায়, এমনকি গয়না-পত্র বিক্রী করেও। একটু-আধটু পাশ-টাশ না করলে, বয়স না হলে চাকরীই বা হবে কী করে? চাকরী তো আর মুখের কথা নয়।"

"বাবা ?"

বলতে বলতে একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে আর পিছনে পিছনে দামী সাহেবী পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন।

"কী রে ?"

মেয়েটী আমাদের দেখে একটু অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

"বুঝলে খুকু, এটি আমার সেজো মেয়ে, ঊর্মিলা। ঊর্মিলা, মা, ইনি তোমার পিসীমা হন।"

"ও!"—ঊর্মিলা একটু মৃদু হাসল, তারপরে বলে উঠল, "জানো বাবা, ছাটকার কীর্তি! জোচ্চুরি করে আমায় ক্যারামে হারিয়ে দিতে চায়!"

ভদ্রলোকটি দামী ঝক্‌ঝকে জুতোর ওপর একবার পাক খেয়ে এগিয়ে এলেন, "দাদা, তোমার মেয়ের কথা তুমি বিশ্বাস করলে ?"

দাদা সস্নেহে একটু হাসলেন, মার দিকে চেয়ে বললেন, "খুকু, একে চিনতে পারো ? বয়স হয়েছে, তবু ওর ছেলেমী গেল না। একফোঁটা মেয়ের সঙ্গে খুনসুড়ি।" হেসে উঠলেন।

মা বলল, "আমাদের সুশীল না ?"

"হ্যাঁ। এতদিন বিলেতে পড়ে ছিল, এই তো সেদিন এল। সুশীল, একে চিনতে পারো ? তোমার দিদি হয় সম্পর্কে। আমাদের বড জ্যাঠার মেয়ে !"

"ওঃ হো, চিনেছি। যাঁর বিয়েতে অত ধুমধাম ! কেমন আছেন আমাদের জামাইবাবু—বিনয়বাবু ?"

আবহাওয়াটা আন্তরিকতার আভাসে এতক্ষণে সহজ হয়ে এল। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যই। চাকর এসে জানাল উর্মিলা-মেয়েটিকে, মাঈজী ডাকছেন। মেয়েটী উঠে গেল, এবং পরক্ষণেই এসে বিজ্ঞপিত করল, "বাবা ? ছোটকা ? তোমরা এসো। রায় বাহাদুর লাহিড়ী এসেছেন।"

"তাই নাকি ?"—দাদা উঠে দাঁড়ালেন, "আচ্ছা খুকু, তোমরা আজ যাও, কেমন ? আমি আজ একটু ব্যস্ত। রঘুয়া ? রঘুয়া ? উল্লু, তোম্ মেরে লাঠঠি কাঁহা রাখ্‌খা ?"

বলতে বলতে প্রস্থান করলেন। পিছনে-পিছনে সকলেই। আমরা মূঢ়ের মত খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে চলে এলাম। মার মুখ জলভরা মেঘের মতই থমথমে। বাইরে এসে মা কথা বলল, গলাটা যেন একটু ধরা-ধরা,—"লোকের কাছে দয়া ভিক্ষা করা যে কী মর্মান্তিক, তা আমি জানতাম। তাই গা থেকে গয়না খুলে দিয়েছি, শেলাইয়ের মেসিন বিক্রী করেছি, তবু কারুর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াই নি।"

"দিদি—ও দিদি ?"

পিছন থেকে ডাক শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। কেউ আমাদের ডাকছে নাকি ? এক স্যুট-পরা ভদ্রলোক একপ্রকার ছুটেই এদিকে আসছেন। কাছে আসতেই চিনলাম, ভদ্রলোক সেই তিনি—মা যাঁর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর ছোট ভাই।

"দিদি কখন চলে এলেন ?"

বিস্মিত কণ্ঠে মা বলে উঠল, "সুশীল !"

"হ্যাঁ আমি। চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"থাক ভাই, তুমি আর কেন কষ্ট করবে?"

"কষ্ট!"—সুশীল মামা বললেন, "কষ্ট কিসের! চলুন। বাড়ীটাও অন্ততঃ চিনে রাখি।"

একটু বাঁকা হেসে মা বলল, "বাড়ী দেখে আসতে চাও, চলো। কি ছিলাম কি হয়েছি স্বচক্ষেই দেখে আসবে। কিন্তু ও বাড়ী তোমাদের পায়ের ধুলো পাবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

মামা হাসলেন, বললেন, "আমার ওপর অবিচার করবেন না দিদি। মনে রাখবেন আমিও গরীব। দাদার আশ্রয়ে আছি, দাদারই পয়সায় বিলেত ঘুরে এলাম, দাদাই করে দিলেন চাকরী। ওঁদের মন যুগিয়ে বড়লোকী চালে আমিও চলেছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ যা দেখছেন এ ছদ্মবেশ। এ আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

অবাক হয়ে ওঁর দিকে চাইলাম। উনি বলে চললেন, "আমি তখ্খুনি আপনার সঙ্গে আসতাম। দাদার এক বড়লোক রায় বাহাদুর বন্ধু এলেন, তাঁর অভ্যর্থনা করতে হবে তো? আবার আমি না থাকলে চলবে না। আমি যেন একটা বস্তুবিশেষ, আমাকে বারে বারে সবাইকে দেখিয়ে ওঁরা আভিজাত্যের চাল চালেন। বিলেত ঘুরে এসেছি, আর কী, যেন চার-চারটে হাত পা বেরিয়েছে।"

হেসে উঠলেন। মার চোখের কোণ তখন চিক্‌চিক্ করছে, বলল,—"ভাই, তুমি এত ভাল!"

"ভাল!"—রাস্তার পথচারীদের হতচকিত করে সশব্দে হেসে উঠলেন, "ভাল হলে কী আর দাদার আশ্রয়ে থেকে দাদার পদলেহন করে দিন কাটাই! না দিদি, ভাল হবার যোগ্যতা আমার বিন্দুমাত্র নেই।"

"সুশীল!"—গাঢ়কণ্ঠে মা বলল, "তুমি আমার খুড়তুতো ভাই। কিন্তু আজ থেকে আমার মায়ের পেটের ভাই হলে।"

"বেশ! আশীর্বাদ করুন, যেন তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। কী জানেন দিদি, মা মারা যাবার পর থেকে আমি আর স্নেহ বলতে কিছু পাই নি। দাদা-বৌদির কাছে স্নেহ নেই, আন্তরিকতা নেই। মিথ্যা আভিজাত্যের কঠিন মুখোস এঁটে ওঁরা বসে আছেন। ঠিক এ জিনিষ আমি ওদেশেও দেখে এলাম। সেখানেও মানুষ প্রাণ হারিয়ে ফেলছে, যেন মানুষ নয়, যেন কঠোর নিষ্প্রাণ যন্ত্র।"

আশ্চর্য! ভাবতে লাগলাম এই মানুষটিকেই ও বাড়ীতে এতক্ষণ আমি ঘৃণার চোখে দেখছিলাম! নিমেষে বিপুল শ্রদ্ধায় ওঁর প্রতি মন ভরে উঠল।

"দিদি।"—সুশীল, মামা সুরু করলেন, "আপনি আমার কাছে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। আপনার সব কথাই আমি শুনেছি আমার মায়ের কাছে। বড় জ্যাঠা কত অর্থ ই না উপার্জন করেছেন একদিন! আর আজ! তাঁরই একমাত্র কন্যা আপনি, আপনার দিকে চেয়ে দেখবার আজ একটিও লোক নেই!"

মার চোখ সমবেদনায় ছলছল করে উঠল, বলল, "সুশীল, আমার জন্য আমি ভাবি না। এই ছেলে দুটিকে যদি কোনরকমে মানুষ করে তুলতে পারি তাহলেই নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

একটু থেমে উনি বললেন, "ওকে নিয়ে দাদার কাছে গিয়েছিলেন। আপনি কি মনে করেন দাদার দ্বারা কিছু হবে? হবে না। ও সব মৌখিক। দিদি ওদের তো চেনেন না!"

"দাদার কথা বলছ!"

"হ্যাঁ। অবশ্য এ আমি বলছি না যে দাদার অন্তঃকরণটা ছোট। তা নয় কী জানেন, দাদাটা ভয়ানক স্ত্রৈণ, বৌদির কথায় ওঠেন বসেন। আর বৌদি লোক তত সুবিধের নয়।"

মা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু, কিছু বলল না।

"আপনি ভাববেন না দিদি। ওকে পড়ান। দেখা যাক, আমি কিছু সাহায্য এ বিষয়ে করতে পারি কি না?"

"সুশীল!"

"মুসকিল! আসলে আমি মস্ত গরীব। তার ওপর যা মাইনে পাই, তা থেকে সামান্য হাত-খরচ রেখে বৌদির হাতে দিতে হয় তুলে। নইলে ও পড়ার জন্য আপনাকে একটুও ভাবতে হতো না।"

"সুশীল, ভাই, এত দয়া তোমার শরীরে!"

"হাসালেন দিদি! একে দয়া বলে? আর তা ছাড়া, দয়া-মায়া আমার শরীরে খুব যে আছে তা মনে করবেন না। যদি কিছু করতে পারি কর্তব্যের খাতিরেই করব। কিন্তু সে আর কতটুকু? এটুকুতে কতখানি ঋণশোধই বা হবে!"

"ঋণশোধ!"

"হ্যাঁ দিদি, আমি ভুলি নি। আমার মায়ের কাছে সব শুনেছি। দাদা যে আজ এত বড়লোক সে কার দৌলতে? বড় জ্যাঠার পায়ের অসুখে তাঁর ব্যবসা যখন তিনি দেখতে পারেন না, তখন কে কুচক্রী সমস্ত ধীরে ধীরে তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আসে?"

"সুশীল, তুমি মানুষ না দেবতা!"

"ছি-ছি, ওকথা বলবেন না,—আমি মানুষ, দস্তুরমত স্বার্থবুদ্ধি নিয়েই আমি চলাফেরা করি। কই হে, তোমাদের বাড়ী আর কতদূর?"

বললাম, "এই যে এসে গেছি।"

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে আমাদের ঘরে এলাম। অন্য ভাড়াটেরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল,—এ সাহেবটি আবার কে এলো!

সুশীল মামা বললেন, "বেশীক্ষণ বসব না, এখুনি হয়ত বাড়ীতে খোঁজ পড়বে। দিদি, আমি ভাবছি আপনার কথা। এ বাড়ী দেখলে আমার আপনাদের সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটাকে মনে পড়ে!···নিখিল, কী করছ, এক গ্লাশ জল দাও তো।"

একটু পরেই উনি উঠলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, "কাল তৈরী হয়ে থেকো নিখিল। আমি আসব, ভর্তি করে দিয়ে আসব কলেজে। দিদি শুনুন। আপনি দাদার কাছে যাবেন, বলবেন, ওকে ভর্তি করে দিয়েছি গয়না বিক্রী করে। খবরদার আমার কথা বলবেন না। বলবেন, এবার ওকে ফ্রী করে দেবার ব্যবস্থা করুন। দাদা খেয়ালী লোক। খেয়ালের বশে ফ্রী করে দিলেও দিতে পারে। এই ভাবে তো চলুক। যতদিন আমার বিয়ে না হয় ততদিন মনে হয় কোন গণ্ডগোল হবে না। কিন্তু বিয়ের পর এখন যেটুকু স্বাধীনতা আছে তা-ও থাকবে না।"

"এ কথা কেন সুশীল?"

"অতি দুঃখেই এ কথা বলছি। বউদি চেষ্টা করছে যাতে ওর বোনকে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারে। আর, বউদির চেষ্টা সফল হবেই, দাদাকে বশ হাত করেছে।"

"কেন সুশীল, মেয়েটী ভাল নয়?"

"সর্বনাশ, সে কথা কি এ পাপ মুখে উচ্চারণ করতে পারি? তিনি শিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা; রুজ-পাউডার-সাড়ী-সিনেমার নিদারুণ অনুরাগিণী—কে কি ভাল নয় বলতে পারি?"

"এ বিয়ে তুমি করো না সুশীল।"

"তাও কী হয়!" ম্লান হাসলেন,—"এড়াবার সামর্থ্য কোথায়? বলেছি তো দিদি, আমি স্বার্থপর, দাদা-বউদির পদলেহন ছাড়া আমার আর কোন পথই খোলা নেই!···আচ্ছা চলি, আবার কাল আসব।—ও কী নিখিল, প্রণাম করছ নাকি? তাহলে তো দিদিকেও আমার প্রণাম করতে হয়!—দিদি, দিন পায়ের ধুলো দিন!"

পরের দিন সত্যসত্যই তিনি এলেন। কলেজে ভর্তি হলাম। আমার সমস্ত চেতনা ঘিরে একটি সঙ্গীতই বাজছে। কলেজ-কলেজ। মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, কলেজে ভর্তি হয়েছি। কাল থেকে ক্লাস আরম্ভ। সুশীল-মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ীর দিকে চললাম।

রাজধানীর আকাশে রৌদ্রের প্রখরতা স্তিমিত হয়ে বিকেলের স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে। আকাশের নীলিমায় কার উচ্ছ্বসিত আনন্দের বাণী রয়েছে ছড়িয়ে মেঘের দল কার উদ্দেশে ভেসে চলেছে।

আমার দেহের শিরায় শিরায়, মস্তিষ্কের কোষে কোষে আনন্দের দুন্দুভি বাজছে। আজ রাত্রেই সুকু-সলিলকে চিঠি লিখব। ওদের চিঠিতে জেনেছি বহরমপুর কলেজেই ভর্তি হয়েছে ওরা।

বাড়ী এলাম। আমাদের ঘরের দাওয়ায় ও কারা বসে? একটা ঝি-র মত মেয়েমানুষ, তার কাছে পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরা দুটি ছোট ছোট ছেলে। কারা এলো বেড়াতে? ফালি বারান্দার একপ্রান্তে রান্নাঘর। সেইখানে পিঁড়ি পেতে রন্ধনরতা মার মুখোমুখি বসে গল্প করছে এক মহিলা। মাথায় ঘোমটা। পিছন থেকে তাঁর সাদা খয়েরী-পাড় সাড়ী-পরা দেহাংশ দেখতে পাচ্ছি! মা বলল, "খোকন, কে এসেছে দেখ।"

মহিলা মুখ ফেরালেন। বাণী-পিসী! ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ি। কিন্তু পরক্ষণেই অদ্ভুত কাঠিন্যে ভরে গেল আমার ভঙ্গী—না কার কাছে যাবো? ইনি ত তিনি নন। রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অভিমান অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

"নিখিল?"—ডাকলেন তিনি, "পিসীকে ভুলে গিয়েছিলে তো?"

খুব আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছু বললাম না।

"সেদিন গৌরীর সঙ্গে দেখা হলো অথচ আমাদের বাড়ীতে আর গেলে না, বেশ ছেলে!"

ওঁর মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকালাম। তারপরেই নিশ্চুপ!

"বুঝলেন বউদি,"—পিসীমা বললেন, "গৌরীও কি ছাই বলতে চায়? ওর সঙ্গে পড়ে একটি মেয়ে। সে-ই বললে, একটি ছেলের সঙ্গে গৌরীকে দেখেছে। ছেলেটা কে? গৌরী বললে, নিখিলদা! ভাগ্যিস ঠিকানাটা বলেছিলে গৌরীকে, তাই তো আসতে পারলাম।"

গৌরীও এসেছে। আমার পড়ার ঘরে আমার বইগুলো দেখছে দরজার দিকে পিছন ফিরে। ভারী ভাল লাগল, সমস্ত মেঘ যেন নিমেষে কেটে গেল আকাশ থেকে, আস্তে আস্তে গিয়ে ডাকলাম,—"গৌরী!"

এদিকে ফিরল না। ঐভাবে বই দেখতে দেখতেই বলল, "একজনের সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলব না।"

"অপরাধ?"

"যে-একজন আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল অথচ দেখা করল না, তার সঙ্গে আমার আড়ি।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক—ঠিক—ঠিক।"

"ভাব করবে না?"

"না। কেন করব?"

হেসে উঠলাম। ওর কাঁধে একবার রাখলাম হাতখানা, পরক্ষণেই তুলে নিলাম, কিন্তু কিছু বললাম না।

মুখ তুলল, বলল, "এবার দেখা করবে তো?"

"করব।"

হেসে উঠল এতক্ষণে। রান্নাঘর থেকে পিসীমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "গৌরী।"

"যাই মা।"

সাড়া দিয়ে আমার দিকে চকিতে একবার ফিরে বলল, "দেখলে তো, কী শাসন?"

চলে গেল। পরক্ষণেই বাইরে জুতোর শব্দ। তাকিয়ে দেখি, বাবা ঘরে ঢুকছেন, "ও কারা এসেছে রে?"

বললাম, "বাণী-পিসীমা।"

প্রস্তরের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। আস্তে, একটু থেমে বললেন, "হঠাৎ ?"

"বেড়াতে।"

"ও।" আবার জুতো পায়ে দিতে লাগলেন। প্রশ্ন করলাম, "আবার কোথা যাচ্ছেন ?"

"বাইরে, বাড়ীওয়ালাদের বৈঠকখানায় বসছি। তুই একগ্লাস জল আর একটা পান সেজে দিয়ে যা তো।"

"ভেতরে আসবেন না ?"

চোখ দুটো যেন নিমেষের জন্য একবার জ্বলে উঠল, বললেন, "না।"

বেরিয়ে গেলেন। আমি মার ঘরে পানের বাটার কাছে গেলাম পান সাজতে। ওঁদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, মা জিজ্ঞাসা করছে,—"ঠাকুরঝি, তোমার দাদা এসেছে। দেখা করলে না ?"

"না,"—উত্তর হলো, "কী আবার দেখা করব ওঁর সঙ্গে ? এই তো আপনার সঙ্গেই কথাবার্তা হলো। এবার উঠি। চল গৌরী, চল। বউদি আপনি অবশ্যই যাবেন নিখিলকে নিয়ে। নিখিল, পিসীর বাড়ী যেও কিন্তু।"

আসবার সময়ও গৌরী একসময় চট্ করে সরে গিয়ে আমার কাছে এসেছিল।

"কী হচ্ছে ?"

"পান সাজছি।"

"আহা, সাজার কী ছিরি ! সরো, আমি সেজে দিই।"

বলে আমার গা ঘেঁসে বসে পড়ল। ওর স্পর্শে আমি সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলাম।

এর একটু পরেই ওঁরা চলে গেলেন !

॥ তিন ॥

কলেজ ··কলেজ ! অবশেষে সত্যিসত্যিই কলেজের দরজায় পা দিলাম। প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে চলেছি, ওপরে ছাত্রদের ভীড়ের সঙ্গে মিশে। ঐ যে সিঁড়ির কাছে ক্লাশরুটিন দিয়েছে টাঙিয়ে। একটি বৃহৎ জটলা ওখানে গুঞ্জন তুলছে। আমিও গেলাম এগিয়ে।

"ফার্স্ট ইয়ার নিশ্চয়, সায়েন্স্ না আর্টস্ ?"

"আমাকে বলছেন !"—একটু অবাক হয়েই বললাম।

পরিচ্ছন্ন টুইলের সার্ট গায়ে ছেলেটা এগিয়ে এলো, "হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আপনিও মফঃস্বল থেকে আসছেন মনে হচ্ছে। আমিও তাই।"

"মফঃস্বল থেকে ঠিক নয়,"—আমি বললাম, "আমি কলকাতারই ছেলে, তবে পাশ করে এলাম মফঃস্বল থেকে অবশ্য।"

"ও-ই হলো। দেখছেন না কলকাতার ছেলেরা কতো ফ্রি, চোখে-মুখে কথা বলে। কিন্তু আপনি তো আমাদের মতই জড়োসড়ো হয়ে বেড়াচ্ছেন।"

একটু হাসলাম। ছেলেটি বলল, "আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি কিন্তু। সায়েন্স না আর্টস্ ?"

বললাম, "আর্টস্। লজিক-সিভিক্স্-সান্স্ক্রিট্।"

"আরে, আমারও যে তাই ! ফোর্থ সাব্জেক্ট নেবেন নাকি ?"

"দরখাস্ত দিয়েছি। প্রিন্সিপাল অনুমতি দিলেই নেবার ইচ্ছা আছে। কেমিস্ট্রি।"

"অর্থাৎ মিক্স্ড্ আর্টস্। মন্দ যুক্তি নয়। তবে খাটতে হবে। আমারও ফোর্থ সাব্জেক্ট্ নেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দেবে না। আমি পাশ করেছি সেকেণ্ড ডিভিশানে কি না, সেকেণ্ড ডিভিশানকে প্রিন্সিপাল দেবেন না।"

"চলুন, বড্ড ভীড়, ওদিকে যাই।"

"রুটিন নিয়েছেন ? এ ঘণ্টাতেই ক্লাশ। সিভিক্স। জে-কে-এম।"

"ওটার মানে ?"

ছেলেটা হাসল, "কিসের মানে ? জে-কে-এম ? যতীন্দ্রকুমার মুখার্জী। সিভিক্সের প্রফেসর। রুটিনে ওঁদের নাম ঐভাবে দেওয়া আছে। দেখেন নি···ঐ ঘণ্টা পড়ল। চলুন। আপনার সেকশন ?"

"এ।"

"চমৎকার ! আপনাকেও 'এ'তে ঠেলেছে ? আমারও তাই—সাত নম্বর ঘর। জে-কে-এম—সিভিক্স।"

"আপনার রোল্-নম্বর ?"

"৩০২।"

"আমার ১০১ মনে রাখবেন। ভাল কথা, আপনার নাম ?"

"নিখিলেশ মুখোপাধ্যায়। আপনার ?"

"স্নিগ্ধাংশু রায়চৌধুরী।"

সুরু হলো কলেজ-জীবন। ক্লাশ-বদল, প্রফেসর, কমনরুম, লাইব্রেরী আঃ, এই তো জীবন!

কিন্তু বাবা শুনে মুখ বাঁকালেন,—"ভুল করলি। কী হবে পড়ে? জীবনে প্রতিষ্ঠা? এই দেখ, আমিও তো পড়েছিলাম। কী হলো?...শুধু কী আমি? কত এম-এ, বি-এ হাজারে হাজারে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। চাকরীর বাজারে আসল কথা—মুরুব্বির জোর, ওসব পাশ-টাশ কিছু না। আর শিক্ষা? কলেজে কি সত্যই শিক্ষা হয়? শিক্ষা নিজের কাছে, আর সেটা বাড়ীতে বসে হয়। সোজা কথায় ডিগ্রী-দাতা কলেজ হচ্ছে ভাল একটি পালিশকরা মুচি—তুমি যা আছ তাই থাকবে, খালি সে একটু পালিশ করে তোমাকে চক্‌চকে করে ছেড়ে দেবে!"

স্তব্ধ হয়ে ভাবি! বাবার কথাই হয়ত ঠিক। ওঁর এ কথা বলবার অধিকারও আছে। নিমেষে সমস্ত উৎসাহ নিভে যায়। মা বলে, "পড়া তো সুরু করলি, এখন সংসার? আমি তো কিছুই ভেবে পাই না!"

তবু দিন চলল। সুশীল-মামার কাছে মাকে নিয়ে বহু হাঁটাহাটি, ধনীর দুয়ারে সেই কৃপাপ্রার্থী হয়ে হাত পেতে দাঁড়ানো। অনেক চেষ্টায় কলেজে অবশেষে ফ্রী হলাম না, তবে হাফ-ফ্রী হলাম। বই-ও দু'একখানা জোগাড় হলো, কিছু সুশীল-মামা দিলেন কিনে, কিছু কম মূল্যে পুরানো বইয়ের দোকান থেকে। তবুও সব বই হলো না। অনেক ছাত্র নোট-বই যোগাড় করে, আমার পাঠ্য জীবনে নোট বই কোনওদিন পাইনি এবং দরকারও হয়নি। কিন্তু এ সব কথা থাক।

সংসারের অবস্থা তখন শোচনীয়। অতিকষ্টে দুটি অন্ন জোটে, পরিধেয় বস্ত্র সবারই জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়ে উঠল। ওঃ অসহ্য! থাক পড়া। কী হবে পড়ে যদি না মা-ভাইয়ের মুখে এ নিদারুণ দুর্দিনে অন্নই দিতে পারলাম! সেদিন গভীর রাত্রে মা ধমকে উঠল বাবাকে, "কী, তুমি ভেবেছ কী? সুশীলের কাছ থেকে পঁচিশ টাকা নিয়েছ, অথচ সংসারে একপয়সাও দাও নি! আমরা কী খাই? এক কণা চাল নেই, মুদির তাগাদা, বাড়ীওয়ালার তাগাদা! কাঁহাতক সহ্য করা যায়!"

"কাবুলিকে দিতে হলো যে! ব্যাটা রাস্তায় সেদিন অপমান করেছে!"

"বেশ করেছে!"—মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "ধরে ঘা কতক যে দেয়নি, এই ঢের! পারো না, মরতে পারো না গঙ্গায় ডুবে?"

"তাই মরব।"

"হ্যাঁ মরো,—মরলে হাড় আমার জুড়োয়!"

হাতের লজিক-খানা মুড়ে রেখে বিছানায় ধপ্ করে বসে পড়লাম। বার্‌বারা—সিলারেণ্ট—ডারিয়াই—ফেরিও!—তোমরা চুপচাপ পড়ে থাকো। কী দিতে পারো তোমরা? চাই অন্ন, চাই অর্থ! নিদারুণ বুভুক্ষায় সমস্ত সংসার করুণ আর্তনাদ তুলছে,—দাও-দাও, বাঁচাও! ভাবলাম, ট্যুইশানী করব। সুশীল-মামা জোগাড় করে দেবেন বলেছেন। তবু তো সংসারের কিছুটা সাশ্রয় হবে!

এ দুর্দিনে সুশীল মামার উপকার ভুলবার নয়। তাঁরও চারপাশে দুস্তর বাধা! তবুও সুযোগ পেলে নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন! সত্যিই আমার একটা ট্যুইশানি তিনি করে দিলেন। দশ টাকা দক্ষিণা—দুটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে-পড়ানো। তিনি বলেন, "যুগ ক্রমশ বদলাচ্ছে। আগে আগে কত ধনীলোক দরিদ্র ছাত্রের জন্য রীতিমত সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এ কালে তা খুবই কম। নিজের স্বার্থটাকে বড়ো করে দেখাই এখনকার বৈশিষ্ট্য। এটা যে বণিক-যুগ। মানুষের হৃদয় থেকে দয়া-মমতা-দান-ধ্যান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। কী অভিশপ্ত প্রতিক্রিয়ার কাল! দয়া-দাক্ষিণ্যে পুণ্য অর্জন একালের লোকের মধ্যে নেই। পুণ্য কথাটার ওপরই মানুষের আর বিশ্বাস নেই,—কী লাভ পাপ পুণ্যে?"......

তবু এযুগেও সুশীল-মামার মত লোকের দেখা মেলে। কিন্তু সংখ্যায় কয়জনই বা!

একদিন কী বিমর্ষ চেহারা নিয়েই না তিনি এলেন! আমার চৌকিটার ওপর এসেই ধপ্ করে শুয়ে পড়লেন। বললেন, "দিদি, পারলাম না এড়াতে, হাঁড়িকাঠে বলির পশু হয়ে মাথা গলাতেই হলো।"

"কী ব্যাপার সুশীল?"

"আমার বিয়ে।"

"এ তো আনন্দেরই কথা।"

"বৌদির সেই আধুনিকা বোনের সঙ্গে। যা ভয় করেছিলুম, তাই-ই হলো। যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তাও থাকবে না। দিদি?"

"কী ভাই?"

"রঙীন চিঠি আপনার কাছেও আসবে আশা করি। আপনি যাবেন তো?"

"নিশ্চয় যাবো। তোমার বিয়ে, আমি যাবো না সুশীল?"

"না দিদি!"—সুশীল-মামা উঠে বসলেন, বললেন বিষাদ-ক্লিষ্ট করুণকণ্ঠে—"আপনি যাবেন না, আমার অনুরোধ। আসবে কতো তথাকথিত রায় সাহেব রায় বাহাদুরের দল, ওরা পোষাকের চটক আর গয়নার জৌলুষ নিয়েই ঝলমল করে বেড়াবে, সত্যিকারের ঐশ্বর্যের প্রতি কী ওদের দৃষ্টি আছে? অন্তরের অতুল ঐশ্বর্যের কথা ওরা বোঝেও না, জানেও না।"—উনি চুপ করলেন, আমরা বিপুল বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

অতএব ওঁর বিয়েতে আমরা কেউ গেলাম না। কিন্তু বিয়ের পরদিন বিকালে হঠাৎ উনি এলেন আমাদের বাড়ী। এই প্রথম ওঁকে দেখলাম ধুতি-চাদর পরনে।

"দিদি?"

"এসো সুশীল।"

"বিয়ে হয়ে গেল। আজ কালরাত্রি। চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি আপনার কাছে। বেশীক্ষণ থাকব না। এদিকে আসুন দিদি, প্রণাম করব আশীর্বাদ করুন আপনি।"

তারপর চৌকির ওপর শুয়ে পড়লেন, বললেন, "দিদি, ভাইয়ের একটা আব্দার রাখুন। আজ আপনার হাতের রান্না খাবো। শীগ্‌গির রান্না চাপান যেন রাত আটটার বেশী দেরী না হয়। ···নিখিল, এদিকে শোনো? এই নাও টাকা, বাজার কাছেই তো? বাজারে চলে যাও। দিদিকে জিজ্ঞাস করে নাও, কী-কী আনতে হবে।"

আমার হাতে গুঁজে দিলেন একখানা দশ টাকার নোট।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আরও পাঁচ টাকা নাও। সন্দেশ আনবে, বুঝলে, সন্দেশ পাঁচ টাকার সন্দেশ।"

মা এগিয়ে এলো—"ও কী করছ সুশীল, অত টাকা!"

"আঃ দিদি, আপনি চুপ করুন তো! আমার দিদির বাড়ীতে আজ আমাদের ফিস্ট! কী বলো নিখিল? এই কমল, এদিকে আয়। ব্যাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ না হাঁ করে। আমার পাকা চুল তুলে দেবে কে?"

কমল হাততালি দিয়ে উঠল, "এ মামা, তোমার পাকাচুল আছে নাকি আবার?"

আমি ধমকে উঠলাম, "তুমি কী রে? 'আপনি' বল।"

"যা-যা, তোর কাজে যা।" উনি বলে উঠলেন, "আবার দাদাগিরি ফলানো হচ্ছে? কলেজের ছাত্র কি না।"

কমলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "না রে কমলা, তুই 'তুমি' 'তুই' যা খুশি বলিস। We are friends—তাই না রে? ফ্রেণ্ড মানে—"

কমল বলল, "বন্ধু।"

"There you are! বন্ধু—বন্ধু!"

সে সন্ধ্যায় আমাদের ঘরে বিরাট উৎসব। উনি খেতে খেতে বললেন, "দেখলেন তো? কী স্বার্থপর! আপনার হাতের চমৎকার রান্না খেয়ে গেলাম।"

বাস্তবিক, একে মার হাতের রান্নাই চমৎকার, তার উপর সেদিন আরও ভাল হয়েছিল্।

"দিদি, জামাইবাবু তো এখনো ফিরলেন না। ফেরেন কখন?"

"অনেক রাত্রে। কোনদিন ফেরেই না। ঐ খাবার ঢাকা রইল, আসে তো ভাগ্যে জুটবে।"

"ভাল কথা দিদি—"সুশীল-মামা বললেন, "পরশুদিন আমি অফিসে বেরুবো। আপনি জামাইবাবুকে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। একটা চাকরীর চেষ্টায় আছি, হয়ত হয়ে যেতে পারে।"

চাকরী!...আমাদের অন্তর যেন অসহ্য আনন্দে নৃত্য করে উঠল।

"সত্যি সুশীল!"

"হ্যা, দিদি। একটা স্কুল-মাস্টারী। অফিসে তো হবে না, সেটা আবার আমার দাদার এলাকা। আর জানেন তো ওঁর উপর দাদার ধারনা ভাল না। যাই হোক, পরশুদিন অবশ্যই পাঠাবেন। দেখা যাক্, কী হয়!"

রাত্রে বাবাকে কথাটা বলতেই বাবা হেসে উঠলেন, হাতের বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে বলে উঠলেন, "আরে ছ্যোঃ! তোমরাও যেমন! সুশীল দেবে চাকরী! তাহলেই হয়েছে! সেদিনকার পুঁচ্‌কে ছোক্‌রা! না হয় বিলেত থেকে দু'দুবার ফেল করে কষ্টেস্বষ্টে অ্যাকাউণ্টেন্সিটা পাশ করে এসেছে। তাতে হয়েছে কী? দাদার অফিসে ভারী তো চাকরী করে, তার আবার...হুঁ...!"

"তুমি দেখা করতে যাবে না?"

"পাগল!" বাবা আরেকটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললে, "ওসব

চালিয়াৎদের আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ভাবো কী? ওরা আসলে সবাই এক। একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ।"

"তবু তুমি যাও একবার।"

"দূর্—দূর্! তার চেয়ে বেঁচে থাক আমার শেয়ার মার্কেট! স্পেকুলেশান, বুঝলে, স্পেকুলেশান। আজ কিছুই আসছে না, কিন্তু যখন আসবে তখন হু-হু করেই ঘরে টাকা আসবে।"

"বোঝা গেছে! এখন ভাল চাও তো ওর সঙ্গে দেখা করো।"

"কথ্খনো না।"

কথাটা আমারও ভাল লাগে নি, বললাম, "তা হোক, তবু আপনি যান, দেখা করুন, দেখা আপনাকে করতেই হবে।"

আমার দিকে সকৌতুকে একটু তাকালেন, কী যেন ভেবে নিলেন একমুহূর্ত, তারপরে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "আচ্ছা, তোরা যখন বলছিস, দেখাই না হয় করব।"

কিন্তু দেখা করেন নি। সেদিন সন্ধ্যায় বাবা কী জন্য হঠাৎ বাড়ীতেই আছেন। সুশীল-মামা এলেন।

"কী জামাইবাবু, আপনি দেখাই করলেন না আমার সঙ্গে?"

বিড়ি টানতে টানতে বাবা একটু হাসলেন অপ্রস্তুতের মত, বললেন, "এই যে, এই একটু কাজ ছিল।"

"গেলে ভাল করতেন। স্কুলের সেক্রেটারী আমার অফিসে এসেছিলেন, বেশ কথাবার্তা হয়ে যেতো তখনই। ভদ্রলোককে গল্পে গল্পে আমি অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, আপনি আসবেন মনে করে।"

বাবা নির্বিকার চিত্তে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ছেন।

সুশীল-মামা বললেন, "যা হবার হয়ে গেছে। এখন আমার সঙ্গে আসুন দেখি। আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাই আপনাকে সেক্রেটারীর বাড়ীতে চলুন।"

"দাঁড়াও, একটু বসো, জিরিয়ে নাও?"

"জিরোতে গেলে ভদ্রলোককে বাড়ীতে পাব না। আপনি উঠুন দেখি?"

"চলো, এত করে বলছ যখন চলো। দাঁড়াও, এক্ কাপ চা খেয়ে যাই—ওরে নিখিল?"

"কী আশ্চর্য, আপনার চাকরী, আর আপনার একটুও মাথাব্যথা নেই

চলুন-চলুন ? চা না হয় এসে খাবেন, কিম্বা রাস্তায় কোন দোকানে নিয়ে গিয়ে আপনাকে খাওয়াবো।"

"সেই বেশ, অনেকদিন রেস্টুরেণ্টে খাই নি।"

"সে হবে'খন। এখন চলুন।"

বলা বাহুল্য, বাবা যা বিশ্বাস করতে চান নি, তা-ই হলো, সুশীল মামার একান্ত চেষ্টায় ও আগ্রহে অতি সহজেই বাবার চাকরীটা হয়ে গেল। ষাট টাকা মাইনে। সমস্ত সংসারটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আমি বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে এলাম খবরটা, বলে এলাম, "চিন্তা নেই, এবার আপনার টাকা শোধ দেব।"

যেন একটা সুর এলো। এলো একটা ছন্দ দুর্গম বন্ধুর জীবনযাত্রায়। দুপুরবেলা ছুটীর দিনে ঘরে বসে পডতে পডতে দেখি, দাওয়ায় কমলকে কোলের কাছে বসিয়ে মা গল্প করছে অন্য ভাডাটে বৌ-ঝিদের সঙ্গে। ওরা ঝগডাটে, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপ্রবণ। কিন্তু মার সঙ্গে সম্পর্ক অন্য। মার চারদিকে গোল হয়ে বসে ওরা কোনদিন শেলাই শেখে, কোনদিন গল্প শোনে। ওঘরের সেই ঝগড়াটে মুখরা বউটিও আসে, বাড়ীওয়ালার কুৎসিত মিশ-কালো অনূঢ়া দজ্জাল মেয়েটিও আসে, ওপাশের বিকৃতকণ্ঠী অল্পবয়সী বিধবাটিও আসে, যে সেদিন ওঘরের স্কুলপণ্ডিত-গৃহিণীর সঙ্গে কলতলায় চুলোচুলি বাধিয়েছিল। আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। বাড়ীর পর বাড়ী সারি দেওয়া। মধ্যে মধ্যে দু'একটা নারকেল গাছের চূডা চোখে পডে। মধ্যাহ্নের সূর্য ঝিল্‌মিলিয়ে উঠছে পাতার ওপর। দুলছে বাতাস। তন্দ্রালস নারিকেলশীর্ষ স্পর্শ মাধুর্যে মদির। আকাশটা নীল। অদ্ভুত নীল। যেদিকে তাকাই নীল আর নীল! অথৈ অগাধ নিস্তরঙ্গ মহাসাগর, মাঝে সাদা মেঘের দ্বীপগুলি যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। আমি তখন কোল্‌রিজের "Ancient Mariner" পডছি।—

> Day after day, day after day,
> We stuck not breath not motion,
> As idle as painted ship
> Upon a painted ocean !…

সেদিন বিকেলে মা বল্‌ল, "খোকন, চল একবার আজ বাণী-ঠাকুরঝির বাড়ী যাই। অত করে বেচারী সেদিন বাড়ী বয়ে এসে বলে গেল।"

"চলো।"

"তুই তো বাড়ী চিনিস?"

"হ্যাঁ।"

"কমল কই? কমলকে ডেকে আন।"

ডেকে আনলাম, তারপরে চললাম পিসিমার বাড়ীর দিকে।

গৌরীদের বাড়ী। ওপরের জানালা থেকে ও-ই আমাদের সর্বপ্রথমে দেখতে পেল, ছুটে নীচে এসে মার হাত ধরে নিয়ে গেল ওপরে। আমাকে বৈঠকখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "নিখিলদা, আপনি বৈঠকখানায় বসুন, বাবার সঙ্গে গল্প করুন, কেমন? ...বাবা, এই যে নিখিলদা এসেছেন, মামীমা এসেছেন, ওঁকে মার কাছে নিয়ে চললুম।"

"কে, বউঠাকরুণ এসেছেন নাকি? নমস্কার—নমস্কার!" প্রফুল্লবাবু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন,—"সবই মায়ের ইচ্ছা,—আপনার পায়ের ধুলো পড়ল বিনয়বাবু তো দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। সবই মায়ের ইচ্ছা!"...

পুরু ঠোঁট দুটি আকর্ণ বিস্তৃত করে তিনি হেসে উঠলেন। যথারীতি প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে মা-ও ভিতরে গেলেন চলে। প্রফুল্লবাবু ফিরলেন আমার দিকে,—"কই হে, বসো। কতকাল পরে তোমাকে দেখছি। কলেজে পড়ছ বেশ—বেশ। ...তারপরে বুঝলেন গোবিন্দবাবু, শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠিক কথাই বলে গেছেন। তিনি বলেছেন......"

ওঁরই বয়সী হৃষ্ট পুষ্ট স্থূলকায় ভদ্রলোক—গোবিন্দবাবু, প্রতিবাসী বন্ধুস্থানীয় হবেন কেউ। তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণের পুণ্যবাণীর আলোচনা চলল! শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল বালক-বয়সে দেখা সেই মর্মান্তিক চিত্রটি! ওঁর হাতে চাবুক, রান্নাঘরে পড়ে আছেন বাণী-পিসী হাত-পা-মুখ-বাঁধা, সর্বাঙ্গে বেত্রাঘাতের চিহ্ন, কপাল কেটে রক্ত পড়ছে! ভদ্রলোক স্থূলতর হয়েছেন, চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখে ভক্তসুলভ হাসি, হাতের কাছে রামকৃষ্ণ-কথামৃত। ঘরের দেয়ালে বড় রামকৃষ্ণের ছবি, বিবেকানন্দের ছবি।

"তাই তো বলি গোবিন্দবাবু," প্রফুল্লবাবুর কণ্ঠস্বর কানে আসছে—"শ্রীমৎ পরমহংস বলতেন, মানুষ তো নয় খোঁটা বাঁধা গরু। বুঝলেন? সবই মায়ের ইচ্ছা!"......

এই সময়ে কমল এলো ভিতর থেকে, বলল, "দাদা, এসো, মা ডাকছে।"

বাঁচলাম। লোকটাকে আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল কথামৃতের চেয়ে চাবুক হাতেই ওকে বেশী শোভা পায়।

ভিতরে দুটি ঘর। সামনে বারান্দা। বারান্দার প্রান্তে রান্নাঘর প্রভৃতি। রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে মা—পিসিমা ভিতরে।

"এসো নিখিল"—পিসিমা বললেন, "বসো গিয়ে ঘরে। গৌরী কোথায় গেল? বসতে দে নিখিলকে।"

"যাই মা!" ওপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "আমি ছাতে এসেছি। কাপড়গুলো তোলা হয় নি, সেই ভাবে পড়ে আছে।"

"দেখছেন বৌদি" —পিসিমা বললেন, "মেয়ের কাজের ছিরি! সন্ধ্যা হয়ে এলো, এখনো কাপড় শুকুচ্ছে ছাতে।"

"তা আমি কী করব!"—গৌরী নীচে নেমে আসতে আসতে বলে উঠল, "আমার কী চারটে হাত? সারাক্ষণ কাজই তো করছি, কাজ-কাজ-কাজ, দেখুন না মামীমা?"

"কাজের কী হয়েছে!" বাণী-পিসী বললেন, "পরের ঘয়ে গিয়ে টেরটি পাবি।"

"হয়েছে, তুমি থামো।"

"জানেন বৌদি,"—লুচি বেলতে বেলতে পিসিমা বললেন, "আপনার ঠাকুরজামাইয়ের আবার খুব ধর্মের দিকে মন গেছে। মাছ-মাংস খান না, সে এক কীর্তি! আমার হয়েছে মহা-জ্বালা, দুটি কচি ছেলে আর ঐ ধিঙ্গী মেয়ে গলার ওপর,—কাঁহাতক আর ঝক্কি সামলানো যায়। উনি তো তাঁর মিশন আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই অস্থির!"

এইটুকুই যথেষ্ট। যে বাণী-পিসীকে একদিন তন্ময় হয়ে কবিগুরুর "গুরু-গোবিন্দ" আবৃত্তি করতে দেখেছিলাম, সেই বাণী-পিসীর মৃত্যু হয়েছে,—এ যা দেখছি, এ তার কঙ্কাল! কিন্তু কেন এ শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ, কেন বুভুক্ষিত অভিশপ্ত সংশয়গ্রস্ত যুগের হাতে অবলীলায় এ আত্মসমর্পণ!

গৌরীর বয়সী একটি মেয়ে গৌরীকে ডেকে নিয়ে গেল ঐদিকে, মেয়েটি নীচের ভাড়াটে বোধ হয়। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার কাছে এলো, বললে, "ওমা! নিখিলদা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন? আসুন, আসুন—বসবেন।"

ঘরের উপর দিকে রাস্তার অপরিসর ছোট্ট বারান্দা। তারই এককোণে একটা চেয়ার টেনে আনল, বলল "বসুন এখানে। এই সুষি? জানিস, এই আমার নিখিল-দাদা, মামাতো ভাই হয় সম্পর্কে। আপনি বসুন নিখিলদা, আসি আসছি।"

বসে রইলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভিতরের ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি উঠল জ্বলে। তারই আলোর দিকে চেয়ে আমাদের সেই ক্ষুদ্র টিনের ঘরের ক্ষুদ্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলোক মনে পড়ল।

স্বষিকে সঙ্গে নিয়ে গৌরী এলো খাবারের থালা হাতে, বলল, "এই নিন, খান। স্বষি জলটা রাখ, বারান্দার আলোটা জ্বেলে দে না ভাই।"

ওরা আবার অপসৃত হলো। চলতে লাগল আমার খাওয়া, তা-ও হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসের জলটা হাতে নিয়ে অদূরের নালির কাছে একটু ঝুঁকে হাত ধুতে লাগলাম। হঠাৎ কানে গেল খিলখিল হাসি। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ঘরের ভিতরে আমারই দিকে তাকিয়ে তুজনে গা টেপাটেপি করে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কী হলো? চকিতে চাইলাম আমার পরিচ্ছদের দিকে। মলিন পুরানো অল্প দামের ছিটের সার্ট, মলিন মোটা ধুতি, পায়ের ধূলিমলিন পুরানো জুতোটায় তালি পড়েছে। তাই কী? তাই কী ওদের হাসির কারণ? আমার হাতের গ্লাসটা কেঁপে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কোনরকমে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। আমরা গরীব, সেই জন্যই ওরা আমাদের দেখে হাসে, ঘৃণা করে।

স্বষি এসে বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল। উত্তীর্ণ সন্ধ্যা বারান্দার অন্ধকারে বসে রইলাম। ভিতরে সিঁড়ির কাছে শুনলাম গৌরীর কণ্ঠস্বর—"আবার আসিস ভাই স্বষি?"

"আচ্ছা।"

মেয়েটি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, বুঝলাম! এর একটু পরেই ঘরের আলোটা নিভে গেল। পরক্ষণেই অনুভব করলাম, আমার কাঁধের ওপর কার নরম তুটি বাহুর উষ্ণ আলিঙ্গন।

প্রায় ফিসফিসিয়েই গৌরী বলল, "রাগ করেছ?"

আমি কথা বললাম না।

কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, "রাগ করো না, লক্ষ্মীটি! দেখছ না, কতো লুকিয়ে-চুরিয়ে তোমার কাছে আসতে হয়।"

"জানি-জানি"—ওকে একপ্রকার ঠেলে দিয়েই আমি উঠে দাঁড়ালাম "তোমাদের আমি বেশ জানি। আমরা গরীব তাই তোমরা ঘৃণা করো আমাদের দেখে হাসো, উপহাস করো! চাই না তোমাদের সংস্রবে আসতে!"

ওর স্তম্ভিত মুখের দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে দ্রুত পায়ে মার কছে চলে এলাম। বললাম,—"মা বাড়ী চলো, রাত হলো।"

"চল।"

যথারীতি প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে মা বিদায় নিলেন, আমরা চলে এলাম।

॥ চার ॥

প্রতিক্রিয়া! যে বাবা একটুকরো পান পর্যন্ত মুখে দিতেন না, তাঁর মুহূর্তে-মুহূর্তে বিড়ি-সিগারেট না হলে চলে না। কিন্তু কেন? মনে হলো, নিরোধ। কোন জিনিষেরই অতিরিক্ত নিরোধ অর্থাৎ আত্মদমন ভাল না। প্রতিক্রিয়া যখন আসে, তখন তটপ্লাবী বর্ষার প্রবাহের মত দুর্নিবার গতিতেই আসে। বাবার ধূমপানের প্রাচুর্য তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ভাবা গিয়েছিল, বাবার চাকরীর ফলে সংসারের গতি হবে স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তা হলো না। স্রোতে গা-ভাসানো সংশয়বাদী মানুষেরা ব্যবহারিক জগতে হয় অতি সাংঘাতিক। তাই-ই হল। অভাব-অশান্তি সমানে চলল! আমাকে আরও একটা ট্যুইশানি নিতে হলো। দুটো ট্যুইশানি, তার ওপর কলেজ এবং কলেজের পড়া, বিশেষতঃ কেমিস্ট্রির প্রাকৃটিক্যাল ক্লাশ, সময় যে কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে টেরও পাই না!

সুশীল মামা কদাচিৎ আসেন। নতুন বিয়ে করে উনি দক্ষিণ কলকাতায় বালিগঞ্জে বাসা নিয়েছেন। স্ত্রীকে নিয়ে পার্টি, পিক্‌নিক্‌, সোসাইটীর নিয়ম-রক্ষা—সুশীল-মামার আর মুক্তি নেই।

এদিকে মার মন দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। অতি আশা করেছিল—বাবার চাকরী হলো, সংসার কোন রকমে চলে যাবে। কিন্তু কোন রকমেই চলছে না। দেখে শুনে মা হাল দিল ছেড়ে। শরীরও ভেঙে পড়ল। একান্ত আশায় ঘা পড়লে মানুষের মন স্বভাবতই সন্দেহ ও সংশয়প্রবণ হয়ে ওঠে। মাও হলো তাই। মধ্যে মধ্যে বলে ওঠে, "এভাবে সংসার চলে না। ছাই সংসার। তোরা যা হয় কর। আমি ঐ কচি ছেলেটার হাত ধরে কাশী চলে যাই। সেখানে আমার এক মাসী আছে, তার কাছে থাকব গিয়ে।"

কিন্তু তবু যেতে পারে না। হায় রে নারীর মন! ঐ যে উনুনের পাশে মেটে ভাতের হাঁড়িটি, ঐ যে ক্ষুদ্র ঘরটির কোণে লক্ষীর ঝাঁপির কাছে মৃদু প্রদীপ শিখাটি জ্বলছে, তারই মায়ায় মা আবার গৃহকাজে হাত দেয়।

দুটি ট্যুইশানি সেরে তারপরে কলেজের পড়া। রাত জেগেও পড়তে হয়। সমস্তটা দিন মনটি উন্মুখ হয়ে থাকে কখন বইগুলির পৃষ্ঠা গিয়ে ওলটাবো। মা সময়-সময় জ্বলে ওঠে—"ছাই পড়া। রাত দিন পড়া। এদিকে ঘরে এটা নেই ওটা নেই, তার ব্যবস্থা করে কে? দূর করে ফেলে দে বইগুলো উনুনের মধ্যে। কলেজের পড়া! পড়ে হবে কি!"...

তীব্র আঘাত এসে বাজল তৃষিত মনে,—হায় রে, এত করেও কি একান্ত একটু অবসর পাবো না পড়ার?...

কলেজ। কমনরুম। লাইব্রেরী। সেদিন কলেজের পর স্নিগ্ধাংশু বলল, "চলুন, বেড়িয়ে আসি। হাঁটতে হাঁটতে কার্জন-পার্ক। কেমন রাজী?"...

"রাজী।"

কার্জন-পার্ক। অদূরে নগরীর সৌধমালা। এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামের ভীড়। সন্ধ্যা নামছে। একসময় বললাম, "এবার উঠুন। আমার আবার ট্যুইশানি আছে।"

"ট্যুইশানি করেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, ওঠা যাক।"

উঠলাম। ঠিক সেই সময় গায়ে-জড়ানো মোটা চাদর, চাদরের নীচে ঝুলানো টিনের বাক্স, একটি লোক এসে সামনে দাঁড়াল,—"চানাচুর চাই স্যর, চানাচুর-নকুলদানা!"

স্নিগ্ধাংশু বলল, "দাঁড়ান নিখিলবাবু, চানাচুর কিনি।"

কেনা হলো। বিক্রেতা লোকটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হলো লোকটি যেন আমার নিতান্তই অপরিচিত নয়, ওকে কোথায় যেন আমি দেখেছি!

'দেখুন—" আমি তাকে বললাম, "আপনাকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে...!"

"হতে পারে—" লোকটা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো সারা সহর ঘুরে বলতে গেলে চানাচুর বিক্রী করে বেড়াই। হয়ত কোথাও দেখে থাকবেন। আচ্ছা, নমস্কার।—চাই চানাচুর!..."

"দেখুন—" বাধা দিয়ে আবার বললাম, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ভদ্র-লোকের ছেলে।"

লোকটা হাসল,—"আশ্চর্য নয়, অনেক ছোটলোক্‌কেই বহুসময় ভদ্রলোক বলে মনে হয়। চাই চানাচুর···নকুলদানা!"

সরে গেল। মনে-মনে ঠিক করলাম, লোকটার পিছু নেব। ঠিক মনে হচ্ছে, লোকটা আমার ভয়ানক চেনা।

স্নিগ্ধাংশু বলল, "আপনার আবার ট্যুইশানী আছে। নইলে চলুন, মেট্রোয় আজ একখানা ভালো বই দিয়েছে।"

"বেশ তো, আপনি যান না!"

"তাই কী হয, একা একা!"

"তাতে কী? আপনি যান। তাছাড়া, আমারও একটু তাডাতাড়ি আছে। আচ্ছা, নমস্কার।"

ওকে একপ্রকার এড়িয়েই বেরিয়ে এলাম এস্‌প্ল্যানেড থেকে। ঐ যে ফিরিওয়ালা-লোকটা চলেছে ধর্মতলার বাঁ ফুটপাথ দিয়ে ফিরি করতে করতে। এবার ঐ যে সিনেমা-হাউসটার মোড ফিরল। তাডাতাড়ি হেটে লোকটার পিছু নিলাম।

"ও দাদা?"

আমার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল, তারপরে ভাল করে আমায় দেখে নিয়ে বলে উঠল, "ও, আপনি? চানাচুর নেবেন নাকি?"

"না। আপনি কোথায় চলেছেন?"

"এই ফিরি করতে করতে এবার বাডীর দিকেই চলেছি।"

"চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।"

মুখ টিপে লোকটা একটু হাসল, বলল, "চলুন। একই যায়গায় তো বাডী দুজনের।"

চমকে বললাম, "তার মানে!"

লোকটা একটু হাসল,—"আপনি আমায় চেনেন না, আমি আপনাকে চিনি।"

"কী রকম?"

লোকটা আবার হাসল,—"দাঁড়ান, বলছি, ভীড়টা ছাড়িয়ে যাই। হ্যাঁ, আপনি যে টিনের বস্তীটায় থাকেন, সেই গলির ওপারে একটা মেটেবাড়ী-

খোলার-চাল-দেওয়া বস্তী আছে জানেন নিশ্চয়, আমি ওখানেই থাকি। বাইরের কলে চান করি, আপনি কলেজে যান, রোজ আমাদের দেখা হয়।"

"ওঃ হো, এতক্ষণে ঠিক মনে পড়েছে! আপনিই চান করতে করতে..."

"বলুন ?"

বললাম, "আপনি ভদ্রলোকের ছেলে এবং শিক্ষিত। নইলে চান করতে করতে আপনি কেমন করে সেদিন গুন্‌গুন্‌ করে গাইছিলেন কবিগুরুর গান,—কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়!"

ভদ্রলোক এবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললাম, "আপনার শিক্ষা কতদূর জানতে পারি কী ?"

দুই আগুন-জ্বলা চোখ আমার ওপর তুললেন, বললেন, "যদি বলি, আমি বি-এ পাশ করেছি, আপনি বিশ্বাস করবেন ?"

বি-এ পাশ! চানাচুর-ওয়ালা! অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বললেন, "এই আমার দেশের দেওয়া শিক্ষার ছাপ এবং এই তার মর্যাদা! আচ্ছা চলি, আমি ওয়েলিংটন ঘুরে যাব।"

"শুনুন ?"—বললাম, "আপনার ঘরে একদিন যাবো।"

উত্তর এলো, "ভয়ানক দুঃখিত। কাল সকালেই উঠে চলে যাচ্ছি দক্ষিণ কলকাতায় কালিঘাটে। আচ্ছা, চলি, নমস্কার। চাই স্যর, চাই চানাচুর নকুলদানা।"

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। এই তো এত-কষ্টে-অর্জিত ডিগ্রীর মূল্য! তবু কলেজে পড়ছি কিসের মোহে ?

এর দিনকতক পরে মা হঠাৎ অসুখে পড়ল। অসুখ অবশ্য মারাত্মক নয়। পায়ের গোছায় একটা ফোঁড়া হয়ে কষ্ট দিচ্ছে বিশ্রীরকম, ওটা কাটতে হবে। সুতরাং দিন চারেকের জন্য মাকে হাসপাতালে যেতে হবে। কাছেই এব হাসপাতাল আছে, সেখানেই নিয়ে যাওয়া স্থির হলো। বাবার এসময় ভিন্নরূপ। নিজে হাতে সমস্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মা হাসপাতালে, কমলকে নিয়ে বাবা রাতদিন বাসায় রইলেন স্কুল থেকে দিনকয়েকের ছুটী নিয়ে।

বাবার মনুষ্যত্ব সত্যই মরে নি। আর এইখানেই তাঁকে দুর্বোধ্য মনে হতো। কখনো আশ্চর্য রকম ভালো, কখনো শোচনীয় মন্দ। আজ যে মনটি রয়েছে, কাল সে মনটি নেই। মোটকথা, ওঁরও মধ্যে নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। আর তারই ফলে আমাদের সংসারে অত্যদ্ভুত নাটকীয়তার ছায়াপাত

দিনকয়েক এত ভালভাবে চলতে লাগলেন যে আমাদের মন পুনর্বার আশায় ভরে উঠল। এমন কি মায়ের চিরম্লান মুখেও ফুটল হাসির রেখা! কিন্তু কয়দিন?

মাকে যেদিন হাসপাতালে দেওয়া হলো, তার দুদিন পরের কথা বলছি। ইতিমধ্যে মার অপারেশন হয়ে গেছে, ভালই আছে। কলেজে তখন এক-ঘণ্টা ক্লাশ নেই। লাইব্রেরী ঘরের এককোণে বসে পাতা ওল্টাচ্ছি একখানা বইয়ের, এমন সময় হঠাৎ সাদা-পাঞ্জাবী-গায়ে একটি ছেলে ওধার থেকে উঠে আমার কাছে এলো।

"নিখিল?"

চমকে মুখ তুললাম।

"চিনতে পারো?"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, "সমর না?"

"হ্যাঁ।" পাশে বসল। সেই আমার বাল্যবন্ধু সমর, যার সঙ্গে কলকাতায় নীচু ক্লাশে একসঙ্গে পড়েছি। সোৎসাহে আলাপ চলল।

বললাম, "অতদিন একই কলেজে একই ক্লাশে পড়ছি আমরা, অথচ কারুর সঙ্গে কারুর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, এটাই আশ্চর্য! তোমার সেকশান কী?"

সমর বলল, "সি।"

"ও—তাই।"

"তা-ও নয়," সমর হাসল,—"কলেজে থাকি কতক্ষণ? অর্ধেক দিনই তো প্রক্সিতে কাটে।"

"বটে? কী করো?"

গম্ভীর হয়ে গেল সমর, বলল, "হ্যাঁ, সেকথা তোমাকে বলব।"

খুব কাছ ঘেঁসে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়েই বলতে লাগল, "আমাদের পার্টিতে যোগ দাও। এই নাও আমার ঠিকানা, একদিন সন্ধ্যায় যেও, আমি নিয়ে যাবো বৈঠকে।"

"না ভাই সমর, আমি যেতে পারব না।"

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টি আমার ওপর রেখে বলল, "তুমি চিরকালই ভীতু! আগে একদিন এসো, তারপর যোগ দেবে কী দেবে না, দেখা যাবে।"

"তোমাদের আদর্শ কী?"

"সে এক কথায় ঠিক বোঝানো যাবে না।"

"তবু ?"

সমর বলল, "রাশিয়ার ব্যাপার জানো ?"

"সামান্য।"

"লেনিনের কথা জানো ? ট্রটস্কীর কথা ? শুনেছ কার্ল মার্কসের নাম ?"

"বলে যাও।"

"ওঁদের জীবন-ভোর স্বপ্নে-দেখা সাম্যবাদ। নিখিল, একদিন দেখবে সমাজের বুকে আর শ্রেণীগত বৈষম্য নেই। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আমরা হয়ে গেছি পরস্পর পরস্পরের 'তাওয়ারিশ'—বন্ধু !"

ধনী-দরিদ্র সবাই এক ! বললাম, "এ-ও কী সম্ভব !"

"চেঁচিও না। এখানে দেওয়ালেরও কান আছে। হ্যাঁ, সম্ভব। এখন যাই, ক্লাশ আছে। তুমি একদিন যেও কিন্তু।"

সেদিন কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে এই কথাটাই ভাবছিলাম। সত্যিই কী সাম্যবাদ এদেশে সফল হতে পারবে ? সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে সন্ধ্যাবেলার ট্যুইশানীটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। গত পরীক্ষায় ফল খুব ভাল হয়নি, প্রিন্সিপাল ফোর্থ সাবজেক্ট ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং সময়ের দুর্ভিক্ষ আর ততটা নেই বলা যায়।

এখন বৈকাল। বাবা এতক্ষণে কমলকে নিয়ে হাসপাতালে গেছেন নিশ্চয়। আমিও বইপত্র রেখে কিছু খেয়ে নিয়ে যাবো।

বাড়ীতে এসে দেখি, যথারীতি ঘরে তালাবন্ধ, বাণী-পিসী গৌরী বেড়াতে এসে ফিরে যাচ্ছে। আমাকে দেখে পিসীমা বলে উঠলেন, "কী নিখিল, কী ব্যাপার ?"

বললাম। তাড়াতাড়ি গৌরী বলে উঠল, "আমি মামীমাকে দেখতে হাসপাতালে যাবো নিখিলদা, নিয়ে যাবেন ?"

"কোথায় যাবি,"—পিসী বললেন, "আমায় এখ্খুনি বাড়ী ফিরতে হবে।"

"ফেরো না, ধরে রাখছে কে ? আমি নিখিলদার সঙ্গে যাবো।"

"বাড়ীতে বকবে'খন।"

"কে, বাবা ? কখ্খনো না। বকবার মানুষ একমাত্র তুমি। জানি না কী আর ? দুচোখে আমায় দেখতে পারো না !"

"আচ্ছা এক কাজ কর তুই, ঝিকে নিয়ে যা, নিখিল বরং আমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

"রক্ষে করো,"—গৌরী বলল, "ঝির সঙ্গে অতদূর যেতে পারব না। যাই না বাপু নিখিলদার সঙ্গে? তুমি ও রকম করো কেন, বলো তো?"

"যা বাপু যা, যা হয় কর। আমি তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।"

সুতরাং আবার আমরা চলতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে গৌরী কথা বলল। গলাটা একটু যেন ধরা ধরা, একটু কাঁপা, বলল, "শেষকালে এই তোমার ধারণা হলো, আমি তোমায় ঘৃণা করি?"

"ও কথা আর তুলছ কেন?"

"তুলব না! তোমার ও কথা আমায় কাঁদিয়েছে! কিন্তু মনে রেখো, যে কাঁদায় তাকেও কাদতে হয়।"

বললাম, "সেদিনের কথা ছেড়ে দাও। আমার মনটা সেদিন ভাল ছিল না।"

গৌরী আমার চোখের দিকে তাকাল, বলল, "তোমার মনে ব্যথা আছে আমি জানি। কিন্তু কেন তুমি সেসব বলো না আমাকে? আমি যে জানতে চাই।"

"কী জানাব!"—আমি বললাম, "কী যে কষ্টে আছি বুঝতে পারো না?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গাঢ়কণ্ঠে শুধু বলল, "পারি।"

তারপরেই আমার হাতখানা আলগোছে ধরে একটু চাপ দিলো।

"আঃ ছাড়ো! রাস্তার লোকে দেখলে ভাববে কী?"

ছেড়ে দিয়ে সহাস্যে বলল, "কী ভাববে বলো ত?"

লজ্জায় মুখ নীচু করলাম,—"জানি না।"

হেসে উঠল।

হাসপাতালে বাবা কমলকে নিয়ে বসে ছিলেন মার কাছে। গৌরীকে দেখে মা যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা মনে হলো না। যাই হোক, একটুক্ষণ থেকে ওকে পৌছে দিতে গেলাম ওর বাড়ীতে। পিসীমা ভ্রূ দুটো একটু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, "কীরে, এতো দেরী করলি যে?"

"ওমা, দেরী কোথায়!"—গৌরী বলল, "মার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

চলে এলাম। বাণী পিসী একটা কথাও বললেন না আমার সঙ্গে।

কয়েকদিন পরেই মা ফিরল হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে। গৌরীর প্রসঙ্গে একদিন মা বলল, "অত বড়ো সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে বেড়িও না বাপু, ভাল দেখায় না। ওদেরও যেমন ছিরি, মেয়েকে রেখেছে ধিঙ্গি করে, বিয়ে দিচ্ছে না।"

ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার ঘটল। কলেজে যেতে পথে একটা পত্রিকার দোকান পড়ে। কত মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিকের ভীড়। একটি নাতিবৃহৎ কবিতা—'যাত্রী'—কবিঃ শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়। চমকে উঠলাম—সুকুমার! আরও একটি সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় দেখলাম ওর নাম। এটিও কবিতা, বেশ বড়ো কবিতা ঃ প্রতীক্ষমানা। কম্পিত কৌতূহলে পড়ে গেলাম, বেশ লাগল। সে রাত্রেই উচ্ছ্বসিত ভাষায় এক দীর্ঘ চিঠি লিখে ওকে অভিনন্দন জানালাম। তার উত্তর যা এলো তা আমি ঠিক আশা করি নি। অতি সাধারণ নীরস ক্ষুদ্র একটি পত্র। মুগ্ধ পাঠকের স্তুতির প্রত্যুত্তরে লেখকের ভাবগম্ভীর মন্তব্য।

ভয়ানক আঘাত পেলাম সুকুমারের কাছ থেকে। কিন্তু সংসারের পথে আঘাতেরও যে কতো প্রয়োজন তা কি তখন উপলব্ধি করেছি? অলক্ষ্যে উপকারই করল সুকুমার। মনে হলো, এ আমি কী করেছি? আত্মহত্যার পটভূমিকা প্রস্তুত করছি নিজের হাতেই? কলেজের উঁচু ছাতের ওপর আলসের কাছে দাঁড়িয়ে নগরীর সুদীর্ঘ সরীসৃপের মত বিচিত্র রাজপথের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হলো, লিখব, আবার সুরু করব লেখা! অন্তরে একটা অদ্ভুত আবেগ অনুভব করলাম।

সেই ধূলিমলিন বাঁধানো খাতাটি! বাক্স থেকে বের করতে করতে মনে পড়ল মাধুরীদিকে। সেই গাঁয়ের ছোট নদীটির ওপর দিয়ে নৌকায় মাধুরীদিকে নিয়ে আসা, আজ স্বপ্নের মত মনে হয়। বহুদিন পূর্বে এক পত্র পেয়েছিলাম, বাপের বাড়ীতে এসে মাধুরীদির একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হয়েছে। তারা ভালই আছে।

কবিতা লিখব। কিন্তু এই আঘাত-জর্জর নিপীড়িত মন থেকে কী বেরুবে অমৃত না হলাহল?…

কিছুদিন পরেই কমলের উপনয়ন। সুশীল-মামা নিজে আসতে পারলেন না, কিন্তু একটি সুদৃশ্য সোনার আংটি নব-ব্রহ্মচারীর জন্য উপহার এলো।

আয়োজন অতি দীন, তবু আমাদের সংসারে তা-ই বিরাট উৎসব। বাড়ীওয়ালার বৈঠকখানাটা ওঁরা ছেড়ে দিলেন, সেখানে আসর জমালেন বাবা প্রফুল্লবাবু প্রভৃতি। যে নিঃসন্তান বউটি কমলকে ভালোবাসত সে তার একটা ঘর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে, সেখানেই বসলেন পুরোহিত, পরে সেখানেই হবে ব্রহ্মচারীর ত্রি-রাত্রির দণ্ডী-গৃহ। বাণী-পিসীমা, গৌরী সকাল থেকেই এসেছেন, এটা-ওটা কাজকর্ম চলেছে। পিসীমা ভিতরে আছেন বলে বাবা বাইরে

বৈঠকখানা থেকে বেরুচ্ছেন খুব কম, তা-ও খুব দরকার পড়লে তবে। পিসীমাও বাবাকে হঠাৎ দেখলে ঘোমটাটা আরও একটু টেনে দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করেন। বিশেষ কিছুই না, তবুও আমার লক্ষ্যে পড়ল।

প্রফুল্লবাবু মধ্যাহ্ন-ভোজন করেই ছোট ছেলেদের নিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু পিসীমা ও গৌরী সেদিন খানিকটা রাত পর্যন্ত ছিলেন।

কর্মব্যস্ত বাড়ী। আমি গৌরী দুজনেই এটা-ওটা কাজ করছি। কিন্তু এরই ফাঁকে হঠাৎ কখন ফাঁকা ঘরে দুজনে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য দেখা হয়ে গেল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে, ভীড়টা বেশী ব্রহ্মচারীর ঘরের দাওয়াতেই—কী একটা কাজে আমার ঘরে এলাম। দেখি কেমন করে ফাঁক খুঁজে আমারই বিছানায় শুয়ে গৌরী আমারই লেখা খাতাটা পড়ছে তন্ময় হয়ে। আমি যেতেই উঠে বসল, বলল, "তোমাকে খুন করা উচিত।"

একটু হাসলাম, বললাম, "অপরাধ!"

"এমন চমৎকার কবিতা লেখো আর আমাকে এতদিন জানাওনি, পড়াওনি? নিষ্ঠুর কোথাকার!"

"আশ্চর্য, আমার কবিতা তোমার ভাল লাগল!"

চমৎকার স্নিগ্ধ হাসিতে গৌরীর মুখখানি ভরে গেল, বলল, "সুন্দর, সত্যিই সুন্দর!"

বলে কি গৌরী! অথচ দু-তিনটি কবিতা ইতিপূর্বে পাঠিয়েছিলাম কোন কোন মাসিক-সাপ্তাহিকে। তারা প্রকাশযোগ্য হয়নি বলে মন্তব্য করে ফেরৎ পাঠিয়েছে। আমি নিরুৎসাহ হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু গৌরীর উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো—আমি সার্থক!...

"গৌরী, কোথা গেলি?"

"যাই গো যাই। বাবা-বাবা, একটু কি দাঁড়াবার যো আছে, অমনি ডাক। মার জ্বালায় আমি আর বাঁচব না।" বলে চলে গেল। আমি শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সত্যই কি একদিন সুকুমারের মত বলতে পারব, 'আমি কবি নিখিলেশ!' গৌরী আবার এলো।

"শুয়ে পড়লে যে?"

"এমনি। ক্লান্ত লাগছে।"

খাটের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। একটুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, "চুলগুলোর ও অবস্থা কেন? স্নানের পর ভাল করে আঁচড়াও নি বঝি?"

"ভুল হয়ে গেছে গৌরী! দাও ত চিরুনিটা, ঐ যে আয়নাটার কাছে রয়েছে।"

চট্ করে সরে গিয়ে চিরুনিটা নিয়ে এলো। কাছে এসে বলল, "আমি আঁচড়ে দেবো।"

"না, কেউ দেখে ফেলবে।"

"দেখবে না, সবাই ওদিকে ব্যস্ত। দেখি, মাথাটা একটু ওঠাও তো?

আশ্চর্য! সরে যাবারও সুযোগ পেলাম না। মুহূর্তের মধ্যেই অনুভব করলাম আমার মাথাটি গৌরীর কোলে। ধীরে ধীরে সযত্নে আমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সমস্ত দেহের মধ্যে খেলে গেল তড়িৎপ্রবাহ। চকিতে উঠে পড়লাম,—"ছি-ছি, করছ কী। যদি এসে পড়ে কেউ?..."

মুখ টিপে একটু হাসল তারপর চিরুনিটি রেখে দিয়ে সরে গেল।

এই কোলাহলমুখর জনাকীর্ণ সংসারেও এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে মনে হয় সম্পূর্ণ নির্জন, সবার চোখের আড়ালে একাকিত্বের অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করে আছি! সে সন্ধ্যায় সেই উৎসবের বাড়ীতে এমনি একটি অবকাশ এলো। সমস্ত ভীড় কমলের ঘরের সামনে। বাকি পিসীরা একটু পরেই চলে যাবেন, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসব।—বিদায় মুহূর্তের ঠিক আগের কথা বলছি।

জানালার বাইরে সন্ধ্যা গভীর হয়ে রাত্রি নেমে এলো। কালো রাত অন্ধকার আকাশের পর্দায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের ভীড়। তারই নীচে অভিসারিকা মহানগরীর প্রতীক্ষা-মলিন কৃত্রিম আলোর রেখা। একা দাঁড়িয়ে আছি জানালার ধারে। আঃ! এমন অদ্ভুত রাত কেন আসে না জীবনে বারংবার এ রাত কবিতার রাত! কবিতা লিখব আজ। মনে মনে গুঞ্জরণ তুললাম "ছিন্ন বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিতে গিয়া মনে বুঝি পড়িয়াছে কবি তোমার।" বাঃ! বেশ পাওয়া গেল লাইনটি। কিন্তু তারপর? "ঝঙ্কার ঝাঁঝর তুলি, হে প্রচণ্ড স্বপ্নময়ী কাছে কেন এলে?" অভিভূত হয়ে পড়লাম ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলাম, কিন্তু কে সে স্বপ্নময়ী? আমাকে অভাব-ক্ষিন্ন সংসারের বুক থেকে বারবার অকস্মাৎ হাত ধরে নিয়ে যায় বহুদূরে যেখানে দেশ নেই, কাল নেই, কিছু নেই—মহাশূন্য? কিন্তু তাকে কী দেখেছি কোনদিন? মাটির ধুলোয় পড়েছে কি তার চরণের স্পর্শ?

গৌরী! দেখছি তাকে, সেই প্রচণ্ড স্বপ্নময়ীকে! গৌরী হয়ে পথ চলা

চলতে ধরেছে সে আমার হাত। ঐ তো অতি কাছেয়—গৌরী! ও মাঝে মাঝে কী অদ্ভুত রহস্যময়ী হয়ে ওঠে! মনে হয় কাছে নেই, কাছের মানুষ মোটেই নয়, বহুদূরে স্পর্শহীনতার মহিমায় মহিমময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! "আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে!" ধীরে ধীরে গুণগুণ করে উঠলাম, "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে!" মৃদু-চাপা কণ্ঠে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছি সংগীতের সুধা. "বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী!"

হঠাৎ পিছন থেকে খিলখিল হাসি। ভয়ানক চমকে মুখ ফেরালাম।

"শুনে ফেলেছি তোমার গান!"

কী হলো, কী এলো আমার মধ্যে কে জানে! চকিতে দেখলাম, আমি ওকে আমার নিবিড় বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলেছি। আর—ও? ডান হাতখানি আরও নিবিড় করে জড়িয়ে দিয়েছে আমার কাঁধে, অসীম আগ্রহে মুখখানি উঁচু করে তুলে দিয়েছে আমার দিকে! কিন্তু কিছু ঘটবার পূর্বেই ফিরে এলো আমার চেতনা, মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে ছাডিয়ে নিয়ে চলে এলাম জানালার কাছে। ও-ও চলে গেল, নিশ্চুপে!

আমার সর্বাঙ্গে তখন বৃশ্চিকের দংশন। ছিঃ-ছিঃ! এ কী করলাম! আমার সমস্ত অন্তর তখন একটি কথাই উচ্চারণ করতে লাগল, তুমি অন্যায় করেছ, অন্যায় করেছ তুমি!

॥ পাঁচ ॥

এরই নাম প্রেম? এই যে দুজনে অকস্মাৎ ক্ষণিক নিবিড়তায় মধুর হয়ে থাসা? একদিন চুপচাপ ভাবছিলাম বসে বসে। মনটা ফিরে গিয়েছিল অতীতে। বাবা আর বাণী-পিসী। ওঁরাও তো ভালবেসেছিলেন। কিন্তু কোথায় গেল ভালবাসা, কী হলো তার পরিণাম?

একটা প্রভাত-বেলার চিত্র মনে পড়ে। আমার ঘরটিতে বসে সেদিনকার কলেজের পাঠ 'কুমার-সম্ভব' পড়ছিলাম। পাশের ঘরে মা ও বাবা। হঠাৎ কানে গেল একটা কলরব। ক্রমশঃ সেটা এত বাড়ল, এত নিদারুণ তীক্ষ্ণতায় পৌঁছে গেল যে আমাকে বই বন্ধ করে উঠে যেতে হয়েছিল। বাবার কাছ

থেকে পাওয়া টাকার বাঁ একটা গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করেই দাম্পত্য-কলহ, সেই কোলাহল ক্রমশঃ গালাগালি এবং ছোটখাট হাতাহাতিতে হলো পর্যবসিত ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙে পড়তে লাগল, নিমেষে তচনচ হয়ে উঠল গৃহস্থালী! আর সেই ভেঙে-পড়ার আঘাত তীব্র হয়েই আমাকে বেজেছিল। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আমার বাবা, মা-ও অভিজাত উচ্চবংশের সন্তান, কিন্তু ওঁদের মধ্যে এ আমি কী দেখছি, কেন দেখছি! ওঁদের বিবেক, বুদ্ধি, রুচি, শিক্ষা, মর্যাদাবোধ কোন দুর্নিবার প্রবাহের বেগে তৃণের মত ভেসে গেল!

প্রেম? মনে-মনেই হেসে উঠলাম। না, গৌরীকে আমি ভালবাসি না— বাসতে পারি না। এ ক্ষণিকের মোহ, একে জয় করতেই হবে। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল ওর সঙ্গে আর দেখা করলাম না।

কিন্তু পারি না। সমস্ত দিনের ব্যস্ততার মধ্যে মধ্যে ঘুরে-ফিরে ওকেই মনে পড়ে। গৌরী নয়, ও যেন প্রজ্বলিত লেলিহান হোমশিখা, আমার পতঙ্গ-মন দুর্নিবার আকর্ষণে তারই দিকে ছুটে যেতে চায়! আচ্ছা, ধরা যাক, গৌরীকে আমি ভালবাসলাম। কিন্তু তারপর? বিয়ে? কথাটা মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মা-বাবার ব্যর্থ বিষাক্ত দাম্পত্য-জীবনের খণ্ড খণ্ড বিচিত্র চিত্রগুলি! হেসে উঠলাম, আমার জীবনে বিয়ের মত নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু আছে কী? না-না, আমি ভালবাসিনি, ভালবাসতে পারি না।··· আরও দীর্ঘদিন গেলাম না ওদের বাড়ী। একদিন কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরী হয়েছে, বাড়ীর ভিতরে ঢুকছি, বেরিয়ে এলেন বাণী-পিসী, সঙ্গে গৌরী। ওরা বেড়াতে এসেছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন। অপ্রত্যাশিত আকস্মিক সাক্ষাৎ। পিসীমার সঙ্গেই দুটো-একটা কথা হলো, উনি বললেন, গৌরীর বিয়ের চেষ্টা চলছে, সেদিন একজন দেখেও গেছেন, মেয়ে অপছন্দ হয়নি, এখন দেনা-পাওনার সুষ্ঠু মীমাংসা হলেই হয়। বলা বাহুল্য, গৌরীর সঙ্গে একটি কথাও হলো না, শুধু একবার চকিতের জন্য ওর অভিমান-গভীর দুটি চোখ আমার চোখে স্থাপিত হয়েছিল।

কবিতা লিখি। পত্রিকা থেকে ফেরৎ আসে। তখন মনে হয়, গৌরীকে শুনিয়ে আসি, ওর ভাল লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে বসে কে যেন আমাকেই চোখ রাঙিয়ে ওঠে, বলে—সাবধান!···

জোর করে ওর দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে নিই। কলেজ। বেড়ে পড়ার চাপ। যে-ঘণ্টায় ক্লাশ নেই, কমনরুমের এককোণে বেঞ্চে বসে স্নিগ্ধাং

ইগুলো নিয়ে একটু পড়বার চেষ্টা করি। কলেজের এই একটি বিচিত্র স্থান মনরুম। দেশের আশা ও ভরসাস্থল ছাত্র সম্প্রদায়ের চেহারা এখানে বসেই পষ্ট দেখা যায়। এখানে ওখানে ছাত্রদের ছোট ছোট দল মিলে বিরাট জটলা। দিকে—রূপবতী ফিল্ম-তারকা। এদিকে দুর্ধর্ষ মোহনবাগান।

কোথাও জিন্না-গান্ধী-সুভাষ। কোথাও অশ্লীল মন্তব্য ও ভঙ্গিমায় নারী-দহের রূপলাবণ্য, অথবা কলেজেরই মহিলা বিভাগের কোন দৃষ্টি-আকর্ষিতা ছাত্রী। আলোচনাটা মুখ্য নয়! কিন্তু আমার দৃষ্টি পড়েছে এদের সামাজিক চতনা ও মনোবৃত্তির ওপর। একদল ছাত্র আছে, যারা তথাকথিত ধনীপুত্র। এরা এক-একটি কাপ্তেন বিশেষ। এদের কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর ছাত্রদল আছে যারা স্তাবক, যারা তাদের স্কন্ধ-ভঙ্গ করে নিজের নিজের স্বার্থের চোরা পথ করছে তরী। আরেকটি দল রইল যারা গরীব, উপেক্ষিত-অবহেলিত-অনাদৃত! কিন্তু এদেরই মধ্যে আছে কতকগুলি মুষ্টিমেয় ছাত্র, যারা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে—যারা প্রকৃতই তপস্বী।

এই চিত্রটিকেই সমাজের মধ্যে স্থাপিত করে দেখা যাক। একই ঘটনা। সমাজে যা ঘটছে তারই ছায়াপাত দেশের আশা ও ভরসা ঐ বিপুল ছাত্র-সম্প্রদায়ের ওপর। এবং এরই মধ্য দিয়ে সমরদের দল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে! শ্রেণী-বৈষম্য ঘুচে গেছে, ধনী-দরিদ্র সবাই হয়ে গেছে এক। বিশ্বজুড়ে বিরাট সাম্য। সত্যিই কী সফল হবে ওদের স্বপ্ন?···

আঘাত তখনই লাগত ভয়ানক, যখন দেখতাম, আমাদের শিক্ষা-দাতা অধ্যাপকদের অনেকের মধ্যেও এ বৈষম্য-জ্ঞান অল্প বিস্তর রয়েছে। ধনী ও দরিদ্র ছাত্র, এ দুয়ের মধ্যে তাঁরা বেশ পৃথক করেই দৃষ্টিপাত করতেন!

আমি গরীব! কিন্তু গরীব করলে কে আমায়? মানুষের কল্যাণ কামনাতেই তো সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু কোথায় এলো কল্যাণ? স্বার্থপর দালের দল অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোরাপথে এলো চুপি চুপি, নিয়ে গেল রি করে আমাদের সৌভাগ্যের ধন। সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে একদলকে সম্পূর্ণ ঞ্চিত করে আরেকদল এমনি করেই গড়ে তুলল সম্পদের স্বর্ণসৌধ! আমরা তারই তলায় রইলাম পড়ে পথের ধুলায়। কিন্তু সেটা কী আমাদের অপরাধ?

টেস্ট হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, উত্তীর্ণ হলাম। এবার ফিস্‌-দাখিল। মা লল, "উপায় কী, ঐ সুশীলের হাতে-পায়েই কোনরকমে গিয়ে ধর। সে-ই আমাদের একমাত্র বন্ধু এ দুঃসময়ে!"

তা-ই স্থির করলাম। কিন্তু ভাগ্য যে তখনও নিদারুণ পরিহাস করবে কে জানত!

সুশীলমামার সঙ্গে দেখা করবার আগে একদিন তিনিই এসে উপস্থিত।

"দিদি, জামাইবাবু কোথায়?"

"বাড়ী নেই। কেন সুশীল?"

"সর্বনাশ হয়ে গেল! এইমাত্র ওঁদের স্কুলের সেক্রেটারী ফোন করলেন. জামাইবাবু স্কুলের ক্যাশ ভেঙেছেন!"

"স্কুলের ক্যাশ।"

"হ্যাঁ। ক্যাশিয়ার ছুটী নিয়েছেন বলে ওঁরই হাতে বর্তমানে ক্যাশ দেওয়া হয়েছিল।"

মাথায় হাত দিয়ে মা বসে পড়ল।

সুশীলমামা বললেন, "দেখুন দেখি, কী লজ্জার কথা!"

মা বলল, "কী হবে উপায়? কত টাকা সুশীল?"

"টাকা বেশী না, মাত্র একশোটি টাকা! কিন্তু লজ্জায় মুখ দেখাব কী করে ভদ্রলোকের কাছে। আমিই তো ওঁকে চাকরীটা করে দিয়েছিলাম!"

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে মার চোখ ছলছলিয়ে উঠল, "দেখো সুশীল, তোমরাই দেখো, কী মানুষ নিয়ে আমি সংসার করছি!"

"কিন্তু কী করলেন, অতো টাকা নিয়ে?"

"সংসারের জন্যে একটি পয়সাও না।"

"তবে?"

মা বাঁকা হাসলেন,—"ধার। অস্থির প্রকৃতির অগোছাল মানুষ তো, এদিক-ওদিক খুচরো-খুচরো কত যে ধার আছে, তার ইয়ত্তা নেই! সুশীল, লক্ষ্মীটি ভাই, আমার একটা কথা রাখো।"

"কী দিদি?"

"আমার একগাছি রুলি রয়েছে, বের করে দিচ্ছি, ওটা নাও, ওটা বিক্রী করে—"

"দিদি!"—বিবর্ণ মুখখানি ফিরিয়ে সুশীলমামা বলে উঠলেন,—"এ কথাও শুনতে হলো!"

আর বলতে পারলেন না, আবেগে রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন। খানিকটা সামলে তারপরে বললেন, "একশোটা টাকা, ও আমি অবশ্য এখনই গিয়ে দিয়ে

দিচ্ছি। কিন্তু, কী কেলেঙ্কারীটা হলো, বলুন দেখি? ওঁর চাকরীটা তো গেলই, উপরন্তু আমার মুখও রইল না!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল, "সবই আমার কপাল!"

সুশীলমামা চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকবার পর মা বলল, "খোকন?"

"কী মা?"

"কোথায় গেছে একবার খুঁজে আনতে পারিস? দুদিন ধরে বাড়ীতেও আসে না। এইজন্যই আসে না বোধ হয়।"

খুঁজতে বেরুলাম। বড রাস্তার ধারে কতকগুলি চায়ের দোকান বাঁধা ছিল, প্রায়ই দেখতাম পাশে চায়ের খালি কাপটা, বাবা খবরের কাগজের ওপর উবু হয়ে পড়ছেন। কিন্তু আজ আর কোথাও সন্ধান মিলল না। একটি দোকানদার বলল, সকালে নাকি একবার এসেছিলেন, তারপরে কোথায় গেছেন কেউ জানে না। বিরস মুখে আমাকে ফিরে আসতে দেখেই মা বলল, "পেলি না তো? কোথাও ডুব মেরেছে। কিন্তু যাবে কোথায়? দিনকতক যাক, শেষে পেটের টানে আসতেই হবে। খাবে কী? চাকরীটিও তো খুইয়ে বসল। হতভাগা, হতভাগা! ভালমানুষ হলে তার কি কোন কষ্ট হয়। যাকগে মরুক গে, আমার হাড় জুড়োয়।"

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মা বলল, "খোকন তুই কি পারবি?"

"কী মা?"

"রুলিটা বিক্রী করে দিয়ে আয়।"

"কেন?"

"তোর ফিসের টাকা।"

ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলাম, "না মা, না। আমি সুশীলমামাকেই ধরব গিয়ে।"

"পাগল!"—মা বলল, "এইমাত্র অতগুলো টাকা আমাদের জন্যই ওর বেরিয়ে গেল, আর কী চাইবার আমার মুখ আছে! তা হয় না, তুই যা, যা বলছি তাই কর, ভাল করে দেখে নিস ওজনটা।"

রুলিটা মার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললাম, "আমি পারব না মা। তার চেয়ে ফিস দিয়ে দরকার নেই। আমি আর পরীক্ষা দেব না।"

"দেখ খোকন!" মার ভঙ্গী কঠোর হয়ে উঠল,—"এত কষ্ট করে এই এতগুলো দিন চালিয়ে এলাম, এ কি তোর পরীক্ষা না দেবার জন্য?"

"তা বলে তোমার গয়না বেচে—"

"ওঃ! কী দরদ! এতদিন ধরে যে সর্বস্বান্ত হয়ে সংসার চালিয়ে এলাম তখন তোমার এত দরদ,কোথায় ছিল শুনি? বলছি এখনো?"

অতএব মার রুলিটিও গেল।···

বাবা বাড়ী এলেন রুক্ষ একমাথা চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ী, চোখ দুটি কোটরে বসা, পরনের জামা কাপড় মলিন ও ছিন্ন। চাকরী তো গেছেই লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা প্রীতি সমস্তই হারালেন নিজেরই দোষে। নিজেরই পায়ের ওপর কুঠারাঘাত করে এখন যন্ত্রনায় হা-হুতাশ করলে হবে কী!

পরীক্ষার দিনকয়েক পূর্বেই মা জ্বরে পড়ল। অন্যান্য বার অসুখ-বিসুখ হলে বাবাই সমস্ত করেন, এবার তাঁর দেখাই মিলল না। ঐটুকু ছেলে কমল সে রান্নাঘরের ব্যবস্থায় লাগল। এমনি নিদারুণ অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমার পরীক্ষাদান চলল। লিখতে লিখতে মার যন্ত্রনা-কাতর মুখখানা মনে পড়ে, আর চাঞ্চল্য বাড়ে। পরীক্ষা দিয়ে রোজ বাড়ী ফিরি, মার শিয়রটিতে এসে বসি, বলি, "মা, কেমন আছ?"

"একটু ভাল। আজ কেমন দিলি?"

"মন্দ না!"

মা বলল, "হ্যাঁরে, পাশ করবি তো?"

"আশা করি।"

পাশ সত্যিই করলাম। কিন্তু পাশের খবর বেরুবার আগে পর্যন্ত একটা ঘটনার ইতিবৃত্ত আছে। সংসার কী ভাবে চলেছিল, বাবা ও মার মধ্যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা চলল কী মর্মান্তিক, তার সকরুণ বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। পরিবারের একমাত্র বন্ধু সুশীলমামা, তিনিও এখানে নেই, তিনি বম্বেতে, সেখানে তাঁদের নূতন অফিস খুলেছে।

একদিন সে এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। বাণী-পিসীরা এসেছিলেন বেড়াতে বৃষ্টি নামাতে তখনো ফিরে যেতে পারেন নি, মার ঘরে বসে গল্প চলেছে পাশের ঘরের দুতিনটি বৌ-ঝিরাও রয়েছে। আমার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল গৌরী। ঈষৎ কৃশ, ঈষৎ পাণ্ডুর হয়েছে ওর চেহারা। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখখানা আমার দিকে ফেরাল। দুটি অভিমানী ব্যথিত আঁখিতারায় তীব্র অভিযোগ, ঠোঁট দুটি থর্ থর্ করে কাঁপছে, দুটি চোখের কোল বেয়ে গালের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে অশ্রুর ধারা!··

বাইরে ঝিম্‌ঝিম্‌ বর্ষা, নিষ্ঠুর বাস্তব বর্ষণের সুরছন্দে অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে দূরে ূরে মিলিয়ে গেল, আমি ওকে ধীরে ধীরে আমার বুকের কাছে টেনে নিলাম। মামার বুকে মাথা রেখে গৌরী কাঁদল, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।

অপূর্ব অনুভূতি!…যেখানে অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহের বিষে শতাব্দীর আকাশ কালো হয়ে ছেয়ে গেছে, সেখানেই বুক ভবে অমৃত নিয়ে এলো এক নারী! অমৃত? হ্যাঁ, তখন তা-ই মনে হয়েছিল। ওর খোঁপা-ভেঙ্গে এলিয়ে পড়া চুলের রাশির ওপর ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, "লক্ষ্মিটি, এবার ছাড়ো, এখ্‌খুনি মা-পিসীমা কেউ এসে পড়বে।"

"আসুক গে,"—গৌরী বলল, "এই তো শেষ, আর তো নয়। আর ওঁরা সবই জানেন, মা-ও জানেন।"

"কী জানে, গৌরী?"

"তোমার আমার কথা। আমি যে কাঁদতুম। কাঁদব না? কতদিন তামাকে দেখি নি বল তো! কিন্তু মা আমার এ কী করল?"

"কী? এ কী, তুমি আবাব কাঁদছ?"

মুখ তুলে সামলে নিয়ে বলল, "জানো? বাবার মত শেষ পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু মা-ই বেঁকে বসল, কিছুতেই মত দিল না।"

"কীসের মত গৌরী?"

"বিয়ের। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল।"

বিয়ে! চমকে উঠলাম মনে-মনে। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বাস্তবের ভূমিতে আবার অবতীর্ণ হয়ে এলাম।

বিয়ে? দাম্পত্য জীবন! কী বীভৎস!…আস্তে আস্তে ওর স্পর্শ মুক্ত হয়ে রে দাঁড়ালাম!…

"কিন্তু তোমার? তোমার কী হবে?"—কান্নাভরা কণ্ঠে গৌরী লে উঠল।

আমার?…কথাটা মনে হতেই গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্ত অন্তরটা অপূর্ব কারুণ্যে ভরে গেল। ঐ ছোট্ট বুকটিতে কী নিদারুণ ঝড়ই চলেছে! কিন্তু তার কথা না ভেবে ভাবছে ও আমার কথা। আমার কী হবে? এই কী? এই কী সত্যিকারের প্রেমের চেহারা? কাছে এসে আবার হাতটি ধরল, বলল, "কেন মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিলাম বলতে পারো? ুষ হলে তোমারই মতন…!" কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল।

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, "আমারই মতন…কী গৌরী?"

আমার বাহুর ওপর মাথাটা রাখল, বলল, "জানি গো জানি, তোমার মধ্যে কী হচ্ছে আমি কী জানি না! কিন্তু তুমি পুরুষ, কেমন সমস্তই চেপে রেখে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছ!"

এইটুকুই তো সব। কালের স্রোতে একদা সবই যায় ভেসে, শ্যামল তটরেখায় পলিমাটির আস্তরণ এসে বিছিয়ে যায়, এইটুকুই স্মৃতির পৃষ্ঠায় জেগে থাকে!

"কী হবে, আমার যে ভয় করছে।"

বললাম, "ভয় কী, ভাগ্যকে মেনে নাও।…"

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ রইল গৌরী, তারপরে বলল, "জানো? মা কেন এতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আমাদের দুজনের ওপর?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম। বলল, "আমি জানি। মা আর নতুন-মামা, জানো তুমি?"

"কী?"

"ওঁদের দুজনের কথা? ওঁরা ভালবাসতেন। কিন্তু…"

"বলো?"

"কিন্তু ওঁদের ব্যর্থতা কেন আমাদের পায়ে পায়ে বিঁধবে বলো তো? কী অপরাধ আমাদের?"

বললাম, "অপরাধ? এ অভিশপ্ত সংশয়ের যুগে এসে জন্মেছি, এই অপরাধ। ওঁদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওঁদের অন্তরের সমস্ত কোমলতাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে! আমাদের ওঁরা অনুভব করবেন কেমন করে?"

গৌরী বলল, "মা কী বলে জানো?"

"কী?"

"বলে, বাস্তবে ভালবাসা আদর্শ ওগুলো সব বাজে, সব অর্থহীন!"

"অথচ…।"

চোখের দিকে তাকাল গৌরী, "বলো?"

"অথচ তোমারও তো মনে আছে গৌরী, সেই দিন, বাবা ফিরলেন জেল থেকে, পিসীমা কেঁদে পড়েছিলেন ওঁর পায়ে।"

"জানি-জানি।"

"কিন্তু চেয়ে দেখ, আমার বাবা—তোমার মা কেমন হয়ে গেলেন। কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকান না, পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন, লক্ষ্য করেছ ?"

গৌরী হাত ছুটি রাখল একবার আমার বুকে, বলল, "করেছি।"

"এর জন্য দায়ী এই যুগ। গৌরী, যদি একদিন আমরাও ঐ রকম—"

মুহূর্তে যেন আর্তনাদ করে উঠল, "বলো না গো, বলো না।"

আমি সত্যই স্তব্ধ হলাম, বলতে পারলাম না।

"ওরে গৌরী ?"—দ্বারপ্রান্ত থেকে পিসীমার সাড়া এলো,—"অন্ধকার ঘরটায় বসে করছিস কী ? বৃষ্টি থামল, চল, এবার বাড়ী চল। ও-কে ? নিখিল নাকি ? তুমি কখন এলে ? তুমি তো বাড়িতে ছিলে না !"

মা ও পিসীমা ছুজনেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

বললাম, "একটু আগেই আমি এসেছি, আপনারা টের পান নি ; গৌরীর সঙ্গে কথা বলছিলাম।"

পিসীমা গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিছু বললেন না, শুধু ছুটি চোখ ভর্ৎসনায় গম্ভীর হয়ে উঠল। মার দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁরও তা-ই।

"আয় গৌরী, বাড়ী চল।"

গৌরী আমার দিকে ফিরে বলল, "চলো নিখিলদা, পৌছে দেবে।"

"না—না"—পিসীমা বলে উঠলেন , "তার দরকার হবে না।"

গৌরীর বিয়েতে যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে হল। কাজ করতে হবে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ-ই দেখা হয়ে যায় গৌরীর সঙ্গে। লালপাড কোরা একখানা সাঁড়ী ওর গৌরী-দেহটিকে ঘিরে ভারী চমৎকার একটি শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে! কিন্তু কী করুণ, বিষাদময় ওর মুখখানি! যা করবার করে যাচ্ছে, কিন্তু ভঙ্গীতে প্রাণ নেই। ওর নিস্প্রভ মলিন মুখ-খানির দিকে চাইতে চাইতে আমার সমস্ত অন্তরটা হু-হু করে উঠছে। বোথায় গেল ওর সেই হাসি-হাসি মুখখানি।

ছুপুরবেলায় ভাঁড়ার ঘরে হঠাৎ-ই ওর সঙ্গে একবার মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে গেল—"শোন ?"

কাছে গেলাম। আস্তে আমার হাতখানি ধরল, চাইল একবার আমায় চোখের দিকে, তারপর, নামিয়ে নিল চোখদুটি। বললাম, "আজকের দিনেও কাঁদবে ?"

নিজেকে সামলাতে সামলাতে উত্তর দিল, "কাঁদতেই তো এসেছি।"

না, কিছুই ভাল লাগছে না। আমার মধ্যেও কী একটা অব্যক্ত আবেগ গুমরে মরছে। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি আমাকে মুহ্যমান করে অলক্ষ্যে কী যেন যাচ্ছে ঘটাতে!...

গৌরী বলল, "কবিতা লিখে দিও। সে-ই হবে আমার শ্রেষ্ঠ উপহার!"

"দেবো!"

গৌরী হঠাৎ আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।...

বিয়ে হয়ে গেল গৌরীর, চোখের সামনে দিয়েই সীমন্তে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, বরের চাদরের সঙ্গে শাড়ীর প্রান্ত-বাঁধা নূতন বধূ গৌরী আত্মীয়-পরিজন বন্ধু ও সঙ্গীদল ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

হঠাৎ মনে হলো, এ বিপুল উৎসবের মধ্যে কী নিদারুণ হাস্যকরই না আমি! মনে হলো, ঐ সুবেশ ও সুবেশা নিমন্ত্রিতের দল, ঐ উজ্জ্বল আলোক-মালা, সবাই আমাকে দেখে অদ্ভুত কৌতুকে হেসে উঠছে। সমস্ত বিশ-প্রকৃতির কাছে কী হাস্যকর জীবই না আমি আজ!...

॥ ছয় ॥

আই-এ পরীক্ষার পর থেকে চারটে ট্যুইশানী করছিলাম। সংসারের অভাব বুভুক্ষুর মত, তৃষ্ণার্তের মত হাঁ করে আছে। তবুও লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু কিছু জমাচ্ছিলাম। মোহগ্রস্তের মতই সেই জমানো টাকা দিয়ে চুপিচুপি কলেজে বি-এ ক্লাশে এলাম ভর্তি হয়ে। এমন কি, প্রিন্সিপাল মশায়ের অনুগ্রহে অচিরে ফ্রী-শিপও লাভ করলাম।

বাড়ীতে কেউ জানল না। যেন কোন ভীষণ অন্যায় করে চলেছি, এই-ভাবে অপরাধীর মত আত্মগোপন করে রইলাম। বাবা মা জানল, আমি ট্যুইশানী করি আর সারাটা দিন চাকরীর চেষ্টাতেই ঘুরে বেড়াই। সুশীল-মামাকে পত্র লেখা হয়েছিল, তিনি আমার পড়া-বন্ধ হবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখলেন, এবং এ-ও জানালেন, আমার চাকরীর সন্ধানে তিনি রইলেন, পেলেই জানাবেন।

কিন্তু চাকরী আমার দরকার। চাকরী অর্থাৎ অর্থোপার্জন। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ তারই শোচনীয় অভাব তিল তিল করে অনুভব

করতে লাগল। আর এমন অবস্থায় আমার ঐ লুকিয়ে লুকিয়ে কলেজে পড়া অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকল একদিন। ঠিক করলাম, চাকরী খুঁজে নিতেই হবে। যতদিন তা না হয় ততদিন অগত্যা পড়াটা না হয় চলুক।

বাবা-মার অবস্থা অবর্ণনীয়। কেউ কাউকে সইতে পারেন না। মাঝে মাঝে কলহের আকার তুমুল হয়ে ওঠে, এবং তারই পরে বাবার দিন কয়েকের জন্য আকস্মিক অন্তর্ধান।

বাবার জীবন ব্যর্থ এবং জ্বালাময়। বাইরে-ঘরে কোথাও শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই। এতটুকু শান্তি, এতটুকু আনন্দেব আশাতেই হয়ত দীর্ঘ অনুপস্থিতিব পর ঘবে ফিরে আসতেন, কিন্তু হায় রে, কোথায় আশ্রয়ের শীতলতা? তাঁব জন্য সান্ত্বনার পরিবর্তে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান উন্মুখ হয়ে থাকত। হয়ত কিছুদিন বাইরে কাটিযে এলেন, পরনে সেই ছিন্ন মলিন পোষাক, একমাথা রুক্ষ চুল, করুণ বিবস চেহারা, হয়ত ভালভাবে কয়দিন খাওয়াই হয়নি।

আসা মাত্রই মায়ের কাংস্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠত, "কী, আবার ঘরেতে আসা হলো যে? জুটল না স্থান অন্য কোথাও?"

অবসাদগ্রস্ত শ্রান্ত ক্লান্ত বিপর্যস্ত দুঃখীটিব মতই বাবা ধপ করে বসে পড়তেন, কথা বলতেন না অথবা বলবার মত সামর্থ্যও ছিল না।

"কী কথা নেই যে? বেরোও…বেরোও বাড়ী থেকে।"

অর্থহীন নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে ফ্যালফ্যাল করে মার দিকে তাকিয়ে থাকতেন বাবা, যেন চোখের সমুখ থেকে শুধু মা বা আমরা নয়, সমস্ত বিশ্বসংসার, অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে দূরে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু বাবার এই নীরবতার অর্থ মা বুঝত না, একে উপেক্ষা অবহেলা মনে করে নিদারুণ জ্বলে উঠত…

বাবা কী পাথর? নিশ্চুপ নিস্পন্দ হয়েই সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করে যেতেন। কোনদিন চুপ করে না থাকতে পেরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন, স্খলিত পায়ে বাইরের দিকে পা বাড়াতেন। তাঁর সেই স্তম্ভিত নিষ্করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে কষ্ট হতো ভয়ানক। আমি কমল দুজনে গিয়ে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াতাম, "কোথায় যাচ্ছেন বাবা!…"

নিস্তেজ দুর্বল হাত দিয়ে বাবা সামনে থেকে আমাদের দুভাইকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন।

"না—না, যাবেন না!"

"সব্ বাবা"—এতক্ষণে স্বর ফুটত কণ্ঠে, এতক্ষণে বাবার দুচোখের কোণে চিকচিক করে উঠত অশ্রুর বিন্দু, ধরা ধরা ভাঙা গলায় বলতেন, "যেতে দে। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই, এ পৃথিবীতে কেউ কোথাও আমার নেই!"

হু হু করে কেঁদে উঠত কমল। নেপথ্যে মার তীব্র ধারালো কণ্ঠের তীর তখনো বাবাকে সমানে বিঁধছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কমলকে বুকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করতে করতে বাবা আবার ঘরে আসতেন ফিরে।

এদিকে ঘরের মধ্যে বিপুল বিপর্যয়। রান্না নামিয়ে উনুনে জল দিয়ে উনুন নিভিয়ে জিনিষ পত্র ছড়িয়ে ফেলে মা বিছানায় শুয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, "ওগো বাবাগো, এ আমাকে কোথায় রেখে গেলে গো!"

আমরা এ ঘরে স্তম্ভিত বেদনার্ত তিনটি প্রাণী স্তব্ধ হয়ে মার একটানা বিলাপ শুনছি! শেষে বাবা আমাদের দুজনকে ঠেলে দিতেন এগিয়ে, "যা, গিয়ে শান্ত কর।"

আমরা গিয়ে দাঁড়াতাম মার কাছে।

"মা?"—হয়ত কান্নাভরা কণ্ঠে কমল বলত।

"যা যা, দূর হয়ে যা সমুখ থেকে," মা জ্বলে উঠত, "কেন যাও না তোমাদের অতি আপনার জনের কাছে? যে ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না—ওরে কেমন আছিস, সেই হলো অতি আপনার! আর যে মুখে রক্ত উঠে গাধার খাটুনী খেটে বুক দিয়ে তোমাদের মানুষ করে তুলছে, সেই হলো পর, কেমন? যা-যা, দূর হয়ে যা নিমকহারামরা!"

কিছুতেই শান্ত হতো না, শেষকালে ভাড়াটেদের বৌ-ঝিরা এসে অতিকষ্টে মাকে শান্ত করে তুলতেন।

মায়ের ভালবাসা হারালাম আমি। কমল ছোট বলে কিছুটা স্নেহ তখনো পেতো, কিন্তু বুঝেছিলাম, বড় হলে মায়ের স্নেহ ও-ও হারাবে। কেন এমন হয়? কৌতূহলী মন উদ্বেল হয়ে উঠল জিজ্ঞাসায়। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা স্বভাবজ, ইংরাজীতে যাকে বলে **instinct**, তার থেকেই এর উৎপত্তি। এই ইন্স্টিংক্ট কাজ করে ততদিনই, যতদিন শিশু থাকে শারীরিক অসহায়। শিশু সক্ষমতার স্তরে উন্নীত হলে মায়ের ভালবাসা পারিপার্শ্বিককে আশ্রয় করেই মূলতঃ গড়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিক যখন মনোবিকাশের প্রতিকূলে, তখনই আসে সংঘাত, সন্তান মায়ের ভালবাসা হারায়। বিশেষতঃ সন্তানের

পিতার প্রতি মায়ের ভালবাসা যদি না থাকে, তাহলে তো সন্তানের অবস্থা আরও মর্মান্তিক ! এই সত্যটাই আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

ওরা সুখী, যারা মায়ের ভালবাসা পেয়েছে। ওরা সার্থক, যারা মায়ের স্নেহ পেয়েছে ! ওরা সমৃদ্ধ, যারা মায়ের কাছ থেকে কর্মে প্রেরণা পেয়েছে। মায়ের অমৃত থেকে বঞ্চিত, সার্থকতা-সুখ-সমৃদ্ধিহীন নিঃস্ব ভিখারী, তাকে তো কেউ বুঝবে না।

রাতের ট্যুইশানীর পর ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দেহটিকে টেনে নিয়ে যখন বাসায় ফিরি, তখন প্রেতে-পাওয়া বাড়ীর মতই নিঝুম হয়ে গেছে ঘর। বাবা আসেননি হয়ত, মার ঘরে কমলকে নিয়ে মা শুয়ে পড়েছে দরজায় খিল দিয়ে। আমার ঘর অন্ধকার। হাতড়ে দেয়াশলাই খুঁজে আলো জ্বালাই, এগিয়ে যাই দাওয়ার প্রান্তে রান্নাঘরে। আমার ভাত থালা-চাপা দেওয়া, সেখানে পিঁপড়ে এবং আরশোলার অবাধ রাজত্ব বিস্তার। চাপা-দেওয়া থালাখানি সরিয়ে ক্ষুদে-পিঁপড়েদের আক্রমণ থেকে অন্নের ঠাণ্ডা করকরে গ্রাসগুলি উদ্ধার করবার প্রয়াস করি, করি শান্ত ক্ষুধার্ত উদরটাকে।

এই তো দিন। এইভাবেই দিন কাটে ! মার মুখে হাসি নেই, কমলের মধ্যেও বালক-সুলভ চঞ্চলতা নেই, বাবার মধ্যেও বিকার নেই। যেন আমরা নেই, আমরা মরে গেছি। আমাদের হয়ে যারা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে তারা মানুষ নয়, প্রেত। কোলরিজের **Ancient Mariner** কে মনে পড়ে। কী সে পাপ, যার ফলে সংসার-সমুদ্রে অতি আকস্মিক আমাদের পরিবারের চলমান জাহাজটি স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল, তারপরে চলল, যেন কোন অদৃশ্য প্রেতাত্মা আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ! চারিদিকে এত রঙ, এত আনন্দ, এত কোলাহল মদির পানীয়ের মত উপচে পড়ছে, কিন্তু হায়রে, একবিন্দুও আমরা শুষ্ক তৃষ্ণার্ত জিহ্বা দিয়ে স্পর্শ করতে পারছি না,—**Nor any drop to drink** !

মানুষের সঙ্গ হয়ে গেল বিষাক্ত, নগরীর যন্ত্র-কোলাহল হারাল বৈচিত্র্য, আকাশ-বাতাস হয়ে উঠল জ্বালাময়, তবুও তেমনি পথ হাঁটছি ! তেমনি লুকিয়ে-লুকিয়ে কলেজ, তেমনি চাকরীর দরখাস্ত, তেমনি সকাল-সন্ধ্যায় ট্যুইশানীর দরজায় গিয়ে যন্ত্র-চালিতের মত কড়া ধরে নাড়া !

এমন দিনে একদিন স্নিগ্ধাংশুই আমাকে কিছুটা স্নিগ্ধ করল। ওরই পরামর্শ এবং নির্দেশ অনুসারে জনৈক অধ্যাপকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আবেদন-

পত্র নিয়ে দাঁড়ালাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর দরজায়। দরজা খুলে গেল। আঃ! এই তো আশ্রয়! এতদিন কেন এর সন্ধান পাইনি! বইয়ের সমুদ্র! আমি বাঁচলাম! হয়ত ট্রামের পয়সা নেই, দুপুর রৌদ্রে কলেজের অর্থহীন ক্লাশগুলো পালিয়ে পিচ-গলা আগুন পথের ওপর দিয়ে লাইব্রেরীর দিকে হেঁটে চলেছি। আর একটু পরেই বইয়ের শীতল অনন্তে ডুবে যাওয়া নয়, যেন পালিয়ে যাওয়া ক্লিষ্ট পৃথিবীটাকে ছাড়িয়ে। এ আর পাঠ্যপুস্তকের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তৃষ্ণার্ত বোকার মত হাঁফিয়ে মরা নয়, এ যে অবাধ সমুদ্র—অবাধ স্বাধীনতা। আমি এক জলদস্যু নাবিক, আমার ছোট্ট সুদৃঢ় পোতখানি নিয়ে অগাধ অবাধ মুক্তির মহাসাগরে ভেসে পড়েছি!

লাইব্রেরীর পর যখন পুনর্বার পথে পা ফেলতাম, সে যেন পা ফেলা নয়, হঠাৎই আকাশে উড়তে উড়তে পাখা ভেঙে শক্ত মাটির বুকে আছাড় খেয়ে পড়া। তখন সান্ধ্য নগরীর সৌধ-শিখর অভিসারিকা প্রসাধিকার মত কপালে টিপ পড়ছে উজ্জ্বল আলোক-মালার। হে রূপোপজীবিনী বিলাসিনী নগরী, এ তো প্রসাধন নয়, এ যে কান্না। রূপায়নের প্রতিটি রেখায় রেখায় উদ্বেলিত অশ্রু এসে জমছে!

নিখিলেশ, তোমার রক্তাক্ত মন নিয়ে তুমিও কাঁদো। তোমাকে এখন, অদূরবর্তী ঝকঝকে বাড়ীর দোতলায় একাংশে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে দুটি দুরন্ত বালককে তিক্ত ঔষধের মত গিলিয়ে দিতে হবে—পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর দয়ার সাগর ছিলেন!

দীর্ঘ একটি বৎসর এমনি ভাবে কি করে যে কাটিয়ে এলাম, সেটাই আশ্চর্য! আরও আশ্চর্য, কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল এ ভাবেও কেমন করে আশাতিরিক্ত হলো, কেমন করে অধ্যাপক-মণ্ডলীর দৃষ্টি হঠাৎই আকর্ষণ করতে পারলাম!

পুড়ে যাওয়া রিক্ত পুষ্পশাখাতেও কি বসন্তের ভ্রমর আসে গুণগুণিয়ে? সেদিন কলেজ-ফেরৎ বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবার গুঞ্জরণ তুলল মন। আবার যেন ফিরে এলো বহুদিন পরে কবিতার দিন। মাকে কি জানাব, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছি কলেজে, ভাল ফল পেয়েছি পরীক্ষায়, অধ্যাপক-বৃন্দ আমার ওপর কিছু আশা করছেন?

"টাকা কই?"

ঘরের মধ্যে পা-দিতে-না দিতেই মার প্রশ্ন শুনলাম। যন্ত্রচালিতের মত

ট্যুইশানীর টাকাটা পকেট থেকে দিলাম তুলে মার হাতে। গম্ভীর কণ্ঠে মা বলল, "মাত্র ষোল? আর কই?"

"আর নেই। গতমাস থেকে দুটো ট্যুইশানী নেই যে!"

তীব্র কঠোর দুই চোখের দৃষ্টি আমার ওপর ফেলে মা বলল, "চালাকী পেয়েছিস! কী করেছিস আর টাকা?"

অন্তরের সমস্ত আবেগ, সমস্ত জ্বালা দমন করে সংক্ষেপে বললাম, "জানি না।"

নীচের ঠোঁটের ওপর সজোরে দাঁত চেপে মা বলল, "বাপেরই ব্যাটা তো! মনে করেছিস ভাল হবে তোদের? পুড়বে, পুড়বে, সমস্তই পুড়ে হবে ছারখার! এ তো কী, গাছতলায় দাঁড়াতে হবে তোদের এ আমি বলে দিচ্ছি! আবার লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে আলোর তেল পুড়িয়ে পদ্য লেখা হয়। তোদের সর্বনাশ হোক!"

মাতৃ-অভিশাপ! বিছানায় শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ভেসে চলেছি। বুকের ভিতরটাতে রুদ্ধ অভিমান গুমরে গুমরে উঠছে। হায়রে কবিতা! কঠিন হিংস্রতার নিশ্বাসের অগ্নিদাহে আমার হঠাৎ-পাওয়া কবিতার দিন পুড়ে ঝলসে ভস্ম হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

ও-ঘরে কমল কাঁদছে,—"খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে।"

"গেলো রাক্ষস, গেলো!" মা চেঁচিয়ে উঠল, "এরপর খাবে কী? ষোলটি টাকায় মাস চালানো! এর থেকে দেনা দেবো, না খাবো! গয়না বিক্রী করে পেটে পুরিয়ে মানুষ করলাম, সামান্য দু'মুঠো খাবার পয়সা রোজগার করবার মুরোদ নেই! উচ্ছন্নে যা সব। পদ্য! পদ্য লেখা হচ্ছে! দোরে দোরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবি, এ যেন' চোখে দেখে যেতে পারি! হতভাগার দল সব!"

আবার উঠলাম। তীব্র বিষে আচ্ছন্ন ঘরের বাতাস, এখানে মানুষ থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে না!

সন্ধ্যায় যে ছেলেটাকে পড়াই তার বাবা এ নিদারুণ দুঃসময়ে আমার অভাবনীয় উপকার করলেন। চাকরী দিলেন। অস্থায়ী চাকরী, মাত্র তিন মাসের জন্য। অডিট হবে, সেইজন্য কয়েকজন বাড়তি লোক নেবে ওঁদের অফিসে।

প্রশ্ন করলাম ভদ্রলোককে, "কী কাজ করতে হবে!"

"সে হেন-তেন সাত-সতেরো অনেক কাজই আছে। মশাই, কাজ দেখিয়ে বড়বাবুর নজরে পড়তে পারেন তো মার-দিয়া-কেল্লা! টেম্পোরারী কাজ পার্মানেণ্ট হতে কতক্ষণ! আরে মশাই, আমার সেক্‌সানে নয় যে! কাজ হচ্ছে অ্যাকাউণ্টসে আমাদের গাঙ্গুলীর সেক্‌সানে। নইলে ঠেসে আপনাকে রেকমেণ্ড করে দিতুম তখন!"

"কতো মাইনে!"

"তিরিশ! ওকি, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? পার্ট-টাইমের কাজ, তিরিশ টাকা তো অনেক টাকা!"

"পার্ট টাইম!"

"হ্যাঁ। আর আপনার তো সুবিধে হলো মশাই। ছটা থেকে দশটা, মাত্র চার ঘণ্টা কাজ। দিব্যি কলেজ করেও অফিস করতে পারবেন! সেইজন্যই তো বলছিলাম আপনাকে!"

চাকরী হলো। ইতিমধ্যে এক ছুটির দিনে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে হঠাৎ সমরের সঙ্গে দেখা। একমুখ নাতিবৃহৎ ঘন কালো কুচকুচে দাড়ী, মাথায় গান্ধী-টুপী, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। পিঠে মৃদু একটু চাপড় দিয়ে মুখটি নামিয়ে কানের কাছে এনে প্রায় ফিসফিসিয়েই বলল, "কী হে, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ নাকি?"

বললাম, "আগে তোমার খবর কী বলো দেখি? কলেজ ছেড়ে দিলে কেন?"

"ছাড়লুম," সমরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এলো, "কলেজ-এডুকেশনকে আমি ঘৃণা করি।"

আমার তার্কিক মন বলে উঠল, "কারণ?"

চশমাটা চোখ থেকে নামাল সমর, বলল, "তর্ক তুলতে চাই না। এ হচ্ছে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা, প্রিন্সিপ্‌লের কথা। আমি মনে করি, কলেজ-এডুকেশন দেশের সর্বনাশ করছে! আর করছে ইউনিভারসিটির পরীক্ষাগুলো। শিক্ষার মুক্তি তো নয়, বাঁধন! বাঁধনের মধ্যে থেকে শিখি দাঁড়ের কাকাতুয়ার মত কতকগুলো বাঁধা বাঁধা বুলি। ছিঃ, একে কী শিক্ষা বলে?"

এবারেও প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু কেন এটা হলো, বলতে পারো?"

"বুর্জোয়া!" সমর বলল, "বুর্জোয়াদের মনোবৃত্তি! কলেজ ওদের এবং ওদেরই জন্য, সেখানে আমাদের স্থান নেই!"

একটু থেমে বললাম, "বুঝিয়ে দাও।"

"নিছক আত্মকেন্দ্রিকতাকেই আমি বুর্জোয়া মনোবৃত্তি বলে থাকি! কলেজী শিক্ষা আমার মতে আত্মকেন্দ্রিক। শিক্ষায় সহযোগিতা নেই, আদর্শের যোগসূত্র নেই, ছাত্র শিক্ষক কারুরই স্বকীয়তা নেই! আরে ভাই, গণ্ডীবদ্ধ শিক্ষাই তো আত্মকেন্দ্রিকতা!"

"বুঝলাম না ভাই।"

একটু হেসে তারপরে গম্ভীর হয়ে সমর বলল, "বুঝছ সবই, কিন্তু স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছ। সেটা স্বাভাবিক। কেন না, তুমি নিজে বুর্জোয়া!"

"বলছ কী!"

সমর বলল, "হ্যাঁ, সামাজিক দৃষ্টিতে এখন আর নও বটে, তবু তোমার মধ্যে খাঁটি বুর্জোয়া মন বাস করছে! তুমি নিজে প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরের কিছুই তুমি দেখতে পাও না, ভাবতেও পারো না!"

"ভুল বলছ সমর।"

"না,"—চশমা হাতের ওপর নামানো, সমরের দু'চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল,—"ভুল বলবার জন্য পৃথিবীর বুকে আমি আসিনি নিখিল। তোমার প্রতি আমার একটা শুভেচ্ছা ছোটবেলা থেকেই ছিল। তোমার সব আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্রকে সম্মান দিতে পারোনি।…জানি তোমাদের টাইপটাকে। একটু-আধটু কবিতা লেখো না? হয়ত ভালই লেখো, আমি মন্দ বলছি না। কিন্তু ঐ মনোবৃত্তি! তোমাদের সব-কিছুই নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাবনা, নিজের স্বপ্ন, নিজের সুখ-দুঃখ, এসব ছাড়িয়ে উঠতে তোমরা পারো না!"

একটু হাসলাম, "সাহিত্যের ধর্ম ও প্রকৃতি নিয়ে তর্ক তুলতে চাও সমর?"

"শুধু সাহিত্য নয়," সমর বলল, "আমাদের দেশের প্রত্যেকটি শিল্পকলা সম্বন্ধেই আমি একথা বলব! যারা সুখ-দুঃখ-স্বপ্ন-ভাবনা মিলিয়ে দেয় ব্যষ্টির মধ্যে, তারা নিজেরাই আত্মম্ভরী বুর্জোয়ার দল! কিন্তু ঐ সমস্তরই আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে।"

বললাম, "আস্তে ভাই সমর, পার্শ্ববর্তীদের শান্তিভঙ্গ করে লাভ নেই।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সমর, বলল, "আমি জানি, এই ভাবেই তোমরা এড়িয়ে যাবে আমাকে। এস্কেপিস্টের দল!…কিন্তু আসছে সেদিন, যাদের

করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান !···আসছে নতুন সমাজ, নতুন লোক—তোমাদের সব-কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে।”

স্তব্ধ হয়ে ওর কথাই ভাবছি। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল সমর, বলল, “যাকগে, তোমাকে আর এ সব বলে করব কী! আমাদের পার্টিতে তো আর যোগ দিলে না! অবশ্য, ভালই করেছ, আমি নিজে ও-পার্টি দিয়েছি ছেড়ে।”

“কী রকম ?”

বলল, “ছাড়তে হলো। ওদের মতের সঙ্গে আমার মত মিলল না। ভাবনা নেই, আমি এবার নিজের মনের মত করে পার্টি গঠন করছি। নতুন পার্টি।”

একটু থেমে সমর বলল, “যাক্, অনেক কড়া কথা বললাম, কিছু মনে করো না। ব্যাপারটা কী জানো, বুর্জোয়া পেটী-বুর্জোয়াদের আমি সইতে পারি না!”

“তুমি নিজে ?”

“আমার অবস্থার প্রতি ঈঙ্গিত করছ ? বিশ্বাস করো, আমি বড়লোক নই, আমি প্রলেটরিয়েট্। আমার বুর্জোয়া মা-বাপ-ভাই-বোন আমাকে ত্যাগ করেছেন, বুর্জোয়া বন্ধুর দল আমায় ছেড়ে গেছে!”

অবাক হলাম। সমরের অবস্থা খুবই ভাল, ওর বাবা রীতিমত ধনী। কিন্তু এ কী শুনছি!

একটু থেমে সমর বলল, “কিন্তু কোন ক্ষতিই আমার তাতে হয়নি। আমি শ্রমিকদের আত্মীয়, আমি তাদের সঙ্গে খাই, শুই, থাকি, সংগ্রাম করি। আমি বেশ আছি।”

প্রশ্ন করলাম “তোমার এখনকার ঠিকানা কী ?”

“জানাব না।”

একটুক্ষণ থেমে থেমে বললাম, “এই কী জাতীয়তার পথ ?”

—“হ্যাঁ। এমনি করে তিল তিল সাধনা, তিল তিল আত্মদান।”

—“সমর ?”—আবার প্রশ্ন করলাম, “একটা কথা! এদেশকে কী তোমরা রাশিয়া করতে চাও ?”

“বোকার মত প্রশ্ন, যার মানে হয় না। রাশিয়ার উদাহরণ, রাশিয়ার দৃষ্টি-ভঙ্গী, রাশিয়ার কর্মপদ্ধতি আমাদের কাজে লাগাচ্ছি বটে, ভারতবর্ষ চিরকালই

ভারতবর্ষ। ভারতের এমন একটি স্বকীয়তা আছে, যাকে বদলানো অসম্ভব, এই আমার মত, এবং এরই জন্য পূর্বতন পার্টির সঙ্গে আমার বিরোধ। যাক সে কথা বন্ধু, অলম্ তর্কেন। এখন পড়তে দাও। তুমি কী পড়ছিলে?"

বললাম, "গল্‌স্‌ওয়ার্দি।"

—"মন্দ নয়। ওর Mob পড়েছ?"

—"পড়ব। এখন 'Justice' পড়ছি। তুমি?"

"আমি?" সমর বলল, "সংস্কৃত সাহিত্য। বানভট্ট আর ভবভূতির প্রতিটি পংক্তি পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজছি এখন! দেখা যাক, আধুনিক গণতন্ত্রের কোন প্রাচীন ব্যাখ্যা ও আদর্শ পাওয়া যায় কি না!…"

অধ্যয়নরত সমরকে ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। মনে হতে লাগল, আমার বিরুদ্ধে সমরের অভিযোগ কী সত্য? সত্যই কী আমি আত্মকেন্দ্রিক?

অফিস চলতে লাগল। অফিস, কলেজ এবং ট্যুইশানি। অজস্র খাটুনী, ফলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থ-নিবিড় স্তব্ধ অবকাশটুকু হারিয়ে ফেললাম।

সওদাগরি অফিস। আসন্ন অডিটের জন্য অবিশ্রান্ত কাজ চলেছে। আমাদের কাজ দেখেন গাঙ্গুলীবাবু বলে মধ্যবয়সী স্থূলকায় জনৈক ভদ্রলোক। মুঠো মুঠো পান খান, আর সন্ধ্যে হতে না হতেই পাঠশালার কুখ্যাত পণ্ডিতদের মত মাথা ঝিমুতে সুরু করেন।

"বুঝলে, হ্যাঁ"—আকর্ণ বিস্তৃত হাসি টেনে আনেন পানের কস গড়িয়ে পড়া ঠোঁটে। ক্ষুদ্র চোখদুটি পিটপিটিয়ে তাকান—"রাতের ডিউটি কি আমাদের মত লোকের পোষায়! বড়বাবুর যেমন কাণ্ড, সায়েবকে বলে আমাকেই এখানে দিলে ঠেলে!"

একটি মাস কেটে গেল, মার হাতে মাইনে দিলাম তুলে। নির্বিকারচিত্তেই তা গৃহীত হলো। প্রথম চাকরীর প্রথম উপার্জন। পেলাম না অভিনন্দন, পেলাম না উৎসাহ-বাণী।

কয়েকটা দিন পরে। মা বলল, "ঘরে সবই বাড়ন্ত, টাকা চাই। অফিস থেকে কোনরকমে আগাম কিছু টাকা চেয়ে আনো।"

বলাবাহুল্য, কদিন ধরে বাবার দেখা নেই। মনে মনে ঠিক করলাম, তা-ই করতে হবে, গাঙ্গুলীর কাছে আজ অগ্রিম কিছু চাইব। এতে যদি নতি স্বীকার করতে হয়, তাও করব। লোকটা দেবার ব্যবস্থা করতে পারে।

কলেজ ছিল সেদিন কী উপলক্ষে যেন বন্ধ। দুপুরে বাড়ী বসেই বহুদিন

পরে একটা কবিতা লিখলাম। গৌরী কবিতা চেয়েছিল। এ কবিতা তারই জন্য। অফিসের পথে তাকে দিয়ে যাব। খবর পেয়েছি, দীর্ঘদিন পরে সে এসেছে বাপের বাড়ী।

গেলাম ওদের বাড়ী। বহুদিন পরে গৌরীকে দেখে ভারী আনন্দ হলো। বাণী-পিসীর সঙ্গে রান্নাঘরে কিছুক্ষণ আলাপ করে ওর ঘরখানায় এলাম।

"কী নিখিলদা, ডাকলে কেন?"

গৌরী কাছে এলো। বললাম, "বসো। কতদিন পরে এলাম, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।"

"হায় ভগবান!"—গৌরী হাসল, "আমার কি ছাই সেই সময় আছে! দেখো না সাত-সতেরো রকম রান্না করতে হবে নিজের হাতে। মায়েরও যেমন! রাতের ট্রেণে ওঁর আদরের জামাই আসবেন, এখন থেকেই তার অভ্যর্থনার আয়োজন স্থরু হলো!"

বুঝলাম। তবু নির্বোধের মত বলতে হলো, "তাহলে গল্প থাক। গৌরী, তোমার জন্য একটা জিনিষ এনেছিলাম।"

"কী জিনিষ দেখি?"

একটু হাসলাম, চাইলাম ওর চোখের দিকে, বললাম, "মনে পড়ে? কবিতা চেয়েছিলে?"

"ওঃ হো!"—গৌরী হেসে উঠল, "এতদিনে মনে পড়ল বুঝি! আচ্ছা নিখিলদা, তোমার কবিতা দেখি না কেন পত্রিকায়? আমার শ্বশুর বাড়ীতে কত পত্রিকা নেয়, এত খুঁজি, তোমাকে পাই না!"

হঠাৎ আঁচলের প্রান্ত মুখে গুঁজে হাসির ঝিলিকে ঝলমলিয়ে উঠল। বলল, "দাঁড়াও, এখন দিও না! দেখছ না, ভাই দুটি ঘরে রয়েছে!"

অবাক হলাম। ওরা রয়েছে তাতে কী?...

এক সময় বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল আমাকে, প্রায় ফিস্‌ফিসিয়েই বলল, "দাও।" দিলাম কবিতা লেখা কাগজখানা। হাতের মুঠোয় মুড়ে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করল। ইতিমধ্যে দেখছি, ওর বালক ভাই দুটি দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে। গৌরী চলে গেল। হঠাৎ মনে হলো, ছেলে দুটি সর্বক্ষণই আমার আর গৌরীর ওপর চোখ রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যটিই অদ্ভুত কুশ্রী, অদ্ভুত পঙ্কিল. মনে হতে লাগল। এর পিছনে কাজ করছে কার মনোবৃত্তি? বাণী-পিসীর। ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠলাম। আশ্চর্য, ওরা

কী মনে করেছে আমাকে! খানিকক্ষণ পরে গৌরী এলো, সাধারণ কিছু কথাবার্তা, কুশল প্রশ্ন বিনিময়,—উঠে পড়লাম। পিসীমার সঙ্গে দেখা করে সিঁড়ির পথে নামছি হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সিঁড়ির কোণ। বালিভর্তি কাঠের অনুচ্চ একটা বাক্সমতন রয়েছে, তার ওপর টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা কয়েকটি কাগজ, দুটো একটা সিঁড়ির ওপরেই উড়ে এসেছে। হঠাৎ-ই একটা আশঙ্কা ধ্বক্ করে উঠল মনে। কয়েকটা টুক্‌রো উঠিয়ে নিলাম। যা ভেবেছিলাম, তা-ই। গৌরীকে দেওয়া আমারই কবিতাটি টুকরো টুকরো ছিন্নবিছিন্ন।

কী শিশুর মত মন আমার! মনে হলো, কী যেন বহু মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে ফেললাম! আমার আদিম বন্য শিশুমন অবলম্বনহীন অসহায়টির মত হু-হু করা কান্নায় ভেঙে পড়েছে! অফিসটা অর্থহীন! রাশি-রাশি বৃহৎ অ্যাকাউণ্টগুলোর ওপর কলম বুলিয়ে পরীক্ষা করে চলেছি, দেয়ালের ধুক-ধুক করা বড়ো ঘড়িটা তার পাহারা জানাচ্ছে, সামনের টেবিলে পান চিবুতে চিবুতে গাঙ্গুলী ঝিমুচ্ছে, নগরীর রাজপথে কালো রাত্রি গভীর হয়ে উঠল, আমার মন বারে বারে হারিয়ে যাবার নিষ্ঠুর খেলা খেলছে! পারি না—আর পারি না—সমস্ত অন্তরটা লৌহস্তূপের মত ভারী আর স্তব্ধ হয়ে এলো।

"ওহে মুখুজ্যে?" মুখ তুললাম। সেই গাঙ্গুলী, সেই ঘড়ি, সেই অফিস, সেই রাস্তার ট্রামের শব্দ। হাতের কলম হাতেই আছে, টুকরো সাদা কাগজটার ওপর একটুও অঙ্কপাত ঘটেনি।

"কী হে, শুনতে পাও না?"

বললাম, "কী বলছেন?"

"বলছিলুম" গাঙ্গুলী আরেকটি পান মুখে পুরল, বলল, "তোমাকে আজ সকাল-সকাল ছুটি দিতে চাই।"

"কেন বলুন তো?"

"কাজ আছে। এসো এদিকে, কাছে এসো।"

অসীম বিরক্তিতে জ্বলে উঠলাম। কিন্তু তবু যেতে হলো। কাছে গিয়ে বললাম, "কী বলুন?"

"দেখ", গাঙ্গুলী স্বর নামিয়ে বলল, "তোমার বাড়ী যেতেই তো আমার বাড়ী পড়ে পথে। তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বলবে, আমার যে ভদ্রেশ্বর যাবার কথা ছিল, আজ যাচ্ছি রাতের ট্রেনে। কাল রোববার, কাল সারাদিনটা

ওখানে কাটিয়ে পরশু ফিরব। কাজেকাজেই আজ আর বাড়ী ফিরব না, তুমি খবরটা দিয়ে যাবে, বুঝলে?"

নিরীহ আমি, হঠাৎ কেমন করে মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠলাম, বললাম, "মাপ করবেন। আমি পারব না।"

"মানে!

"অফিসের কাজে যা বলবেন তাই করব, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত কাজ করতে আমি বাধ্য নই।"

"বটে!"

কণ্ঠস্বর উঁচিয়েই বললাম, "হ্যাঁ, তা-ই। আমি আপনার চাকর নই মনে রাখবেন।"

"চাকর নও!"—গাঙ্গুলী রক্তবর্ণ চোখ মেলে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড চাপড মেরে বলল, "একশোবার চাকর, আলবৎ চাকর!"

"সাবধান!"

"যাও-যাও, ঢের দেখেছি। মুখের ওপর কথা! চড়িয়ে তোমার গাল ভেঙে দিতে পারি তা জানো ছোকরা! আলবৎ চাকর!"

"মুখ সামলে বলবেন।"

"বটে! এই বেয়ারা? তোমায় ঘাড ধরে এখখুনি বের করে দেবো। এই গাঙ্গুলী দুঁদে লোক, বুঝলে? চাকর নও! তোমার চৌদ্দপুরুষ চাকর!..."

সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম, ঠাস্ করে গাঙ্গুলীর গালে এক চড বসিয়ে দিয়েছি। গাঙ্গুলী অস্ফুট আর্তনাদ করে দুহাতে মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা রেখেছে।

"রইল আপনার চাকরী!..."

বেয়ারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, সমস্ত অফিস বিহ্বল হতবাক! তাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলে এলাম রাস্তায়। উত্তেজনায় সর্বশরীর তখন থরথর করে কাঁপছে।...

"টাকা?" বাড়ীতে ঢুকেই সামনে মার প্রসারিত কর দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

মা আবার বলল, "টাকা দে।"

টাকা? মনে হলো যেন এর চেয়ে অর্থহীন অস্বাভাবিক কথা এ-জগতে আর কখনো উচ্চারিত হয় নি!

"টাকা আনিস নি? নাকি বাপের মত কোথাও খুইয়ে এলি! ওরে হতচ্ছাড়া, খাবি কী? থাক এবার, পেটে কিল মেরে উপোষ দিয়ে পড়ে। আমারই যতো মরণ, মরতে দাদাদের কাছে না গিয়ে এদের সংসারের দরজা কামড়ে পড়ে রইলাম!"

সংক্ষেপে ধীরে উত্তর দিলাম, "টাকা আনতে ভুলি গেছি।"

"ওরে আমার ভুল রে! কই, খেতে তো কোনদিন ভোলো না দেখি!"

"দেখ মা," আমি বললাম, "অন্ততঃ আজকের রাতটির জন্য আমায় একটু রেহাই দাও। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।"

"বাঃ, চমৎকার! মা-ভাইদের মুখে অন্ন জোটাতে পারে না, তিনি আবার তেজ করে বলেন, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি! কী হয়েছিল, শুনি?"

কিন্তু শোনাবার স্পৃহা আমার আর ছিল না। নিশ্চুপে আমার ঘরের মধ্যে চলে এলাম। মেঝের ধূলায় হতাদরে পড়ে আছে আমার কবিতার খাতাখানা। টেবিল থেকে ওটা মেঝেতে এলো কেমন করে? তুলে নিলাম হাতে।

"হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে,"—পিছন থেকে মা বলে উঠল, "চাকরী-বাকরী খুইয়ে ঠায় উপোষ মেরে এবার বসে বসে পদ্য লেখো। লক্ষ্মীছাড়া কী আর গাছে ফলে!"

"দোহাই তোমার, একটু চুপ করো।"

"ঈস্, তোর ভয়ে নাকি! সংসার চালাবার মুরোদ নেই, আবার কথা বলতে আসে!"

সমস্ত উত্তেজনা চাপবার প্রয়াস করে বললাম, "ও-ঘরে যাও, জ্বালাতন করো না!"

"কী?" মার মুখভঙ্গী নিমেষে বিকৃত বীভৎস হয়ে উঠল,—"আমি তোকে জ্বালাতন করি! এই কথা শুনতে হলো পেটের ছেলের মুখ থেকে!"

"মা!"

"কী, মারবি নাকি?" মা রুখে দাঁড়াল,—"ওঃ! ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখো না বেহায়ার মত! দূর হয়ে যা হতভাগা সামনে থেকে! হয়েছে কী, সারাজীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে মরতে হবে তোকে!"

পরক্ষণেই আর্তনাদ করে দুহাতে ঠোঁট চেপে ধরে মা বসে পড়ল। ঠোঁট কেটে গেছে হয়ত। হাতের বাঁধানো খাতাখানা ছুঁড়ে মেরেছি। উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ী থেকে অত রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম।

এত কালো কেন এই রাতটা? নগরীর পথগুলো যেন অশরীরী প্রেতের মত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। পার্কটা প্রায় নির্জন। অদূরের পাম গাছগুলো তাদের পত্রসম্ভার নিয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মত স্তব্ধ। পার্কের আলোগুলো পিশাচের লুব্ধ নিষ্ঠুর কুটিল দৃষ্টির মত ঘোলাটে—তির্যক—প্রখর হয়ে উঠল। পাষাণ স্তূপের অদ্ভুত শীতলতা নিয়ে খালি বেঞ্চটার ওপর বসে আছি, অথবা কে যেন জোর করে বসিয়ে রেখে গেছে আমাকে! কে আমি?

"এ বাবু।" সামনে এক পাহারাওয়ালা।

"উঠ যাইয়ে।..." উঠলাম। কিন্তু কোথায় যাবো? জনহীন রাস্তায় নিরুদ্দেশ চলা সুরু করলাম। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে, দুটো একটা মোটর কখনো সামনে হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফুটপাথে মধ্যে মধ্যে ভিখারীর দল শুয়ে আছে চোখে পড়ছে। সমস্ত মাথাটা ভারী হয়ে ঝিম-ঝিম করছে, পা দুটো যেন পাথর দিয়ে বাঁধা।

মা কী করছে এতক্ষণ কে জানে। ঠোঁটটা কি সত্যই কেটে গেছে? কেন এমন হলো? না, ফিরব না, কোন মুখে ফিরব? না ফেরাই উচিত। গাঙ্গুলী? গাঙ্গুলীর কী হয়েছে কে জানে! খুবই কী লেগেছে ওর গালে? ...গৌরী? হয়ত সেও বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছে। তার স্বামী আসছেন আজ!

বাবার দেখা পেলে কেমন হয়? ক্লান্ত পায়ে তবু হাঁটছি। হাঁটছি না, দেহরূপ বিড়ম্বনাটাকে কোন রকমে টেনে নিয়ে চলছি। সামনে দিয়ে কালো একটা মোটর শ্বাপদের তীব্র চক্ষুযুগল মেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে আসছে। ঐ এলো। আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর পশ্চাতের জ্বল জ্বল করা রক্তবিন্দুটি পিছন ফিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। পার হলো কয়েক মুহূর্ত। আবার পথ-চলা।

থমকে দাঁড়াতে হলো। ঐ না সেই চায়ের দোকান, যেখানে বাবাকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেতো? দোকানের ঝাঁপটার একটা দিক একটু খোলা। তারই ঠিক সামনের ফুটপাতের ওপর মাদুর বিছিয়ে দুটি লোক শুয়ে ছিল আমি কাছে যেতেই একজন উঠে বসল লক্ষ্য করলাম। এত রাতেও লোকটার চোখে নিদ্রা নেই কেন?

"কে?"

এ কী, বাবার গলা না?

"উত্তর দিচ্ছ না কেন? কে তুমি?"

উত্তর দেবার মুহূর্তটুকুতেই হঠাৎ গলার স্বর আটকে গেল।

বাবা সটান উঠে কাছে এলেন,—"কী চাও?" নিরুত্তরে মুখ তুলে তাকালাম।

"খোকা!" কঠিন বিস্ময়ে বাবা ভেঙে পড়লেন,—"তুই! কী ব্যাপার বল তো! বাড়ীর সব ভাল?"

ধরা গলায় থেমে থেমে বালকের মত অগোছালো ভাষায় সমস্তই বাবাকে বলবার চেষ্টা করলাম। কী বুঝলেন কে জানে, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এত রাতে গিয়ে আর দরকার নেই, কাল ভোরে আমার সঙ্গেই বাড়ী যাস।"

"আপনি যাবেন?"

"যাব। দেখ খোকা, মার মনে কষ্ট দিস না। আমার সঙ্গে যা-ই করুক, তোদের সে যক্ষের মত আগলে রয়েছে এটুকু বুঝে চলিস।"

চুপ করে রইলাম। পাশের লোকটা জেগেছে বোধ হয়, একবার হাই তুলল।

বাবা বললেন, "এইখানেই শুয়ে পড় আমার পাশে, মাদুর বেশ বড, জায়গা হবে'খন।

"কে মুখুজ্যেমশাই," লোকটা এতক্ষণে মুখ খুলল,—"আপনার ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

কঠিন ফুটপাথ। বাবা কী ফুটপাথের ওপরই শুয়ে থাকেন রোজ? কেন ওঁর এই অ-সহজ জীবন? কেন হেলায় মেনে নেওয়া ভাগ্যের নিষ্ঠুর পীড়নকে? প্রতিবাদের ভাষা নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই, পুরুষকারের জাগরণ নেই,—এ কার অভিশাপে?...এত কঠিনতার ওপর কী নিদ্রা আসে? ছটফট করে বিনিদ্র রাত যাপন করতে লাগলাম।

প্রলেটরিয়েট! আজ নগরীর দীনতম প্রাণীটির সঙ্গেও হয়ে গেছি এক। এধারে ডাস্টবিনের ধারে রাস্তার কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে শুয়ে। অল্প দূরেই একটি যাযাবর ভিক্ষুক পরিবার। একটি ছোট ছেলে হয়ত ক্ষুধার জ্বালাতেই এতক্ষণ ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদছিল, এতক্ষণে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। ওদের মধ্যেই বোধ হয় কেউ রোগী অথবা রোগিনী রয়েছে, থেকে-থেকে তার ক্লিষ্ট কাতরোক্তি শুনতে পাচ্ছি। একটি পাহারাওয়ালা ভারী জুতোর শব্দ

করতে করতে পাশ দিয়ে চলে গেল। ওদিককার ফুটপাথ ঘেঁষে তিন চারটি রিক্সা পর পর দাঁড় করানো। তার মধ্যে সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত খাটুনীর পর শ্রান্ত ক্লান্ত দরিদ্র রিক্সাওয়ালারা কোনরকমে গুঁড়ি সুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাবা নির্বিকার। নিদ্রামগ্ন স্তব্ধ পুত্তলী। নিঃঝুম নিশীথ রাত্রির মহানগরীকে ক্লান্ত চোখ মেলে দেখে নিলাম।

ভোরবেলা ময়লাগাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে ঘুম ভাঙতেই তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম! একটা ট্রাম তখ্‌খুনি চলে গেল। সর্বনাশ! ট্রাম থেকে পরিচিত কেউ আমাকে এ অবস্থায় দেখে ফেলে নি তো! একপ্রকার লাফ দিয়ে উঠেই দূরে গেলাম সরে, জামাটা তাড়াতাড়ি পরে ফেললাম। বাবা ততক্ষণে উঠেছেন, সেই লোকটিও।

বর্ণনার বিস্তার অনাবশ্যক, একটু পরেই আমরা বাড়ী এলাম। কমল এতক্ষণে চোখ-মুখ ধুয়ে এসেছে কলতলা থেকে। আমাদের দেখে বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। মা গৃহকাজ করছে। নির্বিকার। যেন কিছুই ঘটে নি। লক্ষ্য করে দেখলাম ওপরের ঠোঁটটা তখনো একটু ফুলে রয়েছে। ব্যথায় অনুতাপে বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। একটি কথাও নেই কারুর সঙ্গে, মূর্তিমান বিষাদের মত স্তব্ধ হয়ে রইল মা। গৃহকাজ সমানে চলেছে, যেদিন ঘরে কিছু থাকে রান্না হয়, না থাকে হয় না, উপোষে কাটে।

ওঃ! এর চেয়ে নির্মম শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না! মার নির্বিকার নিষ্ঠুর উদাসীনতা আমাকে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত নিয়ত বিদ্ধ করতে লাগল। মা যখন ভাড়াটের সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে, আমি অন্তরালে বসে একাগ্রমনে মায়ের কণ্ঠস্বর সুধার মত পান করি! হায় রে, আমাকে কি একটা কথাও বলার নেই মায়ের?

আর দারিদ্র? পলে পলে তিল তিল করে বুঝতে পারলাম, গাঙ্গুলীর গালে চড় বসাই নি, বসিয়েছি নিজের গালে। চাকরী নেই, এমন কি সর্বশেষ ট্যুইশানীটাও হারিয়েছি। কবিতার খাতাটা ছিঁড়ে ফেললাম একদিন, শেষে কলেজও দিলাম ছেড়ে। পর পর তিন দিন ঠায় উপোষ, এরপর কী আর পড়া হয়? অভাবের খরপ্রবাহে তিলে তিলে পুড়ে যেতে লাগলাম।

গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে অসীম তৃষ্ণায় ছুটোছুটি করতে করতে হঠাৎই যখন পথচারী আবিষ্কার করে কোন স্নিগ্ধতোয়া স্বচ্ছ ঝর্ণা, তখন তার মনের ভাবটা

কী রকম হয়? সেই উদগ্র আনন্দকে যেন অনুভব করলাম আজ, যখন ঘোর দুর্দিনে সুশীল-মামার এই ক্ষুদ্রকায় পোস্টকার্ডটুকু এলো হাতে। এ কী দুঃসহ উল্লাস? এমন কি এতদিন পরে মার মুখে পর্যন্ত দেখা দিল হাসি, বলল, "সত্যি। সত্যি লিখেছে সুশীল?"

"হ্যাঁ মা"—আমি বললাম, "এই দেখ। আমার চাকরীর হয়েছে। পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে, ওঁর এক বন্ধুর কাছে চাকরী, এই দেখ ঠিকানা। আমি এখুনি যাব। তবে চাকরী কিন্তু কলকাতার বাইরে।"

"তা হোক।"

সুশীল-মামার বন্ধুর কাছে ওঁর চিঠি নিয়ে যেতেই চাকরীটা হয়ে গেল। এক বড সওদাগরী কোম্পানীরই চাকরী। আমাকে যেতে হবে বাইরে মফঃস্বলে, ওঁদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র অফিসে। অবিলম্বে যোগদান করতে হবে।

দ্রুত কলকাতা ছাডবার উদ্যোগ অগ্রসর হতে লাগল।

দুদিন তিনদিন ধরে জিনিষপত্রের গোছ-গাছ চলল। এ দুর্দিনে বাড়ীওয়ালা আমাদের মহৎ উপকার করলেন। পাথেয়ের জন্য টাকা দিলেন ধার, বাকী বাড়ীভাড়ার জন্য তাগিদ দিলেন না। কথা রইল, মাইনে থেকে মাসে-মাসে মনি-অর্ডারযোগে টাকা পাঠিয়ে ওঁর এ-ঋণ শোধ করব। এ বিশ্বাসটুকু উনি আমাকে করলেন।

সেদিন বাবা বাড়ীতে এসেছেন। মা বলল, "দেখ বাপু, ও লোকটি যদি যায় তো আমি যাব না।"

"কেন!"

"হ্যাঁ"—মা বলল, "সারাটা জীবন আমার হাড় জ্বালিয়েছে, আর ওর মুখ-দর্শন করতে যেন আমার না হয়!"

"তুমি কী ক্ষেপেছ? বাবা যাবেন কোথায়?"

"তার আমি জানি কী,"—মা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "আর যদি ও যায় তো যাক, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি মাসিমার ওখানে থাকব।"

বাবা ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এলেন, বললেন, "খোকা, মিছে ভয় পাসনি, আমি তোদের 'সঙ্গে যেতেও চাই না। আমি বেশ থাকব। নতুন জায়গায় যাচ্চিস, যা, ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।"—বলেই প্রস্থানের উদ্যোগ করলেন। বললাম, "তা কী হয়! আপনি যাবেন কোথায়?"

বাবা ম্লান হাসলেন, "আমার জায়গা আছে।"

চলে গেলেন, আড়ষ্ট স্তম্ভিত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মা বলল, "বাঁচা গেছে, আপদ গেছে। নইলে, ওখানে গিয়েও জ্বালিয়ে খেতো!"

ভেঙ্গে-পড়া মন নিয়েই উদ্যোগপর্বে হাত দিলাম। এতদিনে ছাড়তে হলো বাবাকে? যেদিন রওনা হবো, সেদিনের কথা বলছি। সমস্তই প্রস্তুত। রাত সাড়ে নটায় ট্রেণ, কিন্তু একটু আগে থাকতেই শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে বসে থাকা ভাল, সঙ্গে মোট অনেক। বাবার তুলে দিয়ে আসবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসেননি। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনতে গেলাম। এসে দেখি, জিনিষপত্রের ওপর মা হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে আছে! কাঁদছে নাকি!

ডাকলাম, "মা?"

"খোকা,"—অশ্রুময় মুখখানি তুলল মা, "যা চায়ের দোকান থেকে ডেকে নিয়ে আয়।"

"কাকে, বাবাকে "

"হ্যা,"—কান্নাভরা কণ্ঠে মা বলতে লাগল, "আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। ওকে নিয়ে চল সঙ্গে, নইলে কোথায় থাকবে, কী করবে, খেতে না পেয়ে হয়ত রাস্তায়ই একদিন মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকবে! খোকা, তুই যা, আসতে চাইবে না হয়ত, তুই জোর করে টেনে নিয়ে আসবি।"

হঠাৎ-আসা আনন্দের জোয়ারে যেন ভেঙে পড়ব! আমি কমল দুজনেই ছুটে গেলাম বাবাকে আনতে। বাবা এলেন অবশেষে। আমরা ভেসে চললাম দূর দেশান্তরে। আমার চাকরী-স্থলে।

পদ্মার তীর! 'এখানকার'ও ভৌগোলিক নির্দেশ দিতে চাই না। জায়গাটা আধা সহর আধা গ্রাম। চাকরী পেলাম, সংসার বাঁচল, শুধু তাই-ই নয়, আমার মন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, আমি বাঁচলাম। ধূ-ধূ বালুবেলার পাশ দিয়ে কীর্তিনাশা পদ্মা চলেছে ধেয়ে। অদূরে লোহসেতুটাও যেন মাঝে মাঝে ভয়ে কেঁপে ওঠে, যখন দিঙ্মণ্ডল অকস্মাৎ মেঘে আসে কালো হয়ে। চমৎকার, হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা শত শতবার! সত্যিই যেন শত শতবার দেখা! আমার সমস্ত মন যেন চাইছিল, এই মুক্তির গতি-উদ্বেল দুর্ণিবার প্রবাহ!

। অন্য তীর ।

"জানি গো জানি, তোমার মধ্যে কী হচ্ছে আমি কি জানি না"···সেদিন রবিবার ভোরবেলা পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে আমার মনে এ কার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ? দূরে এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে যাচ্ছে চরের দিকে। হাওয়ায় একটু জোর দিয়েছে, ঢেউয়ের তালে তালে জেলে-ডিঙিগুলো একবার তালিয়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে। সূর্য উঠছেন পূর্ব দিগন্তে। জলকল্লোল যেন তাঁরই বন্দনা গাইছে মন্দ্র মূলতান রাগিণীতে।

মনের মধ্যে এই প্রভাতের আনন্দটুকু জাগিয়ে তুলেছে কার স্মৃতি ? কাকে মনে পড়ে বারংবার কর্মের অবকাশে অথবা প্রকৃতির নির্জন স্তব্ধ পরিবেশে ? এত দাহনের পর, এত ঝড়ের পর নিস্তেজ রিক্ত পুষ্পবীথির মূলদেশে কেমন করে আসে অনন্ত রসের প্রবাহ, সহসা ডালপালা নবীন কিশলয়ে নবীন কুঁড়ির স্বপ্নে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে ? সীমন্তে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা, হাতে শাঁখা, সেই নবোঢ়া বধূটি নয়, চোখের সামনে আমি দেখি ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়েটিকে, যে একদিন উদ্যত বেত্রাঘাত আমার হয়ে নিজের পিঠে করেছিল গ্রহণ। আমি দেখি তাকে, যে আমার বাহুতে মুখ লুকিয়ে একদিন বাইরের ঝরঝর বারিধারার দিকে চেয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠেছিল।

রক্ত-মাংসের মানুষ সে আর তো আমার কাছে নয় ! আমার কাছে সে শুধু 'গৌরী', দুটি মাত্র অক্ষরে বাঁধা সীমাহীন মাধুর্য, একটি হাসিভরা স্নিগ্ধ মুখ, ঈষৎ চঞ্চল দুটি গভীর কালো চোখ ! পদ্মার ঢেউয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ তার হাসি ভেসে আসে, দিগন্তে কালো হয়ে-আসা মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে তার চোখের একাগ্র স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি আমার ওপর চকিতে আলো ফেলে যায়।

স্টেশনের অনতিদূরেই পোস্টাপিসের কাছে একখানা একতলা বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। অফিস মাইল খানেকের মধ্যে। আমার কাজ কতকটা কেরাণীর কাজই বটে। বহুরকম কলকব্জা যন্ত্রপাতি আমার ঘরে মজুত রয়েছে, আমাকে রাখতে হয় তার হিসাব। রাখতে হয় সে সম্বন্ধের ড্রয়িংগুলো, যা অপর অংশের ড্রাফ্ট্‌স্‌ম্যানের অফিস থেকে তৈরী হয়ে আসে। ড্রয়িং মিলিয়ে

মিলিয়ে তৈরী যন্ত্রাংশ বিশেষের সঠিক আকার নিরূপণ করে রাখা, ঠিক না হলে ভুল ধরিয়ে দেওয়া! অবশ্য এ সব ব্যাপারের জন্য আমার উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারটি রয়েছে। ভদ্রলোক বাঙালী বি-এস্-সি পাশ, তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা আছে। অল্প বয়সেই বড় চাকরী লাভ করায় চলাফেরায় কথাবার্তায় একটা অনাবশ্যক চাঞ্চল্য আর প্রভুত্ব-লোভী আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাওয়া যায় সর্বক্ষণ। ভদ্রলোক তাঁর পুরো নামটা নিতান্ত বাঙালী-সুলভ মনে করে পাশ্চাত্য মতে সংক্ষেপ করেছেন,—মিস্টার কে, কে, গোসেইন। কে, কে, গোস্বামী না হয়ে এখানে তিনি একডাকে গোসেইন্‌সাহেব নামে পরিচিত। লম্বা রোগা ফর্সা চেহারা, উন্নত লম্বা নাক, চোখ ছোট-ছোট, ভাঙা গাল, সমস্ত অবয়বে বয়স হিসাবে সৌকুমার্যের বদলে যথেষ্টই রুক্ষতার স্পর্শ। মুখমণ্ডল ঈষৎ লাল, পরনে হ্যাট্‌প্যান্ট-টাই, হঠাৎ বাঙালী বলে চিনতে কষ্ট হয়।

"মুকার্জী," গোসেইন্-সাহেব একদিন বলল,—"আপনি ম্যানার্স জানেন না। শিখুন—শিখুন—মেক্ ইট্ আপ!"

বেরিয়ে গেল, আবার একটু পরেই এলো ফিরে, হাতে একটা ড্রয়িং-করা বড় কাগজ।

"এই ড্রয়িংটায় ভুল আছে।" গোসেইন এগিয়ে এলো,—"বের করুন তো ৫৭ নম্বরের আসল ড্রয়িংটা। না, না, ওটাতে নয়, ওটাতে নয়, ঐ আলমারীটায় দেখুন। নেই? আচ্ছা, ওটাতে দেখুন। কী, পেলেন না? হোপলেস্। আপনি মোটেই স্মার্ট নন। সরে আসুন, আমি দেখছি।"

দুজনে মিলে অফিসটা প্রায় তচ্‌নচ্ করে ফেললাম, যতই জিনিষটার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, ততই রেগে যাচ্ছে আমার ওপর। শেষে একসময় সব ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"ওঃ হো!"—গোসেইন্ বলল,—"ওটা তো নেই, ওটা তো ছোটসাহেবের ঘরে। O. K.! নিন, সব তুলে রাখুন। আঃ, তাড়াতাড়ি করুন না! না, আপনি মোটেই স্মার্ট নন!"

এর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে এদিক-ওদিক ঘুরে-বেড়িয়ে ওঘরে-সেঘরে সুযোগমত গল্প সল্প করে আবার এলো গোসেইন্, বলল, "কী করছেন? নাটস্‌গুলোর হিসেব? ড্যাম্ ইট্! রেখে দিন, কাল করবেন! আপনি একটা কাজ করুন তো? আপনার বাড়ীর কাছেই তো পোস্টাপিস। আমার এই

টাকা কয়টা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসুন তো। এই নিন পাশ বই। ও কী, ভাল করে ধরুন? হ্যাঁ,—ঠিক আছে, পকেটেই নিন, কাউকে দেখাবেন না, পেছনের দরজা দিয়ে চলে যান। বড়সাহেব সামনের দিকে ঘুরছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যান চলে।"

গাঙ্গুলীকে চড় মেরেছিলাম, সেই ঘটনা মনে পড়ছে। এরই নাম চাকুরী,—এরই নাম বাঁচা,—এরই নাম মুষ্টি অন্ন-সংগ্রহ-করা! উপায় নেই। দর্শন শাস্ত্রের নাম-করা ছাত্র নিখিলেশ, তোমাকে সামান্য বেয়ারার মত খর মধ্যাহ্নে পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে পোস্টাপিসে উপরওয়ালার আদেশ পালন করতে। Pattison-এর 'Idea of God' কী বলে?

থেকে থেকে বিদ্রোহ করে মন, জেগে ওঠে পূর্ণ আত্মাভিমান, ইচ্ছা করে সমস্তই ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ছুটে পালাই। মনে হয়, হাতে-পায়ে কঠিন শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে আমাকে। কেন এমন হয়? ঐযে ওরা, যারা রোজ সকালে উঠে কিছু কিছু গৃহকাজ করে, বাজারে যায়, তারপর সময় হলে পান চিবুতে-চিবুতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে অফিসে, কাজ করে, উপরওয়ালার হুমকি অম্লান বদনে সহ্য করে, ছুটি হলে ফিরে আসে ঘরে, আবার কিছু-কিছু গৃহকাজ, তারপর হয়ত গল্প-গুজব, তাস-দাবা-পাশা, এবং তারপরেই সপরিবারে বিছানায় দেহ এলিয়ে দেওয়া, সকাল পর্যন্ত একটানা নির্বিঘ্ন ঘুম, নিরবচ্ছিন্ন গড়িয়ে চলা নির্বিকার জীবন,—ওদের মত হতে পারি না কেন? কেন অফিসে উপরওয়ালার অর্থহীন যুক্তিহীন আত্মাবমাননাকে সহজেই মেনে নিতে পারি না, কেন কাজ করতে করতে হঠাৎ ভুলে যাই কাজ, মনটা কোন্ উধাও মুক্তি-কল্লোলের তীরে-তীরে ঘুরে বেড়ায়, আপন মনে খুঁজে ফেরে কোন একখানি অম্লান ঝলমল মুখ অথবা মূর্তিহীন অপরিচিতা অজানা তীব্র-আকর্ষিকার স্তব্ধ নিগূঢ় ইঙ্গিত! কেন মিশতে পারি না ওদের সঙ্গে সহজে, কেন ওদের হাল্কা রসিকতাকে বেদনাদায়ক মনে হয়, কেন ওদের তাস-পাশা-দাবায় সময়-কাটানোকে বিষাক্ত মনে হয়? হে বিশ্ববিধাতা, এ কী অদ্ভুত রহস্যজালে রহস্যময় করে তুলছ আমায় দিন-দিন? পদ্মার মুক্তি-মন্ত্রে কী দীক্ষা আমায় তুমি দিলে, আমার গৃহকোণ লাগে না ভাল, লাগে না ভাল সংসারের টাকা-আনা-পাইয়ের তুচ্ছ সুখ দুঃখ, লাগে না ভাল জনতার ভীড়,—কী বিপুল টানে উধাও ছুটে-চলা নৌকাখানির পিছনে-পিছনে মনটাকে করে দিচ্ছ নিরুদ্দেশ! কী অদ্ভুত যাদু তোমার ঐ ঘন কালো ঝড়ের মেঘে, কী অপূর্ব সংগীত ঝরঝর

বারি-ধারার মধ্যে! আমাকে ঘরে থাকতে দেয় না, কাজ করতে দেয় না, জোর করে ছিঁড়ে ছিনিয়ে আনে!

দেখেছি যখন বর্ষা নামে পদ্মার ওপারের আকাশ দিয়ে। ক্ষুব্ধা রাক্ষসীর এলোমেলো চুলের মত কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ল এ আকাশে, ওখানের আকাশে সুন্দরীর ঘন কাজল ভিজিয়ে মুছিয়ে দিয়ে অবিরল-কান্না-নেমে-আসার মত বৃষ্টির ঝরঝর সমস্তই ঝাপ্‌সা ধূসর করে দিল। এপারে পদ্মার উচ্ছল ঢেউ, ওপার থেকে ধূসর-বসনা রহস্যময়ী দিগ্‌-দিগন্ত একাকার করে রহস্যের গুণ্ঠনজাল টেনে-টেনে দ্রুত পায়ে স্রোতস্বতীর বুক বেয়ে ছুটে আসছে! ঢেকে গেল সমস্ত ঢেউ, যেদিকে চাই একখানি অখণ্ড শুভ্র যবনিকা, সমস্ত কিছুই চোখের সামনে অনন্তে বিলীন হয়ে গেল। এই কি সত্য? বিশ্বজগতের এই কি সব থেকে সত্য রূপ? তুচ্ছ ঘরবাড়ী হাসি-কান্না, সমস্তই মিথ্যা আবরণের মত ছিঁড়ে মিলিয়ে গেল, দেখা গেল, যাকে ক্ষুদ্র দেখছিলাম সে ক্ষুদ্র নয়, সে অসীম! ঐ যে ওখানে তীরের অনতিদূরে দুটি তালগাছ মাথা হেলিয়ে নির্বাক স্তব্ধ হয়ে শূন্যে তাকিয়ে ধ্যান করত, তারা নেই, অসীম শূন্যময়তায় বিলীন। নদীতটের জেলেপাড়ার একপ্রান্তে যে ঘরখানির উঠানে জেলে বুড়ো জাল বুনতো আর সুবিধামত ছোট্ট ডিঙিটি বেয়ে পদ্মার বুকে জমাতো পাড়ি, সে-ও আজ সব কিছু কাজ, সব কিছু কোলাহল ভুলে গিয়ে দূর দিগন্তে চোখ মেলে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। সে-ও ক্ষুদ্র নয়, মহাশূন্যে তারও মনখানি কখন উড়ে যাওয়া পাখীর মত ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল! কোথায় গেল চরের অতি-ক্ষুদ্র বালুকণা, তারাও কি অসীমতায় গেছে মিশে? কী অপরূপ রূপোন্মোচনের আনন্দ-রস-প্রবাহ নামল বিশ্ব-সংসারের স্তরে স্তরে বস্তুতে বস্তুতে! এ বিশ্বপ্রকৃতি যেন পরম-প্রাপ্তির একান্ত আনন্দঘন স্তব্ধতায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন। এই অমৃতময় অবচ্ছিন্নতাটুকু পাবার জন্যই কি পদ্মা নিয়ত চঞ্চল, মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, আপন মনে থেকে-থেকে গুমরে ওঠে, প্রবল বিদ্রোহীর মত দুপাশের সমস্ত বন্ধন ভেঙে চুরমার করে ছুটে যেতে চায়?

পরম-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আমার মনও কি ঐ পদ্মার মত থেকে থেকে চঞ্চল, ক্ষুব্ধ, আবর্তিত হয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে? কোন সুনীল মধ্যাহ্নের আকাশে জানালার মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে সাদা মেঘের কাছে উড়ছে কৃষ্ণবিন্দুর মত চিল, তাকাতে তাকাতে তাই কি হঠাৎ অফিসের হিসাব যাই ভুলে, মনে হয়, এই যে লোকটা হাতে-কলম সাদা মোটা খাতাটায়

টন্‌-হন্দর-পাউণ্ডের রাশি রাশি অশ্রুপাত করছে এ আমি নয়, আমার ছদ্মবেশে অন্য কেউ ?

কীসের এ তীব্র অসন্তোষের জ্বালা ? মাঝে-মাঝে হঠাৎ আবার দুঃসহ আনন্দ। কীসের আনন্দ ? কোথা থেকে এলো এ আনন্দ ? যেন শান্ত পদ্মার বুকে একটি স্বচ্ছ নির্মল আকাশের মনোরম প্রভাত ! কিন্তু এ-ও কিছুক্ষণের। দেখা গেল আবার জেগেছে ঢেউ, আবার ক্ষুব্ধতা, আবার মত্ত বাতাস, আবার মেঘ।

এই তো মানুষের মন ! ঠিক ঐ পদ্মার মত। কখনো সন্তোষ কখনো অসন্তোষ, কখনো শান্তি কখনো অশান্তি, কখনো গঠন কখনো সর্বনাশা ভাঙন ! নিজের মনকে দেখি পদ্মার মধ্যে ! পদ্মা আমার মনেরই প্রতিচ্ছবি !

অসন্তোষের স্থিরতা-হীন তীব্র মুহূর্তে সমরকে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে, মনে পড়ে তার কথাগুলি : আমি কি সত্যই আত্মকেন্দ্রিক ? সত্যই কি অনুক্ষণ নিজের মধ্যে নিজেরই সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সযত্নে সস্নেহে লালন করে চলেছি ?

ঠিক করলাম, থাকব না একা একা, মিশব সকলের সঙ্গে। সকলের আগে—জীবন। জীবনকে বাদ দিয়ে সমগ্র সত্যকে পাওয়া যায় না,—প্রতিষ্ঠাও করা যায় না। নেব বিভিন্ন জীবনের স্বাদ, শুনব বিচিত্র জীবন-প্রবাহের কল-কলরোল !

অফিসের যে সঙ্গীদল ইতিপূর্বে ভাব করতে এসে ভাবের অভাব নিয়ে গিয়েছিলেন ফিরে, সেদিন টিফিনে তাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

"এই যে ভাই, আসুন আসুন !"

"ওহে যুধিষ্ঠিরদা, আমাদের মুখুজ্যে ব্রাদারকে একটু চা গঁড়িয়ে দাও তোমার ফ্লাস্ক থেকে।"

হাত জোড় করে বললাম, "মাপ করবেন, চা খাই না।"

"আরে দূর মশাই,"—চশমা চোখে ভদ্রলোকটি মন্তব্য করলেন, "চা খান না সে আবার কী। এ যুগের সোমরস। সেকালের ঋষিরা খেতেন সোমরস, আমরা খাই চা।"

সমস্বরে হাসির দমকা উঠল।

"ওহে ভীম, তোমার থেকে খান দুই পরোটা বার করো হে।"

"ওহে নকুলবাবু, কিঞ্চিৎ হালুয়া দান করো।"

দেখতে দেখতে একটি ডিসে করে দিব্যি জলখাবার আমার সামনে এসে গেল।

"ওহে!—"এক ভদ্রলোক বললেন, "মুখুজ্যে ব্রাদারকে আমাদের নামগুলো ব্যাখ্যা করে দাও।"

"ঠিক!"—'ভীম' নামধারী মোটা ভদ্রলোকটি এগিয়ে এলেন,—"বুঝলেন ব্রাদার, আমরা বুড়োদের দঙ্গল ছেড়ে সব ইয়ংম্যানরা মিলে একটা ক্লাব করেছি, সেখানে সব-কিছু হয়, ব্যায়াম-চর্চা থেকে গান-বাজনা-থিয়েটার পর্যন্ত। এখন হয়েছে কী জানেন? প্রত্যেক বছর পূজোয় যে বই আমরা প্লে করি, সেই বছর আমরা সকলে যে-যে পার্ট করি, সেই-সেই নামে পরিচিত হই। ওই দেখুন না, আগের বছর আমি ছিলাম 'সেলুকস্', এ বছর 'ভীম' চলছে।"

সকলের সঙ্গে সমস্বরে হেসে উঠলাম। আজ ওদের ভালই লাগছে।

তবুও কি সহজ হতে পারি? এদের মধ্যে থাকতে থাকতে গল্প করতে করতে হঠাৎ সমস্ত মনটা ওঠে হাঁপিয়ে, তীব্র বেদনায় থেকে থেকে অন্তরটা কেঁপে ওঠে. মনে হয়, এ আমি কে, কোথায় এসেছি? এদের সঙ্গে তো আত্মার আত্মীয়তা ঘটতে পারে না। মনকে চাবুক মেরে ফিরিয়ে আনি! এদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেব আমার নিজের জীবন। এদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমারও সুখ দুঃখ। দেখব জীবনকে, জানব বিভিন্ন জীবনকে।

যুধিষ্ঠির-ভদ্রলোক বললেন, "আসুন সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে। একহাত তাস চলবে'খন!"

"মাপ করবেন!"—আমি বললাম, "তাস খেলা জানি না।"

"শিখিয়ে নেব, ওর জন্যে কী!"

কিন্তু সত্যি সত্যি সে সন্ধ্যায় ওদের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে ভারি অস্বস্তি লাগছিল। না, পারব না, পারব না মনটাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে—ও যে নিজেকে নিয়েই অনুক্ষণ ব্যস্ত, নিজের ভাবনা, নিজের বেদনা, নিজের আনন্দ।...

"থ্রি নো ট্রাম্পস্।"

"ডাবল্!"...সময়কে হত্যা করে চলল তাস খেলা। কিন্তু কতক্ষণ পারি! একটু পরেই বিদায় নিয়ে চলে এলাম। প্রথম রাত্রির অন্ধকার পথ। আসছে হাওয়া পদ্মার বুক থেকে জলকণার স্পর্শ নিয়ে।

সামনে মোড়! মোড়টা একটু পেরুলেই আমাদের বাসা। কিন্তু যাব

কি এই পথে? না ঘুরে যাব পিছন দিয়ে? দ্বিধার একটু কারণ ছিল। মোড়ের ঠিক মাথাতেই আমাদের বাড়ীর দিকে যেতে একটি হলদে রঙের নতুন একতলা বাড়ী পড়ে। ও বাড়ীটাকে এড়িয়ে চলবার সব সময়েই চেষ্টা করতাম। যখন তখন দেখতাম দুটি মহিলা জানালার ফাঁক দিয়ে বড্ড বেশী লক্ষ্য করতেন আমাকে। প্রথমটা বুঝতে পারি নি, বুঝেছি পরে। কোন-কোনদিন তাঁদের সঙ্গে আরও মেয়েরা থাকতেন। আমাকে দেখে কেন যে নিজেদের মধ্যে অত হাসাহাসি করতেন বুঝতাম না। এ বাড়ীতে থাকেন দুটি মহিলা, একটি পুরুষ। মহিলা দুটি তরুণী, একটি বিবাহিতা, অপরটি অনূঢ়া। পুরুষটি যুবক, ঐ বিবাহিতা মহিলাটিরই স্বামী,—কাবখানায় ওভারসিয়ারি করেন, মাথায় খাঁকিরঙের হ্যাট, সাদা হাফ সার্ট আর খাঁকি হাফ প্যাণ্ট ও মোজা বুট পরিধানে, রাতদিন একটা সাইকেল নিয়ে বাইবে বাইরে ঘুরে বেড়ান। অফিস ছাড়া নিজের টুকি-টাকি ব্যবসাব কাজও আছে। ভদ্রলোকের নাম জেনেছি, অনাদি প্রসাদ গাঙ্গুলী অর্থাৎ অফিসীয ভাষায—এ, পি, গাঙ্গুলী।

সন্তর্পণে বাড়ীটা গেলাম পার হয়ে। কলহাসির ঢেউ শুনতে পাচ্ছি। রোজ যেমন বসে জনকযেক তরুণ এবং তরুণীকে নিয়ে, তেমনি আজও ওদেব সান্ধ্যবৈঠক বসেছে বোধ হয়। মহিলা দুটিকে দেখেছি। ওঁরা আরও অনেক প্রতিবাসিনীদের মত মাধ্যাহ্নিক অবসবে আমাদের বাসায় এসে মার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছেন। বিবাহিতাটির কথা না বলাই শ্রেয়। অনূঢ়া মেয়েটির সামনাসামনি বহুবার হয়ে গেছি আমাদের বাড়ীতে। বাজে লাগত মেয়েটিকে। মুখে ঘন পাউডার, ঠোঁটের ওপর কৃত্রিম লালিমা, চোখের পল্লবেও কৃত্রিম প্রগাঢ়তা! আগাগোড়া যেন একটা অখণ্ড কৃত্রিমতার মুখোস আছে এঁটে!···

বাড়ীর বাইরে রকে বসে বাবা বিড়ি টানছেন, আমি ভিতরে চলে গেলাম। মা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে একটা আলনা টানাবার ব্যবস্থা করছে, সাহায্য করছে কমল আর আমাদের ঠিকে চাকর সীতারাম! বাবাও একবার এলেন ভিতরে সাহায্য করতে, মা হেসে বলল, "যথেষ্ট হযেছে, এ আর তোমার কর্ম নয়। তুমি যেমন থাকো তেমনি জবুথুবু হয়ে বসে থাকো গে। এই কমল, কোণটা ভাল করে ধরিস, পড়ে যায় না যেন, এই সীতারাম—আস্তে।"

ছোট্ট তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই থেকেই বাবা-মার বর্তমান সম্পর্কটা পরিষ্কার বোঝা গেল। এখানে এসে মা নতুন করে জেগে উঠছে, নতুন করে সুরু হয়েছে গৃহ-রচনা। বাবাও অনুভব করতেন এটা, এই নব গৃহ-রচনায় তাঁরও ইচ্ছা

করত হাত দিতে। কিন্তু মার দিক থেকে নিরুৎসাহ হয়ে আবার সরে যেতেন দূরে, একটা অভিমান বুকে চেপে। হয়ত এই-ই ছিল ওদের ছুজনের সবথেকে কাছাকাছি হবার ব্রাহ্মমুহূর্ত। কিন্তু উভয়পক্ষই পরস্পরকে ভুল বুঝে দূরে যাচ্ছেন সরে, মাঝখানে অভিমানের রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রবাহ।

ক্রমশঃ সংসারের দৈনন্দিনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। পূর্বে সংসারের সঙ্গে যে যোগাযোগটুকুও ছিল, এখানে তাও রইল না। এদের মধ্যে থেকেও আমি নেই, গৃহকাজের কোথাও পড়ে না ডাক, আমার সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক টাকার। মা ভাবল—ও বেচারী অফিস থেকে এত খেটেখুটে আসে, ওকে আর কেন সংসারের কাজের বোঝা দেই চাপিয়ে! একে তো ঐ রকম কী এক ধরনের ছেলে, মিশতে পারে না কারুর সঙ্গে, থাকে একা-একা। স্থতরাং আমার এই অদ্ভুত একক মন প্রশ্রয় পেলো। সংসার থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্নই রইলাম। মার দক্ষিণ হস্ত হলো কমল। এখানকার স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাছাড়া বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ে।

পুরুষের মন স্বভাব-বৈরাগী। তাকে কর্মের ডোরে রাখতে হয় নিরন্তর বেঁধে, তবেই তার মন আসে নেমে গৃহকোণটিতে। বাঁধতে না পারলেই তার স্বভাব ওঠে স্পষ্টতর হয়ে—প্রখর হয়ে ভোলা মহেশের মতই তার মন লোকালয়ের বাইরে নির্জনতায় ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে দিয়েই সত্যটা বুঝলাম বেশী করে। যদি কাজের প্রাচুর্য নিয়ে থাকতাম, তাহলে হয়ত অবাধে মিশতে পারতাম 'যুধিষ্ঠির তুর্যোধন' ভদ্রলোকদের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতাম নিজের জীবন—কিন্তু তাতো হলো না, আমার মন তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল।

পদ্মাতীরের প্রকাণ্ড বাঁধটার ওপর স্তব্ধ হয়ে বৈকাল থেকে সন্ধ্যা চুপচাপ বসে থাকি। চাঁদ ওঠে, দূরের চরের ওপর অবারিত জ্যোৎস্না অপরূপ স্নিগ্ধতায় ঝলমল করে, আমার মনে পড়ে গৌরীকে। একদিন হঠাৎ বাবাকেও আবিষ্কার করলাম ওখানে। খানিকটা দূরে ঠিক জলের ধারে চাঁদের দিকে চেয়ে স্তব্ধ নিশ্চল বসে আছেন বাবা। কী ভাবছেন, কাকে ভাবছেন? বাণী-পিসী!··· একই প্রবাহের তটে বসে আছি আমরা, আমি আর বাবা। কি অদ্ভুত! ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে এমনি করেই।

কিন্তু গৌরী আমার কে? ওই কথাটাই নতুন করে ভাবতে ভাবতে সেদিন সন্ধ্যায় নদীতট থেকে ফিরছি। সেই হলদে বাড়ী। ওখান দিয়ে পাশ কাটিয়ে

যেতে গিয়েই হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আজ ভীড় নেই, সেই অনূঢ়া মেয়েটী তন্ময় হয়ে গাইছে—'চিনিতে পারিনি! ওগো যে ছিল আমার স্বপন-চারিণী।'…বাঃ! সত্যিই তো! খুঁজতে খুঁজতে দিন চলে গেছে, তবু হয়নি চেনা, হয়নি বোঝা। শুভক্ষণে ডেকেছ কাছে, ভেঙেছ আমার লজ্জা। তবু তো না-চেনার না-বোঝার রয়ে গেল অস্পষ্ট অবগুণ্ঠন। গৌরী কে? মনে হলো, পেয়েছি যথার্থ উত্তর—স্বপন-চারিণী!……

বাড়ী এলাম। স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে আনা একখানা বাংলা উপন্যাস টেবিলে পড়ে ছিল। পড়া হয়ে গেছে। আজ লাইব্রেরীতে গেলে একখানা বই আনা যেতো। লাইব্রেরীতে বিস্তর বই আছে, কিন্তু পড়ার উপযুক্ত বেশী নেই। যত সব সস্তা বাজে, তাও হয়ত বিদেশ-থেকে প্লট অপহরণ করা ডিটেক্‌টিভ নভেল। কর্তৃপক্ষ বলেন, "কী করব মশাই, পাঠক যেমন চায়।"

একদিনকার চিত্র। লাইব্রেরীতে রয়েছি। আসছেন পাঠক সম্প্রদায়।

"কী বই দিয়েছিলেন মশাই, একখানা ভাল বই দিন, বেশ মোটা-সোটা, মানে অনেকক্ষণ দিব্যি রগুদার হয়ে সময় কাটানো যাবে।"

বক্তা ভদ্রমহোদয়টিকে চিনি, মিশ-কালো স্থূলদেহী কেরাণী আমাদের অফিসের। ভদ্রলোক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেদিন তুমুল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফিনফিনে পাৎলা পাঞ্জাবী গায়ে আরেকটি সৌখীন ভদ্রলোক এলেন, কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বললেন, " 'খুন-সমুদ্রের অগাধ জলে' বইখানা আছে? নেই? 'পিশাচের প্রতিহিংসা'? তাও ইস্যু হয়ে গেছে! 'রূপসীর রক্ত-পিপাসা'? তা-ও নেই? হোপলেস্!"

ভদ্রলোক কাঁধের একটু ভঙ্গী করলেন। মনে মনে হেসে ফেলি, এই ভদ্রলোকই সেদিন 'আধুনিক সাহিত্য ও কাল্‌চার' সম্বন্ধে বিপুল তর্কস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন।

"ওটা কী দিচ্ছেন?"—অপর একজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

"কেন,"—লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, "ভাল বই দিয়েছি। নামকরা লেখকের নামকরা বই। ছোট ছোট ভারী চমৎকার গল্প আছে।"

"রক্ষে করুন,"—ভদ্রলোক বললেন, "ওসব চুটকী চুটকী গল্প মশাই ভাল লাগে না, একটুতেই যায় শেষ হয়ে। বড় দিন, মানে নবেল টবেল আর কী!"

বুঝলাম, অধিকাংশ পাঠকই পড়েন সময় কাটানোর জন্য। উপন্যাস পড়েন এঁরা, কিন্তু পড়েন শুধু ঘটনাকে অর্থাৎ শুধু প্লটটাকে। অথচ, প্লটটা গৌণ,

প্লটের বাইরে যে বৃহত্তর পটভূমিকা মেলে দেওয়া আছে, সেদিকে এঁদের চোখ অন্ধ। ঘটনা হচ্ছে প্রসাধন মাত্র, রসসাহিত্যের সত্যিকারের রূপটিকে ঘিরে আমন্ত্রণের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দীপশিখা! ঘটনা হচ্ছে তুলির রেখা একখানা রেখাচিত্রের মধ্যে, কিন্তু রেখাকে ছাড়িয়ে চিত্রখানিতে যে বিপুল ভাবৈশ্বর্যের সঙ্কেত রইল পড়ে সেটা বুঝল কয়জন?

খাবার ডাক পড়েছে। বাবা বসেছেন, বসেছে কমল, আমার পিঁড়িটা শূন্য। স্থানটা সঙ্কীর্ণ, তবু আমার ও কমলের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রচেষ্টা রয়েছে। বাবা পড়ে গেছেন এককোণে। কোনরকমে হাঁটুদুটো জড়ো করে কুঁকড়ে বসে একখানা ছোট থালা থেকে বাবা ভাতের গ্রাস তুলছেন, আর মাঝে মাঝে গেলাস নয়, ঘটী থেকে খাচ্ছেন জল। মুখে কথাটি নেই, যেন এই সঙ্কীর্ণ উদর-পূর্তির বিড়ম্বনাটা যত শীগগির শেষ হয় ততই ভাল।

অত্যন্ত সামান্য এই চিত্রটি, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা অসামান্য। আমাদের সংসার-মধ্যে বাবা ঠিক অমনি লজ্জায় সঙ্কোচে ভেঙে এতটুকু জায়গার মধ্যে নিজেকে কোনমতে ধরিয়ে রেখেছেন। এ পৃথিবীর বুকে উনি যেন নিতান্ত অনাবশ্যক বোঝা, এই কথাই ভাবেন। নিবিড় কঠিন সংশয় ও সন্দেহবাদ ওঁর মনকে পিষে দুমড়ে মুচড়ে বাঁকা করে দিয়ে গেছে, সেই বক্রতাকে জয় করবার মত শক্তি, সামর্থ্য, মনোবল কোনটাই ওঁর আর নেই। ওঁর প্রতি মার ব্যবহারও দীন গ্রহীতার প্রতি ঐশ্বর্যবান দাতার মত! মান মনোভাবটা এই—আমার জন্যই তো তুমি আছ, তোমাকে দেখবার কেউ নেই, শোনবার কেউ নেই, এক আছি আমি, তোমার জন্য কেবল আমারই আছে দয়া, করুণা, অনুগ্রহ। অতএব স্বীকার করো আমার মহত্ত্বকে, শ্রদ্ধা করো আমার উদারতাকে, মান্য করো আমার কর্তৃত্বকে। অথচ বাবার মন মার কর্তৃত্ববোধ কিছুতেই নিতে পারত না সহজভাবে। এতকাল পরে বুঝছি, ওঁদের দাম্পত্য জীবনের সত্যিকারের ট্রাজেডী এইখানেই। একদিকে মার আভিজাত্য-বোধ, অন্যদিকে বাবার নিরুদ্ধ অথচ অনমনীয়, অপ্রকাশ অথচ জাগ্রত, নিষ্পেষিত অথচ উদগ্র বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বাইরে প্রকাশ আর কতটুকু? ভিতরে দুজনারই মধ্যে উত্তাল উদ্দাম বিরোধের ঝটিকা, নব নব পরিবেশে নব নব তার রূপাবর্তন শুধু। মায়ের আভিজাত্য-সচেতন মন চেয়েছিল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল একান্ত অনুগত পরামর্শ ও উপদেশগ্রহীতা একটি নিরীহ প্রকৃতির স্বামী। বাবাও চেয়েছিলেন অনুরূপ একটি অনুগতা সরলা কুণ্ঠিতা ব্যক্তিত্বহীনা স্ত্রী। কিন্তু

সুকঠিন বাস্তবভূমিতে ঘটল ঠিক বিপরীত। তথাপি হয়ত আপোষ হতো, কেন না মানুষের মন স্বভাবতই সংগঠনশীল। হয়ত পরস্পর পরস্পরের জন্য ক্রমশঃ সংগঠিত হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু বিচিত্র ঘটনাস্রোত ও পারিপার্শ্বিক সংগঠনের আভাসটুকুও ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দিনের পর দিন কেটে গেল, সময়-শিল্পী কত পরিবর্তনের ছবিই না আঁকল সংসারের পটভূমিকায়, কোনদিনই কি গঠিত হয়ে উঠবে না একখানি পরমবাঞ্ছিত সেতু, নেমে যাবে না বিরোধের স্রোতরাশি ?

জানালার কাছে বসে রাত্রির নির্জন পথখানির দিকে চেয়ে কত কী ভাবছিলাম, ওঘরে এঘরে শয়নের উদ্যোগ চলছে, বাইরে এসে বাবা বিড়ি টানছেন, কমল এলো ঘরে।

"দাদা ?"

মুখ ফিরিয়ে বললাম, "কী রে ?"

"একখানা বই দেবেন আপনার ? ও বাড়ীর মায়াদি চাইছিল পড়তে।"

"মায়াদি !" সবিস্ময়ে বললাম, "মায়াদিটি আবার কে ?"

"চেনেন না ?" কমল হাসল, "প্রায়ই তো আসে, মার সঙ্গে খুব ভাব। ঐ যে মোড়ের কাছের হলদে বাড়িটা, মিস্টার গাঙ্গুলী, তার বোন মায়াদি, প্রাইভেটে আই-এ পড়ছে।"

এতক্ষণে বুঝলাম। সেই অনূঢ়া প্রসাধনপ্রিয়া মেয়েটি মায়া, অর্থাৎ কমলের মায়াদি।

বললাম, "বই নেই।"

"লাইব্রেরী থেকে আনেন নি ?"

"না।"

পরদিন সকালে আমাদের বাড়ীতে আবার দেখলাম মেয়েটিকে। মার সঙ্গে গল্প করছে, কমলের সঙ্গে কথা বলছে, অবশেষে মাকে জলখাবার প্রস্তুতির সাহায্য করতে লাগল। ওকে দেখলে কেমন একটা জ্বালা, বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় ভরে যেতাম। কিন্তু আজ তা নয়। কতবার এসেছে বাড়ীতে, দেখেছি উগ্র প্রসাধনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকত না। আজ তার আকস্মিক ব্যতিক্রম দেখেই চোখ পড়ল। চুলের রাশি পিছনে আলগা-খোঁপায় বাঁধা, মুখে পাউডারের চিহ্নমাত্র নেই, চোখে নেই সুর্মার স্পর্শ, পরনে নেই দামী শাড়ীর বিশেষ ভঙ্গীটি. এমন কি পায়েও নেই জুতো। সাধারণ সহজ ভঙ্গিমায় একটা

সামান্য ছিটের ব্লাউজের ওপর সামান্য সবুজ ডোরা-কাটা সাদা মিলের শাড়ী-পরা, পায়ে আলতার স্পর্শ,—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সহজ সাধারণ রূপটি আবরণ-খসা ফুল্ল ফুলের মত অপূর্ব স্নিগ্ধতায় ফুটে উঠেছে! আমার শিল্পীমন উচ্চারণ করল মাত্র একটি কথা,—বাঃ!

কিন্তু বুঝছি না, ও মেয়ের হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন!…

কমল এলো, বলল, "দাদা, আসুন রান্নাঘরে, মা খেতে ডাকছে।"

"খাবার এইখানে দিয়ে যা।"

"খোকন?"—মা ডাকল, "রান্নাঘরে আয় না?"

"না!"

দেখা হলো আবার বৈকালে। বাবা কমল বাড়ী নেই, মার ঘরে মেয়েদের জটলা, আমি অফিস থেকে ফিরেছি, আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে আমার ঘরে এলাম। ঈষৎ-কোঁকড়ানো নরম এলোচুলে সমস্ত পিঠ গেছে ছেয়ে, সাধারণভাবে খয়েরী বর্ণের সাধারণ সাড়ী পরনে, পায়ে আলতার ছোপ, মেয়েটী আমার বিছানায় বসে একমনে কী একটা বই পড়ছে। চুপিচুপি চলে যাবো, না, সাড়া দেবো? একটু এগিয়ে দেখি, সর্বনাশ, এ যে আমারই কবিতার নূতন খাতা, আমার অতি যত্নের অতি গোপনের অপ্রকাশ্য সম্পদ! বারে বারে ভাঙন আসে, তবু বারে বারে জেগে উঠি। কাউকে দেখাই না, কেউ জানে না, কোন পত্রিকাতেও দেই না। কিন্তু ঐ মেয়েটী? হঠাৎ মনে হলো, এ যেন গৌরী, এমনি ভঙ্গীতে সে-ও অনন্যমনে একদিন পড়ত আমার কবিতা! মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে মেয়েটীর কোথায় যেন অদ্ভুত মিল আছে! রঙটা গৌরীর মত গৌর নয়, কিন্তু মুখের গড়ন, চুল, সুগঠিত নিটোল দুটি হাত? হঠাৎ মেয়েটী মুখ তুলল। সামনে আমাকে দেখেই বিস্ময়ে-লজ্জায় হতচকিত হয়ে খাতাটা রেখে আমার পাশ দিয়েই এঁকে বেঁকে ছুটে পালাল। কী অদ্ভুত রহস্য এ! এ যে গৌরী! গৌরীর চলা, গৌরীর চোখ-তুলে-তাকানো, গৌরীর ছুটে-যাওয়া, গৌরীর সলজ্জ মধুর মৃদু হাসি! পরম তৃপ্তিতে পরম অতৃপ্তিতে গুণগুণিয়ে উঠল মন,—'যে ছিল আমার স্বপন-চারিণী'।…

॥ দুই ॥

সেদিন রবিবারের প্রভাত একটা অপূর্ব নূতনত্ব, অপূর্ব মুক্তি নিয়ে পদ্মাতীর থেকে উদিত হলো। মেঘলা আকাশ, ঠাণ্ডা বাতাস, মাঠের ঘাসে আম্রবীথির শিরে, নারিকেল পাতায় পাতায় একটা সূক্ষ্ম সজলতার আভাস। ঘুম ভেঙে গেছে, শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। আমার জানালার বাইরে মাঠের অংশ, তারপর নবনির্মিত ও নির্মীয়মান বাড়ীগুলি, পাশে কয়েকটা বৃদ্ধ আমগাছ, তারই ফাঁকে কাঁচা পায়ে-চলা একটি পথ এগিয়ে গেছে। তারই এপাশ দিয়ে কয়েকটা টিনের চালা, তারপরেই তীর, সুবিস্তৃত পদ্মা।

ধীরে ধীরে উঠে চোখ মুখ ধুয়ে জানালাটির কাছে এসে বসলাম। বাবা এত ভোরেই বেরিয়ে গেছেন, এই রকমই যান। মা আর কমল তখনো বিছানায় শুয়ে, হয়ত ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু ওঠবার তাড়া নেই। আজ রবিবার, ছুটির দিন।

ছুটি, ছুটি! সজল ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাজছে ছুটির সুর। আম গাছের পাতায় পাতায় ঝিলমিলিয়ে ঝিরঝিরিয়ে উঠছে ছুটির ভাষা! মনে মনে আমার মন রইল চেয়ে, দুটি নয়ন কাঙাল হয়ে রূপের কোলে অরূপ মাধুরীকে দেখছে!

কী অনুচ্চারিত স্তুতি সে রেখে গেল আমার কবিতার খাতাখানির মধ্যে? স্তুতি না অন্য কিছু? কবিতায় আমি নাকি দুর্বোধ্য, আমাকে বোঝা যায় নি হয়ত। মেয়েরা কি সত্যই বুঝতে পারে পুরুষের কাব্য?

তবু ভাল লাগল। কিন্তু কাল,—কালকের রাত? সমস্ত রাত ভেবেছি। অফিসীয় বন্ধুদলের মধ্যে যিনি 'শকুনি', তাঁর কাছ থেকেই পেলাম এই সুরার মত তীব্র ও ফেনিল রহস্যমদির বিস্ময় বার্তাটুকু। সংসারে পোড়-খাওয়া নিষ্পেষিত মস্তিষ্কজীবি ছোট্ট মানুষটি আমাদের শকুনি। কথা বলতে বলতে ভাবভঙ্গীর সঙ্গে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত ওঠা-নামা। পথ ছাড়িয়ে মাঠের প্রান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে কালই বলছিলেন 'শকুনি' ভদ্রলোক,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, মশাই, ও বছর চাণক্য ছিলুম, মিথ্যাটি পাবেন না আমার কাছ থেকে, যা বলছি সব সত্যি কথা।"

"আপনি ভুল শুনেছেন, এ কখনই হতে পারে না।"

"আরে দাদা", 'শকুনি' চোখ মটকে হাসলেন,—"লুকোচ্ছেন কেন? এর চেয়ে সুখবর আর কিছু আছে কী! আনন্দ করুন, তবে এই ইতরজনদের জন্য মিষ্টান্নের কথাটা মনে রাখবেন!"

বললাম, "বিশ্বাস করতে পারছি না কিন্তু এখনও!"

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, বললেন, "চলুন আমার বাসায়, আপনি জিজ্ঞাসা করবেন আপনার বৌদিকে। বুঝলেন, মেয়েটা নিজে ওকে বলেছে সব কথা।"

সারা রাত ভেবেছি। মেয়েটা নাকি আমাকে ভালোবেসেছে। আমার জীবনে এটা সব থেকে আশ্চর্য নয় কী? কী আছে আমার মধ্যে? না রূপ, না বিদ্যা, না বিত্ত। দারিদ্র্য পুড়িয়ে দিয়ে গেছে আমার দেহের সমস্ত মাধুর্য আর উজ্জ্বলতা—যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ না পড়লে বিদ্বান হয় না, সেই দেশেরই ছাপহীন সন্তান আমি। আমাকে ভালবেসেছে আই-এ পরীক্ষার্থিনী আধুনিকা কোন তরুণী? অসম্ভব। তবু স্বপ্ন বিস্তার করছে তার প্রজাপতির মত ডানার ঝিলমিল!

মধ্যাহ্নের কথা বলছি। মেয়েটি এসেছে, সঙ্গে তার বৌদি। দরজার ফাঁকে একবার চোখে পড়ল সাধারণ বেশ, দেহলাবণ্যে কোথাও কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। ওরই পাশে ওর বৌদি উগ্র প্রসাধনে ভূষিতা। ঠোঁট, গাল, নগ্ন বাহু দুটি কৃত্রিম রঙে ঝলমল। এই বর্ণচ্ছটার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মায়া অতি শান্ত সুকুমার, স্বাভাবিক, স্নিগ্ধ রূপশ্রী! ভাল লাগল। ওদিকে মার সঙ্গে কমলের সঙ্গে ওরা গল্প করছে, এদিক থেকে তারই টুকরো আমার কানে আসছে। এক সময় দেখি ওরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে আমার ঘরের মধ্যে।

"খোকা?"—মা স্মিতহাস্যে এগিয়ে এলো,—"এরা তোর গান শুনবে বলে এসেছে। এসো অলকা, এসো মায়া, ঘরে এসে বসো।"

সঙ্কোচে লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে উঠলাম—কি সর্বনাশ—গান! ইতিমধ্যে চোখ চাইতে গিয়ে দেখি, মা ইঙ্গিতে কমলকে সকলের অলক্ষ্যে কী বলল, কমল দোকানের দিকে চলে গেল।

"কই, গান?" মেয়েটা বলল, "আপনার গান শুনব বলে আজ আমরা এসেছি।"

ধীর কণ্ঠে বললাম, "আমি তো গান জানি না।"

"জানেন বই কী!"—মিহিকণ্ঠে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন অলকাদেবী,

"সেদিন পদ্মার ধারে সন্ধ্যাবেলা তন্ময় হয়ে গাইছিলেন—আমরা পিছন থেকে শুনে নিয়েছি,—না রে মায়া ?"

"সত্যি", মায়া বিদ্যুৎময় হয়ে উঠল, "কী চমৎকার গান—কী মিষ্টি গলা !"

অপূর্ব স্নেহমমতায় মণ্ডিত হয়ে মা হাসছিল, বলল, "গা না খোকা ? আয়, ওখান থেকে নেমে আমাদের কাছে এই মাদুরে এসে বোস।"

চোখ তুলে একবার চাইবার চেষ্টা করে বললাম, "গাইতে পারি একটি সর্তে।"

সাগ্রহে প্রশ্ন করল মায়া, "কী সর্ত ?"

"আপনি গান শোনাবেন ?"

দুটি সলজ্জ স্নিগ্ধ চোখ আমাব চোখের ওপর একমুহূর্ত স্থাপিত করে বলল, "শোনাব।"

মা তখনো মৃদু মৃদু হাসছিল, বলল, "মায়া খুব ভাল গাইতে পারে রে !"

"যান !" ব্রীড়াবনতমুখী মায়া ঈষৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—"কী যে বলেন !"

অলকাদেবী লক্ষ্য করছিলেন আমাকে, বললেন, "ফাঁকি দিচ্ছেন নিখিলবাবু, এতক্ষণে একখানা গান হয়ে যেতো।"

"দেখুন," আমি বললাম, "গান জানি একথা ঠিক না, তবে নিজের মনে মধ্যে মধ্যে গুণ গুণ করি এই যা !"

"সেই গুণ গুণই আমাদের কাছে মধুর লাগবে, নিখিলবাবু !"

মায়া একটু এগিয়ে এলো, উজ্জ্বল চোখদুটি তুলে ধরে মিনতির মাধুর্য এনে বলল, "কই, গা-ন ! গাইবেন না ?"

"গাইছি।"

সেই ভাল। আমার অন্তরে যে-নতুন এলো তার মহিমা নিয়ে, তাকে সমস্ত প্রাণমন দিয়েই গ্রহণ করব। জানি আমার জীবনকে। জ্বালাময়, সংঘাতময়, দুঃখময়। তবু পুরাতন তারগুলি খুলে খুলে রেখে নতুন করে বেঁধে তুলি আমার এ অন্তর-যন্ত্রখানি। গুণ গুণ করতে করতে স্পষ্ট গলায় ধরলাম,—'একটি-একটি করে তোমার পুরানো তার খোলো, সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো !'

তাই হলো। দুয়ারখানি খুলে দিলাম আঁধার আকাশপারে, সপ্তলোকের নীরবতা আমার ঘরে আসুক। প্রসন্ন সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গিমার মধ্যবর্তী যে গাঢ় অতলস্পর্শী নীলিমাটুকু, আমি তা-ই দেখতে পেলাম মায়ার প্রেমময়

আবেশময় মুগ্ধ দুটি চক্ষুতারার মধ্যে। নিমেষে মনে হলো একে আমি চিনি,—বহুদিন থেকেই চিনি। একে খুঁজতে খুঁজতেই পেয়েছিলাম গৌরীকে, আবার গৌরীকে খুঁজতে খুঁজতে পেলাম একে। গৌরীর মধ্যে অনাগতা মায়া-কে দেখতাম, মায়ার মধ্যে গৌরীকে দেখছি!

"আমাদের বাড়ী আসবেন তো?" ফেরবার সময় মায়ার প্রশ্ন।

"আসব।"—আমার উত্তর।

অবাক হচ্ছি মা-কে নিয়ে। আমার মায়ার মেশামেশি নিয়ে মায়ের দিক থেকে কোন আপত্তি, কোন বিপত্তি নেই। আমাদের দুজনের পশ্চাতে মায়ের নীরব প্রশ্রয় কাজ করছে। তবে কি সেই বিপুল সম্ভাবনার আয়োজন আসছে এগিয়ে? বিয়ে! স্বপ্ন নয়, ভ্রম নয়, মায়াকে পাব পাশে! মনের সামনে ভেসে উঠল মা-বাবার বিভীষিকাময় দাম্পত্য জীবন। বিয়ের অর্থ তো ঐ! কিন্তু তবু, তবু মনে হতে লাগল, হয়ত প্রেমের মাধুর্যেই রুক্ষ দারিদ্র মধুর হয়ে উঠবে। স্বপ্ন দেখি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে এক কল্যাণী বধূমূর্তিকে। সেবাপরায়ণা স্নেহময়ী লক্ষ্মী বধু করছে হাসিমুখে গৃহকাজ, তারই স্নেহস্পর্শে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে এ সংসার, হয়ত তারই সেবায় যত্নে সহানুভূতিতে মা-বাবার ব্যবধানের প্রাচীর ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

"মাসীমা?" মিহিকণ্ঠে অলকাদেবী একদিন ইতিমধ্যে মাকে বললেন, "ছেলের বিয়ে দিন।"

মা বলল, "হ্যা, এবার দেবো, একা আর পারছি না সংসার চালাতে।"

এইটুকু কথা। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট, আমার অবুঝ স্বপ্নবিলাসী মন ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে স্বপ্নের নিগড় গড়ে তুলতে লাগল।

সে সন্ধ্যায় গেছি ওদের বাড়ীতে। ঠোঁটের কৃত্রিম রঙিনতার ওপর হাসির ভাঁজ ফেলে অলকাদেবী বললেন, "আসুন নিখিলবাবু।"

দুটি আমারই বয়সী যুবক বড় টেবিলটার পাশে ঈষৎ কোণাকুণি বসে আছেন, তাঁরা চোখ ফেরালেন আমার দিকে। মায়া ওদের কাছে গিয়ে আমাকে বসিয়ে পরিচয়-পর্ব সুরু করল,—"ইনি হচ্ছেন মিস্টার শুভেন্দু বোস, এখানকার এক অফিসে ভাল চাকরী করেন।" সুদর্শন যুবকটি আমায় প্রতিনমস্কার জানালেন।

"আর ইনি? শ্রীযুক্ত বরুণ লাহিড়ী। সাহিত্যে ঝোঁক আছে, আবার ব্যবসায়ী, বাজারের কাছে বিরাট কাঠের গোলা রয়েছে।"

পাঞ্জাবী গায়ে শীর্ণ কালো ভদ্রলোকটিও নমস্কার জানালেন। আমরা পরস্পর পরিচিত হলাম।

আলোচনা ছুঁয়ে যাচ্ছিল নানান বিষয়কে। সাহচর্যটাই মুখ্য, আলোচনা গৌণ, তাই গুরুত্বের আরোপ তাতে দেখছি না। প্রসাধন-ভূষিতা অলকাদেবী মধ্যমণির মত বসে রইলেন, তাকে ঘিরে মায়া ও আমরা। মায়ার দাদা বাড়ী নেই, শুনলাম কাজকর্ম সেরে দশটার আগে কোনদিনই তিনি ফিরতে পারেন না। ভয়ানক খাটছেন ভদ্রলোক। এদিকে এঁদের আলোচনা চলেছে। ইয়োরোপে যুদ্ধের আগুন কি আবার জ্বলল? ওদিকে চীনের প্রতি জাপান, এদিকে আবিসিনিয়ার প্রতি ইটালী। রাশিয়ায়-জার্মানীতে সাজো-সাজো রব, সমর আসন্ন। বাঙলা কবিতায় আধুনিক ভঙ্গী বড় দুর্বোধ্য। আধুনিক নারী-প্রগতি! আধুনিক বলতে কী বোঝায়?

"আমার মনে হয়" শুভেন্দু বোস ঈষৎ ঝুঁকে বলে উঠলেন, "আধুনিকা তিনিই যিনি সর্ব বিষয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে দেখেছেন বড করে, নারীত্বকে নয়। স্ত্রী স্বাধীনতা..."

"অর্থাৎ?" বরুণবাবুর ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল যেন।

শুভেন্দুবাবু ওঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু তর্ক প্রসঙ্গ থাক। বাণী-পিসীদের যুগও দেখলাম। দেখছি এ যুগ। আধুনিকা অলকাদেবী। স্বামী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টেনে তুলেছেন যে প্রতিষ্ঠা, যে অর্থ, তা স্ত্রীর জমকালো সাড়ী, ঠোঁটের লিপস্টিক হয়ে সমাজের বুকের ওপর দিয়ে হাওয়ায় যাচ্ছে ভেসে! স্ত্রী প্রসাধন-ভূষিতা হয়ে যুবকবৃন্দের স্তুতির মধ্যে মধ্যমণি হয়ে রইলেন বসে রক্তিম ঠোঁটে বাঁকানো হাসি নিয়ে, স্বামী ঘুরছেন সাইকেল চালিয়ে ওধার থেকে এধারে, এপাশ থেকে ওপাশে। একে কী বলব?

এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা বিদায় নিলাম। বেশ লেগেছিল বরুণবাবুকে। কথা বলেন কম, দেখেন বেশী। একটি কোণ বেছে নিয়ে চুপচাপ বসে সব লক্ষ্য করেন। আসবার সময় পথে নেমে হাতখানি হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটু চাপ দিলেন, বললেন, "অবশ্যই আসবেন একদিন আমার ওখানে, আসবেন কেমন?"

সম্মতি জানালাম।

কয়েকটা দিন কাটল। মায়া রোজই আসে, টুকরো-টুকরো গল্পও হয় আমার সঙ্গে। কিন্তু একান্তে ওকে পেলাম দিন পনের পরে। ছুটির দিন।

ঝিরঝিরে সকালবেলা। পদ্মাতীরের দিকে যাচ্ছি, ওকে পেলাম পথে, আম্রকুঞ্জের মধ্যে। মেঘমলিন ঝিলিমিলি আলো, পাখীর ডাক, জায়গাটা নির্জনও।...

"বেশ হলো নিখিলদা, দেখা হয়ে। আসুন একটু বেড়াই।"

মায়ার প্রস্তাবে সহাস্যেই সম্মতি দিলাম।

পথ চলেছি। মায়া বলল, "আপনি বড় কম কথা বলেন নিখিলদা।"

"কী রকম?"

"আমি আপনার কবিতার কথাই বলছি। বড সংক্ষিপ্ত, বুঝতে গেলে ভাবতে হয়। ভেবেও কি কুলকিনারা পাওয়া যায় ছাই।"

আমি চুপ করে রইলাম। ও আমার মুখের দিকে চেয়ে সেই মুহূর্তে কী পেলে দেখতে কে জানে, এ প্রসঙ্গ ছেড়ে প্রসঙ্গান্তরে যাবার প্রয়াস করল।

"নিখিলদা, এই দেখুন পদ্মাতীরে এসে পড়েছি। কী চমৎকার এই সকালবেলাটা, তাই না? লোকে এখন আমাদের মত বেড়াতে আসে না কেন, তাই ভাবি।"

সত্যিই সকালবেলাটা চমৎকার। কিন্তু তার চেয়ে চমৎকার ও নিজে। ঘন নীলপাড নীলাভ সাডী পরেছে, চুল খোঁপা বাঁধা, কপালে ওপর চূর্ণালক উডছে, উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানি ভরা, চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে আমার ওপর পড়ছে মাঝে মাঝে। দুগাছা করে সরু চুড়ি হাতে, তবু তাতেই ঈষৎ রিণিঝিণি। ওর দিকে তাকাতে তাকাতে একটা অন্ধ আবেগ আসে ভিতরে, একটা অদ্ভুত আনন্দে ছেয়ে যায় মনের আকাশ।

বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি তীর ধরে ধরে। বাঁধ শেষ হয়ে নরম মাটির তীরভূমি। অদূরে টিনের চালাবাড়ী, জেলেদের পল্লী। একটা ইটের পাঁজার আড়ালে এসে নরম মাটির ওপর হঠাৎ-ই বসে পড়ল মায়া।

"কী হলো আপনার?"

অদ্ভুত হাসি হেসে মায়া বলল, "আর পারছি না, আমি বসলাম, ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে।..."

"ওদিকে বেলা বাড়ছে যে!"

"বাড়ুক!"

কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড স্তব্ধতা।

মায়া হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "আপনি বসুন।"

"বসছি।" একটু সরে বসলাম।

"বা রে!" মায়া হেসে উঠল, "অতদূরে বসলে কথা বলব কার সঙ্গে? এদিকে আসুন।"

এলাম। অনেকক্ষণ থেমে থেকে হঠাৎ এক সময় আস্তে আস্তে বলল, "জেলেডিঙ্গিগুলো দেখতে আমার কিন্তু বেশ লাগে:"

"আমারও।"

অপাঙ্গে আমার দিকে একবার তাকিয়ে মায়া বলল, "আপনি অন্যমনস্ক। কী ভাবছেন বলুন তো?"

"কই, কিছু না।"

মায়া চোখ নামাল, "ভাবছেন। বলবেন না তো?"

"সবই কী বলা যায়?"

"যায়।"

কিন্তু চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ, অতি হঠাৎ-ই মায়া বলে উঠল, "আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, তাই না?"

ঘৃণা! চমকে বললাম, "অসম্ভব।"

অনেকগুলো মুহূর্ত নিশ্চুপ কেটে গেল। হাওয়া জাগল, বাড়ল ঢেউ।

বললাম, "কীর্তিনাশা যে-কোন মুহূর্তে পাড় ভাঙবে। আপনি উঠুন।"

"পারব না।"

"কী পারবেন না?"

"উঠতে।"

হাসলাম, "তবে বসে থাকুন। পাড় ভেঙ্গে পদ্মা যখন বুকে টেনে নেবে, তখন বুঝবেন!"

"নেয় নেবে! আপনি তো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচাবেন না আমাকে! আমি আপনার কে!"

"তুমি আমার সব!"

মায়া পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করল আমার চোখে। সলজ্জ রক্তিম অপূর্ব মুখখানি। আবার মুখ নীচু করে চোখ নামাল। পার হচ্ছে সময়। এক সময় হাতখানি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

"হাতটা ধরে উঠিয়ে দেবে? পারছি না যে!"

সাগ্রহে চেপে ধরলাম হাতখানা, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হাতের মুঠোয় রইল হাত, আমরা পাশাপাশি চলতে লাগলাম। সামনে আমের বন আর পায়ে-চলা পথ।

কথা হারানো একান্ত নিবিড় মুহূর্ত! উষ্ণ নরম ভীরু হাতখানি আমার হাতের মধ্যে কাঁপছে। আলগা খোঁপাটি ভেঙে এলিয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। চঞ্চল হাওয়ায় উড়ছে চুল, উড়ছে আঁচল! ক্ষণে ক্ষণে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে! অদ্ভুত আবেগ, অদ্ভুত উন্মাদনা!...

অনেকক্ষণ পরে একটা আম গাছের তলায় ঝিলিমিলি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে পড়ে মায়া বলল, "কী ভাবছ অত?"

"ভাবছি না। অনুভব করছি।"

"কী?"

"আনন্দ!"...

আবার চলা। খুব কাছ ঘেঁষে চলতে চলতে প্রায় ফিসফিসিয়েই মায়া বলল, "তুমি বুঝতে পারো নি আগে?"

চুপ করে রইলাম।

মায়া আবার বলল, "আমি বুঝেছিলাম।"

"কী?"

উজ্জ্বল স্বচ্ছ দুটি চোখের আলো আমার চোখে ফেলে মায়া বলল, "ভালবাসা!"

আমি নিরুত্তর। আবার সুরু করল মায়া, "চুপচাপ একা একা তুমি থাকতে, একা একা পদ্মাতীরে বেড়াতে যাও, রাত পর্যন্ত তীরে বসে থাকো, সবসময়ই কী যেন ভাবছ, কখনো উদাস বিমর্ষ, কখনো চোখে-মুখে নিদারুণ উল্লাস। নামল বৃষ্টি, লোকে ছোটাছুটি করে বাড়ী ফিরছে, আশ্রয় নিচ্ছে, আর তুমি নির্বিকার আপন মনে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছ, গা জলে ভিজে গেছে ভ্রূক্ষেপ নেই, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছ আকাশের দিকে। বৌদিটি ঠাট্টা করে উঠত। আমি বলতাম, "না ঠাট্টা নয়, উনি কবি, সত্যিকারের কবি!"

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম, এত নিবিড় করে, তীক্ষ্ণ করে দেখেছে আমাকে ওর মন এমন করে চিনেছে আমাকে!

"ঐ যে বাড়ী. এবার ফেরা যাক. কেমন?"

অনুনয়জড়িত স্বরে বললাম, "এখন না, আরেকটু বেড়াই, আজ তো ছুটির দিন!"

মুখ টিপে চমৎকার হাসল মায়া, বলল, "এততেও সাধ মিটল না? আচ্ছা দুষ্টু কিন্তু তুমি। চল বাগানের মধ্যেই বেড়াই, নদীর দিকে যাব না, লোকজন আছে।"

মায়া আবার আমার হাতটা টেনে নিল, বলল, "আজ কবিতা লিখবে? আমাকে নিয়ে, কেমন?"

"শুধু তুমি?"

"হ্যাঁ!"

বললাম, "শোন। বিপুল বিশ্বজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্র নিয়ে অনন্ত আকাশ। তারই নীচে ধরিত্রীর ধূলিকণার ওপর প্রবহমান জীবন—সমুদ্রের মত গভীর, তরঙ্গাকুল, অতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ। তারই মধ্যে ছোট্ট শ্যামল স্নিগ্ধ দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছ তুমি—মায়া!"

হাতে নিবিড় চাপ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, "কবি—তুমি আমার কবি!"

আম্রবীথির শাখায় তখন শিরশির বাতাস, পাখীর ডাক। বললাম, "মায়া, একটা কথা শুনবে?"

"কী?"

"আস্তে আস্তে একটা গান গাইবে?"

"দূর পাগল! এই কি সময়?"

"এ-ই সময়। চারিদিক স্তব্ধ নির্জন। পায়ে-চলা ছোট্ট একটা পথের ধারে এসে পড়েছি। গাও লক্ষ্মীটী!"

মায়া বলল, "এসো বসি।"

বসলাম পথের অদূরে ঘাসের ওপর একটা গাছের নীচে। গাইতে গিয়ে হঠাৎ হেসে উঠে রক্তিম মুখখানি দুহাতে ঢেকে ফেলল।

"কী হলো, মায়া?"

মায়া একটু হাসল,—"এত গান গাই এত লোকের সামনে, আর তোমার কাছেই যত লজ্জা!"

"লক্ষ্মীটি গাও।" ধীরে ওর কাঁধের প্রান্তে হাতখানা রাখলাম। পায়ে-চলা পথটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মায়ার কণ্ঠ উঠল গুণগুণিয়ে, 'এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে—কে তা জানে!'

এরই নাম ভালবাসা। ওর হাস্যকুঞ্চিত দুটি ঠোঁট আর চোখের পল্লবপ্রান্তে তাকাতে তাকাতে চিত্ত ব্যাকুলতায় তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে! আবার ওর অন্যমনা উদাস চোখ দুটির দিকে চেয়ে অপূর্ব ভাল-লাগার শান্ত ও স্তব্ধতা নিয়ে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা হয়। এই কামনা ও কামনাহীনতাই পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা।

মনে পড়ে বই কি গৌরীকে। কিন্তু সেটা নিতান্ত কৌতূহলের সঙ্গে। ভালবাসার উপযুক্ত মন চাই। সে মন তখন ছিল না। গৌরীর প্রতি যে-আকর্ষণ, সেটা কামনাহীন স্নেহের আকর্ষণ। কামনাহীন প্রেম পূর্ণ প্রেম নয়। সুমধুর কামনাই প্রেমকে উজ্জ্বল, নিবিড়, মুক্ত করে তোলে। গৌরীর মধ্যে খুঁজছিলাম পথ, সে পথ মিলল মায়ার মধ্যে। গৌরী সোপান, মায়া মন্দির। মায়ার কণ্ঠস্বর, মায়ার হাসি, মায়ার পদধ্বনি, মায়ার স্পর্শ আমাকে নিয়তই প্রতীক্ষমান করে রাখত। কখন ও আসবে, কখন দেখব, কখন শুনব। কিন্তু এ প্রেমের পথ কোনখানে গেছে, কোন সাগরের পারে, কোন দুরাশার দিকপানে, কে জানে!

॥ তিন ॥

এর পরের অনেকগুলো দিনের পথ সোনা-বিছানো। যতই যাই, কাঁটা নেই। ঝলমল সৌভাগ্য জানায় অভিনন্দন। সৌভাগ্য বই কি!

মায়াকে বলি, "কোথায় ছিলে এতদিন?"

দুষ্টুমির হাসি হেসে স্বর টেনে বলল, "সুপ্ত ছিলাম তোমার মনের মাঝারে!"

সত্যই তাই, প্রেম হচ্ছে সৃষ্টি, আত্মপ্রকাশও বলতে পারি। মনের মধ্যে যে ছিল সুপ্ত, তাকেই একদিন দেখি বহির্জগতে, তাকেই বলি প্রেম!...

দিনের পর দিন যায়। এলো পূজো, তাও গেল। যুধিষ্ঠির-ভদ্রলোকবৃন্দ নতুন নামে ভূষিত হয়েছেন! এবার বরুণবাবুকেও দেখা গেল এঁদের দলে, এমন কি শুভেন্দুবাবুকেও। মায়াকে বললাম, "কেমন দেখলে থিয়েটার?"

"মন্দ নয়। কিন্তু মেয়ে-পার্টগুলো ভাল হয় নি। কী ছিরি! ঐ ছিরিতে আবার মেয়ে-সাজা!"

হেসে উঠল। তারপরে বলল, "তুমি আমাদের বাড়ি যাও না কেন বলো তো? বৌদি বলছিল।"

"কী বলছিলেন?"

"অনুযোগ। তুমি যাও না, তাই। যেও কিন্তু।"

"যাবো।"

খানিকক্ষণ থেমে বলল, "সন্ধ্যা…"

"সন্ধ্যা কী?"

হেসে উঠল, "সন্ধ্যা হয়ে গেল তাই বলছি। এবার আমি যাই?"

"না।"

"ওমা, না কেন?"

"আরেকটু বসো।"

"বসে?'

"গল্প।"

"কিসের গল্প?"

"যা খুসী।"

"ও মাগো, যা-খুসীর-গল্প আমি জানি না। তার চেয়ে…"

"বলো?"

"গান গাও না একটা?"

একটু হেসে বললাম, "ঐ অনুরোধ যে আমিও তোমাকে করব ভাবছিলাম।"

"আগে করেছি আমি, আমারই জিত।"

"দুষ্টু!"

ছদ্ম গাম্ভীর্যে মুখ ভার করল মায়া,—"বেশ!"

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রান্নাঘর থেকে,—"খোকা, মায়া, কী করছিস দুটোতে ঘরে? এই নে, আলো নিয়ে যা।"

বললাম, "যাও গো, নিয়ে এসো, অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও আমাকে এবার!"

মায়া সাড়া দিয়ে বলল, "যাচ্ছি মাসীমা।"

উঠে দাঁড়াল। আমি চট করে ওর শিথিল আঁচলটা তুলে দিয়ে কপাল পর্যন্ত ছোট্ট ঘোমটা টেনে দিলাম। সলজ্জ ঝংকারে বলল, "ও কী হচ্ছে!"

"বউ!"

"যাঃ!"

"আয়নাতে দেখ। কী চমৎকারই না দেখাচ্ছে!"

যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটার মধ্যে বিহ্বল মধুর মুখখানি—অপূর্ব! কিন্তু ক্ষণকাল, তারপরেই ঘোমটা খসিয়ে ভিতরে গেল, একটু পরেই নিয়ে এল আলো, রাখল টেবিলে। কাছে এসে বসে বলল, "ধরে তো রাখলে, রাত হলো, পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু।"

"বয়ে গেছে!"

"কী দুষ্টু ছেলে! ও-মাগো! আমি পরের মেয়ে কিনা, তাই কোন দরদ নেই।"

"ওগো পরের মেয়ে!"

"যাও, কথা বলব না।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"কতক্ষণ থাকবে প্রতিজ্ঞা?"

হেসে ফেলল, "কথার ভট্চায্যি একেবারে!"

আমিও হাসলাম।

মায়া বলল, "কমল কোথায়?"

"স্কুলে গেছে কোচিং ক্লাসে, সামনে পরীক্ষা।"

"বাবা?"

"বাবা ডাক্তারখানায়। বাতের বেদনা বেড়েছে।"

"বড্ড ভুগছেন।"

"ভুগতেন না, বড্ড অত্যাচার করেন যে! ঐ অবস্থায় যাবেন ঘুরতে দূরে দূরে। বাড়বে না?"

"বড্ড ভালমানুষ। সত্যি, তোমরা সবাই ভাল। কমল, বাবা, মা সবাই।"

দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললাম, "এ-ই!"

"কী?"

"আমার মাকে তুমি মা বললে!"

কথাটার তাৎপর্য নিমেষে হৃদয়ঙ্গম করেই লজ্জায় মুখ লুকাল। অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "দুদিন বাদে তো বলতেই হবে।"

"বটে!"

"যাও, ভয়ানক দুষ্টু তুমি।"

একটু থেমে বললাম, "মায়া, তোমার কী মনে হয়? অভিভাবক-পক্ষ মত দেবেন তো?"

"একথা কেন?"

"এমনি।"

"আমাদের দিক থেকে আপত্তি নেই।"

"আর আমাদের?"

"তুমি জানো না?"

"না।"

একমুহূর্ত আমার দিকে চোখ রেখে হেসে উঠল, "বোকারাম!"

"মানে?"

"এ-ও বুঝলে না? এই যে আমরা এত মিশছি, এত গল্প করছি, মত না থাকলে মা কি এতটা মিশতে দিতেন? মত আছে বলেই প্রশ্রয় দেন। বুঝলে?"

মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্রের মত আমরা হেসে উঠলাম!

"মায়া!"

"কী?"

"এই দরিদ্রের ঘরে এসে সুখী হবে?"

বলে উঠল, "হয়েছে থাক। দু-চক্ষে দেখতে পারি না ওসব নাটুকেপণা! ওসব কথা বলবে তো কোনদিন আসব না তোমাদের বাড়ী।"

গম্ভীর হয়ে বললাম, "হেসে উড়িয়ে দিও না, কথাটা ভাববার।"

"যার ভাববার গরজ থাকে সে ভাবুক, আমি ভাবব না।"

"আমি গরীব, খুবই গরীব মায়া।"

"আর আমি খুব বড়লোক, না? ফের ঐ সব কথা?" মায়া ছোট্ট চড় তুলল। মেয়েটা কী! গম্ভীর হতে দেবে না একমুহূর্ত!

"সখি?"

"কী?"

"তোমার-আমার গোপন কথা জানল যে লোকে!"

হাস্যতরল কণ্ঠে বলল, "জানলই তো! বাইরে মুখ দেখানো দায়! দুজনে

একটু যে বেড়াতে যাব, তার জো নেই, ঠাট্টার জ্বালায় অস্থির, এমন কি ঐ বৌদিটাও। কতদিন আমরা পদ্মার ধারে বেড়াতে যাই নি, বলো ত?"

বললাম, "কতদিন তোমাকে দেখি নি বলো তো?

"ওমা! সে আবার কি? রোজই তো আসছি।"

"ছাই! এততিল না হেরিলে শতযুগ মনে হয় জানো তো?"

"থামো বিদ্যাপতি-ঠাকুর, থামো! খাঁটি বৈষ্ণব প্রেম!" হেসে উঠল। একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, "প্রেমের ছড়াছড়ি। সিনেমা, বই, সবযায়গাতেই ঐ এক প্রেম আর প্রেম, আর পারি না বাপু!"

ওরই সুরের জের টেনে বললাম, "যা বলেছ। এমন কি জীবনেও।"

"অ্যাঁ! কি বললে?"

"বলছি, তুমিও তো প্রেমে পড়েছ!"

অদ্ভুত রহস্য। প্রগল্‌ভা মেয়েটি এক নিমেষে নববধূর লজ্জায় সংকোচে কণ্টকিত হয়ে উঠে আরো কাছে ঘন হয়ে এসে আমার বাহুমূলে মুখ লুকিয়ে ফেলল, বলল, "যাঃ! বলতে নেই!"

সেই মুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম, জানালার কাছ থেকে একটা ছায়া সরে গেল। বুঝলাম—মা। কিন্তু, এ লুকোচুরি কেন? উঠলাম। টর্চ হাতে মায়াকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এলাম। ওগো মেয়েটা, তুমি সামান্য নও! ফোটে আনন্দ বাহুতে তোমার, ছোটে আনন্দ চরণ চুমি! জানি তো আমার বিচিত্র নাটকীয় জীবনকে। এ জীবনে যে দান তুমি দিলে, তা কী কোনদিনও ভুলবার?

সময়ের কতগুলি বৃহৎ পৃষ্ঠা পার হয়ে যাক। আবার পূজো আসছে ঘুরে। কমল প্রবেশিকার প্রবেশ-দ্বারে, বাবা বাত-ব্যাধিতে প্রায়-পঙ্গু। আমার সামান্য মাইনেতে সংসার-চালানো ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। বাবা ঘুরে বেড়িয়েছেন এধার থেকে ওধারে, হয়ত চেষ্টা করেছেন উপার্জনের, ট্যুইশনি করেছেন দুটো-একটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরীরটাই গেলো ভেঙে। বিছানায় পড়লেন।

দিন চলেছে গড়িয়ে-গড়িয়ে, দরিদ্রের অভাব-খিন্ন দিন। ওদিকে ইয়োরোপের আকাশে অগ্নির স্পর্শ। পোলাণ্ডের ডান্‌জিগ্‌। জার্মানীর হুংকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতির দূরবীণ চোখে লাগিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে-থাকা। এ-ৎ আজ অনেকদিন হয়ে এল। উত্তেজক নাটকের মত দৃশ্যের পর দৃশ্য যাচ্ছে

বদলে ইউরোপের সমর-রঙ্গমঞ্চে। ভূমিকা থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হলো পৃথিবী-ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর।

সেদিন মায়া বলল, "চললাম।"

"তার মানে।"

"একমাসের ছুটি দাও। বৌদির বাপের বাড়ীর দেশে যাচ্ছি সবাই।"

"বেশ তো।"

একটু থেমে বলল, "খুব কষ্ট হবে, না?"

"কষ্ট? না।"

কৌতুকে নেচে উঠল চোখদুটো,—"ভয় নেই গো, চিঠি দেব।"

"দিও।"

"যদি না দিই?"

"ক্ষতি কী? আমি বেশ থাকব।"

আবার হাসল মায়া, "ঠিক বলছ?"

"ঠিকই তো। ভারী তো একমাস, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

কিন্তু দেখতে-দেখতে কাটছে না একটি মাস। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ভারী পা ফেলে চলছে সময়। মায়া নেই, আমার সত্তাও যেন নেই,. একটা বিরাট অবলুপ্তি বলা যেতে পারে। কিছুই ভাল লাগে না। ওর হাসবার ভঙ্গীটুকু, দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকু, ধরতে গেলে এঁকে-বেঁকে-ছুটে পালানোর ভঙ্গীটুকু সবই মধুর মনোরম হয়ে মনের মধ্যে জেগে-জেগে উঠছে।

এরই নাম বিরহ? এই অহরহ ভারমুক্ত দেহটাকে কোনরকমে নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো এদিকে-ওদিকে টেনে নিয়ে বেড়ানো? কাজও করি অফিসে। আঙুলের-ফাঁকে-ধরা কলম ঠিকই হিসাব করে যাচ্ছে, কিন্তু মন নেই, মনের কাছে কালির আঁচড় অস্পষ্ট ঝাপসা।

"হোপলেস্!"—গোসেইন-সাহেব একদিন চিৎকার করে উঠলেন, "এত ভুল হচ্ছে কেন আজকাল?"

ভাল লাগে না। এবং লাগে না বলেই আমার সেই নিস্পৃহ একক মনে অন্ধকারের রহস্য পার হয়ে আসা বিনির্মল প্রভাতের মত ঝলমল করে উঠল কিসের বেদনা? মায়ার? না। এ এক অপূর্ব চির-বেদনার ভার! যা বলা যায় না,-বোঝানো যায় না, বোঝাও যায় না। ঐ যে নৌকাখানি পদ্মার ঢেউয়ে-

ঢেঁউয়ে ভাসতে ভাসতে দূরে কালো বিন্দুর মত মিলিয়ে গেল, ঐ পথেই আ্যস·
বেদনা। আমি কে? এমনও তো হতে পারে, আমি যা, আমি তা নই!···

পূজা সন্নিকট। বন্ধুবর্গের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় সুসমারোহে আয়োজন-পর্ব শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন আমার দরজায় ওঁদের সম্মিলিত আঘাত পড়ল। কী ব্যাপার?

"ও মশাই নিখিল বাবু,"—'কেদার রায়' ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "দায় থেকে উদ্ধার করতে হবে।"

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "দায়! কিসের দায় বলুন তো?"

'শ্রীমন্ত' হাসলেন, "কন্যাদায়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়!"

"অর্থাৎ"—'ঈশা খাঁ' মুখ তুললেন, "এবার সামাজিক বই—একেবারে আধুনিক। কিন্তু ধরলে হবে কী, নাটকের নায়িকা আধুনিক মহিলা সুরমা পলাতক। অর্থাৎ, যে ভদ্রলোককে ভিন্ গাঁ থেকে খোসামোদ করে আনা হয়েছিল, তিনি স্রেফ হাওয়া! এখন এই সুরমার পার্টটা নিতে হবে আপনাকে। না-না, উপায় নেই!···"

"বলছেন কী!"

"নিখিলবাবু"—ভীড়ের মধ্য থেকে অকস্মাৎ বরুণ লাহিড়ী বেরিয়ে এলেন "এ নাটক আমারই লেখা। নাট্যকার-হিসাবে, সর্বোপরি বন্ধু হিসাবে একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি, সুরমার ভূমিকা আপনি না গ্রহণ করলে চলবে না।"

"কিন্তু,—আমাকে—আমি কী—"

"হ্যাঁ, আপনিই,"—বরুণবাবু আমার হাত ধরলেন, "আপনিই পারবেন প্রথমতঃ বেমানান হবে না। দ্বিতীয়তঃ আপনি অনুভূতিশীল, আপনার 'কন্‌সেপসান্' আছে! না করবেন না নিখিলবাবু, আমাদের বাঁচান।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম, সবার মুখ অদ্ভুত উৎকণ্ঠায় ভরে গেছে যেন সামান্য একটা অভিনয়ের ব্যাপার নয়,—তা-ও একরাত্রির জন্য সখের খাতিরে, কিন্তু ওঁদের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন ওঁরা! বিশেষ করে বরুণবাবুর মুখখানি দেখাচ্ছে একেবারে যাকে বলে কাঁদোকাঁদো!

কেমন যেন কৌতুকও হলো, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত মায়াও হলো। বলে উঠলাম,—"আমি রাজী।"

সমস্বরে জয়ধ্বনি উঠল। কিন্তু আমার চোখ পড়েছে এতক্ষণে বরুণবাবু

ওপর। সেই অতি-পরিচিত মানুষটি! অথচ, চোখের কোণে এ কী অপূর্ব জ্যোতিঃকণা!

বললেন,—"মনের দিক দিয়ে আপনি আমার স্বগোত্র। নিখিলবাবু, এ অভিনয় শুধু অভিনয় নয়, পাদপ্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় জনগণের মধ্যে মিশে-যাবার একান্ত আহ্বান, জনসমুদ্রের মন্ত্র-কল্লোল! আপনি অনুভব করবেন, আপনি একা নন, আপনি সহস্র।"

বিপুল আবেগে ওঁর প্রসারিত হাতের মধ্যে হাতখানি এগিয়ে দিলাম। কিন্তু পারব কী?

অভিনয়-রাত্রির কথা। সাজঘরে আমার ওপর রঙ দেওয়া হচ্ছে। সাজের পর সাজ, আর আমি নতুন হচ্ছি, তিলে-তিলে নতুন হচ্ছি। সময় এল। মঞ্চের কোণে ঘণ্টা বাজল। সবার অলক্ষ্যে একবার সাজঘরের বড আয়নাটার সামনে দাঁড়ালাম। এ কী আমি! এ-কে? চুড়ি পরা হাত, কাজল-ছোঁয়ানো চোখ, কপালে কালো টিপ, রক্তিম পাৎলা ঠোঁট। আজানুলম্বিত বেণী, ঝলমল সাটিনের সবুজ ব্লাউজ, রঙীন দামী সাড়ী। আমি নই,—এ মায়া! পিপাসিত বুভুক্ষু নয়ন-মন দিয়ে মায়াকেই দেখছি!

পরের সকালবেলাটাকে ভুলব না। কী বিপুল মাধুরী নিয়েই না এলো পদ্মার ঢেউ। ভুলব না সেই নীল—নীল—ঘন নীল শরতের আকাশটা! অফিসের বদ্ধতার মধ্যে বসে রাশি রাশি হিসাব কষছি। কিন্তু, এ কী অভাবনীয় আনন্দ! আমার মধ্যে বসে কে এক ধ্যাননিমগ্ন পুরুষ আপন মনে হেসে উঠছে,—কাজ দিয়ে আমায় ওরা বাঁধবে, তাহলেই হয়েছে! লিখছি। কে বললে এ বন্ধন—এ নিপীড়ন? পংক্তির পর পংক্তি লিখছি আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছি! কবিগুরুর 'ঋণ-শোধের' উপানন্দ যেন আমি! প্রকৃতির কাছে থেকে পেলাম যে আনন্দ, কর্ম-ব্যস্ততার মধ্য থেকে তারই ঋণশোধ করে চলেছি! এ আমার ঋণশোধ, ছুটি, মুক্তি! সকলেকেই ভাল লাগছে, এমন কি গোসেইন সাহেবকেও। বন্ধুর দল অভিনয়-সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে এলো, ভাল লাগল তাদেরও। টিফিনের সময় আবার সেই ভীড় করে খেতে-বসা। আমি একা নই, আমি সহস্র। সহস্রের সুখ দুঃখ-আনন্দের সঙ্গে আমি সংযুক্ত।

কিন্তু জীবনে প্রকৃতির আনন্দের যে বিপুল দান ক্ষণে-ক্ষণে অনুভব করছি, তার ঋণশোধ হয় কি অত অল্পে? বিনিময়ে ব্যবহারিক জগতে যে মূল্য দিতে

হলো, তা নিতান্তই স্বল্প নয়। সত্যিই আমার উপার্জনে আর চলে না। আর্থিক অনটন আবার প্রখরতর হয়ে দেখা দিল। তার ওপরে কাঁধে এল ঋণের বোঝা।

"শুনছেন বাবু?"—মোড়ের চায়ের দোকানের দোকানদার আমায় একদিন ধরল, "আপনাকে বলব বলব করেও লজ্জায় বলতে পারি না।"

"কী? বলো!"

"বলছিলুম কী!" দোকানদার ঢোঁক গিলল,—"আপনার বাবার নামে আমাদের একটা বিল পড়ে আছে প্রায় বছরখানেক ধরে। তা প্রায় চব্বিশ পঁচিশ টাকা হবে।"

"আমার বাবা! ঠিক বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

পায়ের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শিরশির বয়ে গেল! স্তম্ভিত আমি। এখানে আমরা এক-এক বেলা আধ-পেট খেয়েছি, তবু কোথাও কখনো হাত পাতি নি। শুধু চায়ের দোকান? খাবারের দোকানের লোক, পান-বিড়ি-সিগারেটওয়ালা এবং আরও অনেকে।

বাড়ীতে এসে বলতেই মা একেবারে জ্বলে উঠল, "দূর করে দে—দূর করে দে বাড়ী থেকে। লজ্জাও করে না। মান সম্মান সব ডুবল।"

বাবা বিছানার ওপর উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, "তোমাদের ভাবনার কোন কারণ নেই, আমার দেনা আমিই শোধ করব।"

"কোত্থেকে করবে শুনি?"—মা চীৎকার করে উঠল, "নেই কানাকড়িটি রোজগার করার মুরোদ, তার আবার বড় বড় কথা। কী হতো হাল, যদি না আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসতুম দয়া করে?"

"বাবা?"—আমি বললাম, "একী করেছেন আপনি? আত্মসম্মান বলে জিনিষটাও কি আপনার মধ্যে নেই?"

দুটি অপরাধী ভীরু চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন বাবা, বললেন, "নিখিল, বাবা, রাগ করিস নি। কী করে যেন কী হয়ে যায়। এত ভাবি নিজেকে সামলে নেব, পারি না। সত্যি, লোকে তোর নিন্দা করবে। তোর বাপ..." বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন, তারপরে কিছুক্ষণ পরে বললেন—"অনেক ট্যুইশানি করব। ভাবিস নি। একটু ভাল হয়ে নিই। একেবারে বিছানায় ফেলে দিল রে!"

বাবার কথা শুনতে শুনতে চোখের কোল দুটো আপনিই হঠাৎ ভিজে উঠল। উনি আমার বাবা। কিন্তু বাবার মর্যাদা কী কোনদিন আমরা দিয়েছি ওঁকে? উনি চুপচাপ এ অবহেলা লাঞ্ছনা সয়ে গেছেন! আমরা কেউ কোনদিন ওঁকে সামান্য যত্নও করিনি। মনে হলো উনি নন, প্রকৃত অপরাধী আমি। আমি প্রেমের তরঙ্গে স্বপ্নের স্রোতে ভেসে বেড়িয়েছি, এঁদের দিকে চেয়ে দেখিনি। কী কষ্ট করে মা সংসার চালায় খোঁজ রাখি নি। জিনিষ-পত্রের দাম সাংঘাতিক বেড়ে যাচ্ছে। উপার্জন বাড়াবার চেষ্টা করি নি। বাবা বাতব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, শুয়ে আছেন অসহায় হয়ে বিছানায়। আমি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারি নি। টাকা নেই। কিন্তু যেমন করে হোক, টাকা আমার চাই-ই। বাবাকে ভাল করে তুলতেই হবে। এখানে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওঁকে ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কে দেবে আমায় টাকা? কে করবে সাহায্য?

এমন দিনেই ফিরে এল মায়া। দেখা করলাম না, পালিয়ে পালিয়ে লাগলাম বেড়াতে। কী হবে ওকে এনে এ অভিশপ্ত জীবনে? এ জীবনের পথ বড় কণ্টকময়, বড় দুর্গম। এত কষ্ট ও কী সইতে পারবে? না, থাক, ও যেন আর আসে না।

বরুণবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আজ ওরই বাড়ী অর্থাৎ গোলার দিকে চলেছি। যখন পৌছলাম, তখন বৈকাল। মুক্ত আকাশে রৌদ্র ছিল, কিন্তু হঠাৎ গেল নিভে, পদ্মার বুক থেকে বিরাটকায় দৈত্যের মত কালো মেঘ ছুটে আসছে। টিনের চালা। তারই সামনে পিছনে স্তূপীকৃত কাঠ। মিস্ত্রী মজুররা কাজ ছেড়ে চালার মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। ভিতরে একটি ভদ্রলোক টেবিলের সামনে বসে মোটা হিসাবের বই খুলে অঙ্কপাত করছিলেন, তাঁকেই প্রশ্ন করলাম, "বরুণবাবু কোথায়?"

"কে, বাবু?"—ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, "ভিতরে—বাড়ীতে। ওরে গণেশ, বাবা, এঁকে বাবুর কাছে নিয়ে যা।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কী?"...

"আমি ওঁর কর্মচারী"—ভদ্রলোক বললেন, "কাজ পড়েছে বেজায়, তাই এখনো ওভাটাইম খাটছি।"

বুঝলাম, বরুণবাবু শুধু সরস্বতীর বরপুত্র নয়, লক্ষীরও। কিন্তু কী অদ্ভুত ছদ্মবেশ। শীর্ণ কালো চেহারা, পরনে সাধারণ আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবী।

উনি যে ধনী, উনি যে জ্ঞানী, চেনবার উপায় কই? ওঁর লেখাও দেখলাম, সত্যই সার্থক। সত্যই শক্তির পরিচয় উনি দিয়েছেন।

গোলার পিছনে সুদৃশ্য ছোট্ট বাড়ী। বাইরে থেকে মাধবীলতার ঝাড় ছাদে উঠে গেছে। গণেশ-নামক ভৃত্যটি আমাকে একেবারে ভিতরে নিয়ে গেল। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা সেখানে! একটা ঘরের পর্দা সরিয়ে আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। জানালার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে অদূরের ঝটিকক্ষুব্ধ পদ্মার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন বরুণবাবু। শব্দ হতেই চমকে ফিরে তাকালেন।

"আরে! আসুন, বসুন এই চেয়ারটায়। পদ্মাকে দেখছেন? পাড় ভাঙছে। ওরে গণেশ, রান্নাঘরে ঢোক, চা কর।"

আমাদের আলাপ চলতে লাগলো। এক সময় বললাম, "অন্তঃপুর স্তব্ধ দেখছি। ছেলেমেয়েদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝি!"

হো হো করে হেসে উঠলেন—"আমার বয়সটা কত যে এরই মধ্যে ছেলেমেয়ে? আর তাছাড়া, অন্তঃপুর আমার চিরদিনই স্তব্ধ। সেই কোন-কালে মা-বাপকে হারিয়েছি, এক সম্পর্কিত দাদার বাসায় আগাছার মত মানুষ, বুঝলেন না?"

"বিয়ে করেন নি?"

"ঐ তো বললাম। কেউ নেই। অর্থাৎ বিয়ে দেবার মত লোকও নেই, তা বিয়ে করব কী?"

হাসতে হাসতে কথাটা বলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন,—"তাছাড়া, বিয়ে কোনদিন করবও না। আমার একটা সঙ্কল্প আছে, আমি তারই সাধনা করছি। সেইজন্যই তো এই অর্থোপার্জন। ব্রত-উদ্‌যাপন করতে হলে আমার অনেক টাকা চাই।"

পদ্মার বুক তখন বৃষ্টিতে ঝাপসা। মানুষের এক-একটা সময় এমন আসে, শত চাপা প্রকৃতির হলেও নিজেকে ঢেকে রাখতে পারে না, নিজের অগোচরেই তখনকার বন্ধুর কাছে মনের কবাট খুলে দেয়। আজ বরুণবাবুরও সেই মুহূর্ত।

কথা হচ্ছিল নাটক নিয়ে। দেখলাম নাট্যসাহিত্য বরুণবাবুর প্রাণ। চারিখানি নাটক ইতিমধ্যেই লিখেছেন, পঞ্চমটির নির্মাণকার্য চলেছে। যথার্থ শক্তিশালী প্রগতিশীল নাট্যকার বরুণবাবু, অথচ বাংলাদেশ আজও ওঁকে চেনে না। পাণ্ডুলিপিগুলি ওঁর বাক্সেই পড়ে আছে।

বললেন, "কী বলব নিখিলবাবু, অদ্ভুত যুগটাতেই জন্মেছি আমরা। নিরাশাবাদীদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমাদের বায়ুমণ্ডল ভারী বিষাক্ত করে তুলেছে। নতুন-কিছু করতে, নতুন-কিছু হতে দেখতে ওরা ভয় পায়। দেশ থেকে তারুণ্য যেন বিতাড়িত হতে বসেছে সর্বক্ষেত্রে !···তাই, আমি নিজেই মঞ্চ ব্যবসা গ্রহণ করব কলকাতায় গিয়ে। জরাগ্রস্ত আড়ষ্ট মন নিয়ে যারা পথ আগলে বসে আছে, তাদের হাত থেকে শিল্প পরিবেশনের ভার নিতে হবে আমাদের নিজেদেরই।

বরুণবাবু চুপ করতেই সমস্ত ঘরখানা ধ্যানী সাধকের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরে জানালার পাশ দিয়ে ঝরে চলেছে বৃষ্টি। আকাশের মেঘ তখনো কালিমালিপ্ত। এরই মধ্য থেকে মাঝে মাঝে বজ্র চমকে উঠছে মহেশের ধ্যানভঙ্গকালীন নয়নাগ্নির মত !

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল বরুণবাবুর, একটু হেসে বললেন, "মনের আবেগে অনেক কিছুই বকে গেলাম নিখিলবাবু, হয়ত অপ্রিয় বাক্যও অনেক বকেছি, মনে কিছু করবেন না।"

"না-না, কী যে বলেন !"

"নিখিলবাবু,"—বরুণবাবুর কণ্ঠস্বর আবার গম্ভীর হয়ে গেল, "কতগুলি ব্যক্তিগত কথাও আপনার সঙ্গে ছিল। বলব ?"

"নিশ্চয়ই বলবেন।"

"ভাই,"—বরুণবাবু সস্নেহ মৃদুকণ্ঠে সুরু করলেন, "আপনাকে আত্মার আত্মীয় মনে করি তাই বলছি, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।"

"বলুন বরুণবাবু, আর সংকোচ করছেন কেন ?"

"সংকোচেরই কথা ভাই,"—বরুণবাবু আমার চোখের দিকে তাকালেন, "মায়াকে আপনি ভালবাসেন ? বিয়ে করবেন ওকে, তাই না ?"

অকস্মাৎ এ প্রসঙ্গ উত্থাপনে সংকুচিত হয়ে গেলাম, হঠাৎ-ই উত্তর দিতে পারলাম না, কিন্তু কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল।

সুরু করলেন বরুণবাবু,—"জানি, শিল্পীমন আপনার, প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছেন ওকে। কিন্তু নিখিলবাবু, কী মনে হয় জানেন ? অতি অপাত্রেই বোধ হয় ভালবাসা আপনার ন্যস্ত হলো। বহুদিন থেকে ওদের আমি জানি। অন্য কেউ হলে এত কথা বলতাম না, আপনি বলেই বলছি।

"আপনি মায়ার কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ,"—বরুণবাবু ম্লান হাসলেন, "আপনাকে দুঃখ দিতে হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই। কী জানেন? ও-ধরনের রুজ্‌ লিপ্‌স্টিক-মাখা মেয়েদের আমার ভাল লাগে না!"

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম,—"কিন্তু মায়ার সম্বন্ধেও কি আপনি এ-কথা বলবেন?"

"ও! তাও ত বটে"—বরুণবাবু একটু হাসলেন, "মায়া ওসব আজকাল ত্যাগ করেছে বুঝি। কিন্তু ভাই, বাইরের রঙ্‌ মুছে ফেললেই কী ভেতরের রং মুছে যায়? ওদের পরিবেশটাই আলাদা, আপনার আমার মত সাধারণ লোক কী ওদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে? বিষয়টি ভেবে দেখবেন। রক্তমাংসের জীব আমরা, ভাব-বিলাসিতা নিয়ে কতদিন আর ঘর করব?"

"কিন্তু?"

বরুণবাবু বললেন—"বুঝতে পারছি বেশী বলা আপনাকে উচিত হচ্ছে না। কিন্তু ভাই, ও আপনাকে সুখী করতে পারবে না। এক কথায় বলি, যা দেখছেন, ও সবই ওর ছলনা।"

"ছলনা!"

হাসলেন বরুণবাবু,—"বন্ধু, এ সংসারে কত বিচিত্র লীলাই না ঘটে! মায়াদের দল একটা টাইপ। এবং এই নৈরাশ্য-জীর্ণিত যুগে এ টাইপ হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। সংসার-ধর্মটা এদের কাছে কিছু না, লীলাটাই প্রধান, তাই ছলনা—তাই চাতুরী—আপনি কিছু করবার আগে সবটা ভেবে দেখবেন। মোট কথা, আপনাদের পরিবারের সঙ্গে ওদের খাপ খাবে বলে মনে হয় না। এবং বিয়ের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এটাই ভাল করে বিচার করার দরকার আগে, মনের ভাববিলাসিতাটা পরের কথা। স্বাধীনচেতা বউ আর রক্ষণশীল শাশুড়ী, দ্বন্দ্ব বাধবে সবসময়, আর তার মাঝে পড়ে নায়কের অবস্থা হবে শোচনীয়, প্রেম-মোহ ওসব তখন বাষ্পের মত মিলিয়ে যাবে। বুঝলেন?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

বেশ মনে আছে, এলোমেলো কতগুলি দুর্বিসহ চিন্তার ঝড় নিয়ে সে রাত্রের বৃষ্টি-ভেজা পথ হেঁটে বাড়ী ফিরছিলাম। আমাকে ভালোবেসে ফেলাটা ওর ছলনামাত্র? আমার জীবনের পথে এসে-পড়া অনেকগুলি নারী-মূর্তি একে একে ভেসে গেল চেতনার সম্মুখ দিয়ে। বিপর্যস্ত মানসিকতার মধ্য দিয়ে সে রাত্রি অতিবাহিত হলো। হয়ত কাছাকাছি হয়েছিলাম আমরা দুটি প্রাণী।

কিন্তু মাঝখানে বয়ে গেল হিংস্র কোন নাগিণীর বিষাক্ত নিশ্বাস যেন, তারই তাপেই আজ আমাদের সব কিছু বিবর্ণ ঝলসিত !

কিন্তু এটাই বড কথা নয়। বড় কথা দারিদ্র্য। এই অভাব-খিন্ন সংসারে প্রেমকে আহ্বান করব কোথায় ? ছলনা ? ওরা ছলনাই দেখেছে, কিন্তু আমি দেখেছি ওর প্রাণকে। এ যদি ছলনা হয় তো—এ মধুর ছলনা যেন আমার জীবনে বার বার আসে।

পরদিন। প্রভাত। জানালার বাইরে স্তিমিত মেঘলা আকাশের নীচে স্নিগ্ধ রৌদ্রটির দিকে চেয়ে মনে হলো, এমন সময়ই পিছনের পায়ে-চলা পথটি ধরে মায়া আসত।

কমল বলল, "দাদা, কাল ছিলেন না বাড়ীতে, মায়াদি এসেছিল, অনেকক্ষণ ছিল।"

কোন্ উত্তর দিলাম না। কমল সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে মা এল ঘরের কী টুকিটাকি কাজ নিয়ে, বলল, "দেখ খোকা, তোমাকে জানানো দরকার, তোমরা সব আজকালকার একগুঁয়ে ছেলে, হয়ত আমাদের কথা একেবারেই ঠেলে দেবে !"

"কী কথা ?"

"তোর বিয়ে", মা বলল, "তোর বিয়ে দেবো যত শীগ্‌গির হয়। না বাপু, অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকালেই হবে না, কথাটা বুঝতে হবে। আমি আর একা এতবড় সংসারের ভার বইতে পারি না, আমাকে সাহায্য করার মতও তো একজন দরকার ! কী, চুপ কেন, কথা বল ?"

একটু থেমে বললাম, "বাবা কী বলেন ?"

"তোর বাবা ? হায় ভগবান, তার কি কোন সাধ-আহ্লাদ আছে ? না উৎসাহ আছে ? ও যা করবার আমিই করছি, আর করবার [illegible] !"

আমি চুপ করে রইলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অনেকক্ষণ পরে মা বলল, "তাহলে অমত নেই তো ? আমি বাপু সুশীলকে চিঠি দিয়েছি, আরও অনেককে দিয়েছি অবশ্য !"

"সুশীলমামা কী করবেন !"

"কী করবেন ! অবাক করলি তুই ! কী সে না করেছে, কী সে না করবে ! ভাল সম্বন্ধ দেখবে, আবার কী ! আমি বাপু সুন্দরী একটি ভাল মেয়ে চাই, ও যে-সে কালো-কুচ্ছিত আমার সংসারে বাপু চলবে না !"

"মা!"

"ও কী, চমকে উঠলি যে। পাব না তেমন মেয়ে? কেন রে! আজ অবস্থার ফেরে গরীব হয়ে পড়েছি, কিন্তু নীচু ঘরের লোক আমরা নই, বুঝলি!"

মার অভিজাত রক্ত পুনর্বার ঝলসিত হয়ে উঠল। আমি জানি বিবাহ অসম্ভব—দারিদ্র্যই এর প্রতিবন্ধক। কিন্তু আশ্চর্য, ওর নাম একবারও উচ্চারণ করল না মা! অথচ একদিন মায়েরই তো ইচ্ছা ছিল ওকে এ ঘরে বরণ করে নেবার! জানি, আমার মন আজ বিপর্যস্ত, তবুও মার কাছ থেকে ওর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহের আভাস না পেয়ে মনের কোন নিভৃতে একটি কঠিন আঘাতই এসে পড়ল! মা আবার কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল, তারপরে বলল, "কী, কথা নেই কেন? না বাপু, একটি কথা বলি, ঐ মায়া মেয়েটিকে কিছুতেই আমি ঘরে তুলতে পারব না, ওসব চিন্তা তোমায় ছাড়তে হবে। ওর সম্বন্ধে যা সব শুনলাম, তাতে ওরকম মেয়ের খুরে-খুরে প্রণাম।"

"কী! কী সব শুনেছ!"

"সে অনেক কথা,"—মা ঠোঁট ওলটাল, "মেয়েটী কী ভাল? কীর্তিকাহিনী শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়! সেদিন মান্থুদিদি, ক্ষীরোদাদিদি, ওবাড়ীর রাজলক্ষ্মী, ওরা সব কী বলে গেল?"

"ঠিক বলছ!"

"মা গো মা, মিথ্যে বলব নাকি পেটের ছেলের কাছে! যা না, পাড়ায় জিজ্ঞেস করে আয়, কে কী বলে। না বাপু, ঐ মায়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে কিছুতেই দেব না। আর যদি নিজে বিয়ে করো, আমায় বাপু কাশী পাঠিয়ে দাও, ও বৌ নিয়ে ঘর করতে আমি পারব না। জানি না কী? সবই তো শুনলাম। আমার ছেলেটীকে ওরা সলা করে পর করে দেবে, ওদের চিনি না আমি!..."

হঠাৎ একসময় মনে হলো দরজার কাছ থেকে চকিতে একটি ছায়ামূর্তি সরে গেল। সন্দেহ হতেই উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেলাম। সন্দেহ আমার অমূলক নয়।—মায়া! পায়ে-চলা পথটি ধরে স্খলিত পায়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে!...

শুনেছে, সবই শুনেছে! ওর দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কী হলো রে?"

"কিছু না।"

ইচ্ছা হলো একবার ছুটে যাই ওর কাছে। কিন্তু মা রয়েছে ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে, দরজা আড়াল করে।

চৌকীর ওপর বসে পড়লাম। মনে হলো পা কাঁপছে, এখখুনি পড়ে যাব!—ওগো মেয়েটি, আজ তুমি ব্যথা পেয়েই গেলে। যাও। তোমার সামনে গিয়ে তোমাকে আমি দুর্বল হতে দেব না। তোমার চারিদিকে নিন্দা আর কুৎসার ঝড়, তাই তোমাকে আরও ভাল লাগছে, আরও উজ্জ্বল লাগছে! বুঝতে পারছি তুমি অসাধারণ মেয়ে। তোমাকে ওরা বুঝতে পারে নি, পারবেও না। তোমার অদম্য অফুরাণ প্রাণশক্তি মহত্তর কাজে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক—ঘরের এ ক্ষুদ্র গণ্ডী তোমার জন্য নয়।

ঘটনার স্রোত। কিছুদিন পরেই সুশীলমামার চিঠি এল। উনি উপস্থিত কলকাতায় ছিলেন, সেই ঠিকানা থেকেই চিঠি এসেছে। সম্বন্ধ স্থির। সুন্দরী ধনী কন্যা সংগ্রহ হয়েছে একটি। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে মামা আসছেন, সঙ্গে তাঁর বন্ধু লোকেশবাবু অর্থাৎ আমার ভাবী শ্বশুর!

"আমি ভেবে দেখলাম"—মাকে-লেখা সুশীলমামার চিঠির প্রতিটি অক্ষর জ্বলন্ত অগ্নির মত ভেসে উঠল সামনে, "নিখিলের বিয়ে এখানেই দেওয়া দরকার। লোকেশবাবু ধনী ব্যক্তি, তাঁর ঐ একটিমাত্র মেয়ে, তাঁর জামাই-ই হবে তাঁর সর্বস্ব—তাঁর নিজের ছেলের মত। কী জানেন দিদি, অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে পিছনে একজন উপযুক্ত শক্ত লোক চাই। জামাইবাবু তো ঐরকম, সুতরাং এভাবে কিছু অবলম্বন না পেলে ও উঠবে কী করে? আমার মনে হয়, এ একটা মস্ত সুযোগ, এ সুযোগ ছাড়া আমাদের কোনমতেই উচিত হবে না।"

মনকে প্রস্তুত করে ছিলাম, তবুও চিঠি পেয়ে কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। না, না, আমি পারব না। মনে হলো বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে আমার চারিদিকে। সন্ধ্যায় যখন অদূরে স্টেশনে ট্রেন থামবার শব্দ হলো, কমল গেল স্টেশনে, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার উদ্যোগ করলাম। পলাতক কোন অপরাধী যেন আমি, আমাকে ধরবার জন্য সমস্ত বিশ্বসংসার উন্মুখ উদগ্র হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে! কার অভিশাপে আমার একান্ত স্বপ্ন-সৌধটি ধূলিসাৎ হলো? পারব না। মায়াকে ছাড়া আমার জীবনের হয় না অর্থ!

ছুটে গেলাম ওদের বাড়ী। ওর দাদা ছিলেন না বাড়ী, বৌদি ছিলেন, বললেন—"বসুন।"

বললাম—"বসবো না, মায়াকে একটু ডেকে দেবেন।"

উনি যেন অবাকই হলেন আমার কথায়, বললেন,—"মায়া! কেন বলুন ত?"

"দরকার আছে।"

উনি স্থির দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরলেন! একমুহূর্ত। তারপরেই বললেন—"দেরী হয়ে গেছে।"

প্রশ্ন করলাম,—"কিসের দেরী?"

বললেন—"যে জন্য এসেছেন!"

"কী জন্য এসেছি আপনি জানেন?"

"অনুমান করতে পারি।"

বললাম,—"তাই যদি পেরে থাকেন ত, বুঝতেই পারছেন, এই মুহূর্তে তাকে আমার কত দরকার!"

উনি বললেন,—"অন্ততঃ কাল এলেও হতো।"

"কেন?"

উনি বললেন,—"মায়া আজকের গাড়ীতেই কলকাতা চলে গেছে।"

"চলে গেছে!"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

উনি বললেন,—"এ কেন-র উত্তর দেওয়া শক্ত। চিঠি লিখে রেখে গেছে, আমি চললাম, আমার কোন খোঁজ করো না তোমরা।"

"তারপর?"

উনি বললেন,—"তারপরের খবর বলতে পারব না নিখিলবাবু। ও-মেয়ে যে এইভাবে চলে যাবে, এ আমরা ভাবতেও পারিনি। ওর দাদা ত পাগলের মত হয়ে গেছেন!"

আশ্চর্য শান্ত এক মন নিয়ে আমি সবই শুনে গেলাম। মনটা যেন চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে থেমে গেছে। স্তম্ভিত মন নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলাম। মা বোধহয় আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল দরজায়, কাছে এসে বললে,—"কোথায় গেছলি?"

উত্তর দিলাম না।

মা আরও কাছে সরে এল।

অভাবিত কোমল মার কণ্ঠস্বর, বলল,—"শোন, একটা কথা বলি। এদিকে আয়।"

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল একেবারে রান্নাঘরে, বলল, "কী, হয়েছে কী তোর খুলে বল তো?"

বললাম, "হয়েছে কী তা বোঝ না? কেন এসব বিয়ের হাঙ্গামা করতে গেলে?"

মা তীব্র দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে রইল আমার দিকে, বলল, "একেবারে যে বুঝি নি এমন নয়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হবে না! মায়া মেয়েটাকে আমি কিছুতেই ঘরে তুলতে পারব না!"

"কী সব বলছ তুমি!"—উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, "সে সব কথা নয়। আমি বলছি সুশীলমামার কথা।"

মা ব্যঙ্গভরে বলে উঠল,—"হ্যা, সে তো তোর মহা অনিষ্ট করেছে, ত জানি! কিন্তু এ-বিয়ে তোমাকে করতেই হবে! অত বড় মানীলোক আসছেন আজ বাড়ীতে, তাঁকে কী অপমান করে ফিরিয়ে দিতে চাও?"

"মান-অপমানের চেয়ে বড় কথা, আমার জীবন। ঘরজামাই আমি হতে পারব না শেষপর্যন্ত!"

"ঘরজামাই!"—মা বলে উঠল, "সুশীল অত অবুঝ নয়, সে ভাল বুঝেই এ ব্যবস্থা করেছে। দেখ খোকা, এ যুগে মাথার ওপর কেউ না থাকলে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবি না! ঘরজামাই-টামাই এসব ভাবছিস কেন, তোর একজন শক্ত অভিভাবক হলো, এটা একবার ভেবে দেখ?"

"দেখ, মা—"

শেষ করতে না দিয়েই মা বলল, "ঢের দেখেছি! আর কোন কথা শুনতে চাই না! এই তো তোর চাকরী, তা-ও স্থায়ী কিছু নয়, আর তাছাড়া এই তো মাইনে, এতে কোন ভরসা আছে? দিনকাল কেমন পড়েছে দেখেছিস? জিনিষপত্রের দাম চড়ছে, এই সামান্য আয়ে সংসার চলবে কেমন করে? আর কতদিন এই রকম ঝিয়ের খাটুনী খেটে তোদের সংসার চালাব বল? এসব কথা ভাবতে হবে না? আমার শরীরের দিকে চেয়ে দেখেছিস? তোর বাপের দিকে চেয়ে দেখেছিস? এভাবে চললে আর কয়দিন বাঁচব আমরা! নে, আয়, ঐ বোধহয় ওঁরা এলেন। আয় আমার সঙ্গে. এত ভাবছিস কী? দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে!"

বললাম,—"এখানে একটু বসি।"

"বসবি কী রে?"

বললাম, "হ্যাঁ মা, এইটুকু দয়া করো, একটু চুপচাপ বসে থাকি এখানে। তুমি যাও। আমি পরে যাচ্ছি।"

মা পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল, "দেখিস, আবার পালাস না যেন!"

বললাম, "না, পালাব আর কোথায়!"

কিছুক্ষণ পরে উঠে অবশ্যই ঘরে যেতে হলো।

সুশীলমামা আর লোকেশবাবু। আমি মামাকে গিয়ে প্রণাম করলাম।

"এই যে নিখিলেশ, এসো, এসো। এঁকে প্রণাম করো, আমার বন্ধু, তোমার ভাবীশ্বশুর মিঃ চ্যাটার্জী।...

মামার বন্ধুকে প্রণাম করলাম।

অদূরে বিছানার ওপরে নেতিয়ে পড়ে আছে বাবা। মা এলো। কথাবার্তা চলতে লাগল। মনে হলো, অস্পষ্ট এক একটানা স্রোতের ধ্বনি শুনছি, আর কিছু না; মনে হলো, ঝাপসা কতগুলি বিবর্ণ মূর্তি দেখছি, আর কিছু না।

সুশীলমামা একান্তে ডেকে নিলেন আমাকে, বললেন,—"একি করেছ নিখিল? তোমার বাবার চিকিৎসার একটা ভালো ব্যবস্থা করো নি? টোটকাতে কি এ-সব ভালো হয়? কী কষ্ট উনি পাচ্ছেন বল তো? চোখে দেখা যায় না যে! যা দেখছি,—এ-ভাবে চললে, উনি আর বেশীদিন নেই,— বাঁচবেন না!"

'বাঁচবেন না!'—কথাটা যেন চাবুকের কশার মতো মনে এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের একটা হিমস্রোত সমস্ত শরীর দিয়ে বয়ে গেল যেন! তাঁর কাছ থেকে সরে ছুটে গেলাম ঘরের মধ্যে, বাবার কাছে। আধ-ময়লা সতরঞ্চি, আধ-ময়লা তোসক আর আধ-ময়লা চাদরের ওপরে এলিয়ে পড়ে আছে বাবার শীর্ণ শরীরটা, মুখখানা যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে এখন যেন ভাবলেশহীন একটা তোব্ড়ানো-মোচ্ড়ানো খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে! জেগে আছে শুধু আরক্তিম দুটি চোখ,—কখনো চিন্তায় গভীর, কখনো জিজ্ঞাসায় অস্থির, কখনো আশায় উজ্জ্বল, কখনো নিরাশায় স্তিমিত।

খুব কাছে, ওঁর মুখের কাছটিতে গিয়ে বসে পড়লাম। বলতে চাইলাম,— 'বাবা!'—কিন্তু, কণ্ঠে স্বর ফুটলো না।

উনি বোধহয় বুঝলেন সব-কিছু, ওঁর বিশীর্ণ হাতখানা এসে পড়লো আমার

ওপরে। তারপরে, ধীরে, অনুচ্চকণ্ঠে, প্রায় ফিস্‌ফিসিয়েই বললেন একটি কথা,— Don't submit.

অবাক হলাম কথাটা শুনে। বাবা কী বলতে চাইছেন ? কথাটার তাৎপর্য কী ? মায়াকে-আমাকে নিয়ে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল,—সেসব সংবাদ সবই কি উনি শুনেছেন ? ইঙ্গিতটা কি সেই দিকেই ? তাই যদি হয়, তাহলে, এটাও কি শোনেন নি যে, মায়া চলে গেছে এখান থেকে ? সব সম্পর্ক আমাদের ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ?

"বাবা !"

তেমনি ধীর অনুচ্চকণ্ঠে বললেন,—"কী ?"

আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—"কলকাতায় যেতেই হবে, আপনার চিকিৎসা—"

বাধা দিয়ে বাবা বললেন,—"না-না !"

"কী বলছেন আপনি !"

বাবার শেষের কথাটা বোধহয় একটু জোরের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছিল, নইলে পাশের ঘর থেকে অমন উদ্বিগ্ন হয়েই ছুটে আসবে কেন মা ? এসে বললে,—"কী হয়েছে ?"

—"কিছু না।"

বলে, আমি উঠে এলাম বাবার শিয়র থেকে। পিছন থেকে শুনতে পেলাম, চাপা গলায় মা প্রশ্ন করছে বাবাকে,—"কী মন্ত্র দিচ্ছ ছেলেকে ?"

বাবা চুপ করে রইলেন। মা আবার তেমনি চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো—"তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি সব পারো। ছেলেকে এতো করে মত করাচ্ছি, তুমি পারো যে-কোন মুহূর্তে বিগ্‌ড়ে দিতে।"

বাবা এ-কথার উত্তরেও কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন।

আমি জানতাম, মামাবাবু আর তাঁর বন্ধু, বারান্দায় বসে আছেন দুটি মোড়ার ওপরে। আমি তাই বারান্দায় না গিয়ে এসে দাঁড়ালাম পাশের ঘরখানায়। কাণের কাছে যেন একটা ভোম্‌রা অনবরত গুঞ্জন তুলে ফিরছে,—'Even if I die, you should not submit.'

একটু পরেই সুশীলমামা ঘরে এলেন। বললেন,—"তোমার মায়ের শরীরও ভাল না। ভাইটাকেও পড়াতে হবে। তুমিই বাড়ীর বড় ছেলে। তোমার মাথার ওপরে দায়িত্ব কী কম ? যা-মাইনে পাও. এ-বাজারে তাতে

চলে? চলে না যে, সে তো তোমাদের সংসার দেখেই বুঝতে পারছি। শোন নিখিল, আরও খারাপ দিন আসছে, এতো খারাপ যে, সে তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তাই, অনেক ভেবেচিন্তে আমি এ ব্যবস্থায় হাত দিয়েছি। তোমাব মনের গঠনটা আমি জানি। জানি, এতেও দুঃখ তুমি এড়াতে পারবে না। তবু, পারবে তো তুমি বাঁচাতে তোমার বাবাকে মাকে-ভাইকে? মনে করো, ঐটুকুই তোমার লাভ!"

সেদিন আর কিছু নয়, পরদিন সকালে লোকেশবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। বললেন,—"শুনেছি, পদ্মার ধারটা খুব সুন্দর। আমাকে নিয়ে চলো না একটু, সব দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবে?"

চললাম। যদিও জানতাম, পদ্মাব শোভা দেখাটা ঠিক ওর উদ্দেশ্য নয়। তা-ই হলো। উনি বললেন,—"তুমি বোধহয় জান না, কাল রাত্রে সুশীল তোমার 'বস্' গোঁসাই-এর সঙ্গে দেখা কবেছিল। সে তোমাকে ছেড়ে দেবে। তুমি আজই চাকরীতে ইস্তফা দেবে। বেয়াই-মশায়ের যা অবস্থা দেখলাম, তাতে তাঁকে এই মুহূর্তে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সুচিকিৎসা করানো দরকার। তুমি যতো শীগ্‌গির পারো কলকাতায় চলে এসো। সুশীলও রয়েছে এখন কলকাতায়, এক মাস ওর ছুটি। আজই 'আশীর্বাদ'টা সেরে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ, আজ আমাদের ফিরে যেতে হবেই। অনেক কাজ ফেলে রেখে এ[illegible] ব্যবসার ব্যাপার বোঝ ত? সঙ্গে সঙ্গে লেগে না থাকলে [illegible] জো নেই। যুদ্ধের জন্য ওদিকে কাজ বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে, একা আর সামাল দিতে পারছি না। আমার ঐ একটি মাত্র মেয়ে, ছেলে-ত নেই? তুমিই হবে আমার ছেলে। তোমাকে আমি নিজের হাতে গড়ে তুলবো।"

চপচাপ শুনে গেলাম ওর প্রত্যেকটি কথা, 'হ্যাঁ' 'না'—কিচ্ছু বললাম না। উনি আমার উত্তরের প্রত্যাশাও করলেন না; আমার 'মৌনতা'কে সম্মতি মনে করে একে-একে বলে গেলেন ওঁর ব্যবসার খুঁটিনাটি কথা। যেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই উনি আমাকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে শুরু করলেন।

ওঁর কথা শুনতে শুনতে একটা প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে হতে লাগলো। কাণের কাছে সেই যে 'ভোমরা'টা অনবরত গুন্‌গুন্ করে ফিরছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে মনে-মনে তার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলাম। বললাম,—"কাকে বলছো **submission**? কাকে বলছো নতি স্বীকার? প্রতিদিনের এই দারিদ্র্য আর চাকরীর লাঞ্ছনা,—এর বিরুদ্ধে যদি দাঁড়াই, যদি হঠাৎ-এসে-পড়া এই

সৌভাগ্যের সব সৌরভটুকুই হাত পেতে নেই, তাহলে কি সেটা হবে আমার নতি স্বীকার, আমার পরাজয় ?

রাত্রে, আমার শিয়রের কাছে বসে মা-ও সেদিন অনুরূপ কথাই বল্‌ছিল। ওঁরা আমাকে যথারীতি 'আশীর্বাদ' করে চলে গেছেন। আশীর্বাদের সেই 'স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়ক' আমার অনামিকায় জ্বলজ্বল্‌ করে জ্বলছে। আর, মায়ের বাক্সের এক কোণে পুঞ্জিত হয়ে আছে সুশীলমামার দেওয়া একতাড়া নোট।

আমার হাতেই দিয়েছিলেন গুঁজে।

সবিস্ময়ে বলেছিলাম,—"এ কী !"

বলেছিলেন,—"রাখো তুমি। দরকার হবে। না হে না, অন্য কিছু নয়, ধার হিসাবেই দিলাম, শোধ দিও।"

সেই রাত্রে, ও-ঘরে বাবা ঘুমোচ্ছেন হয়ত। এইসব যে অনুষ্ঠান হয়ে গেল, বাবা সে-সম্পর্কে একটি কথাও আর বলেন নি। বাধাও দেন নি, স্বপক্ষেও কিছু বলেন নি। মা আমার শিয়রে বসে কথা বলছে, খাটের ওপাশে কমল ঘুমিয়ে আছে, বাবার ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দই আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মা বলে চলেছে,—"সারা জীবন আর কত কষ্ট করব বল? এই যে জিনিষটা হতে চলেছে, এটা তোর 'ভাগ্য' বলেই মেনে নে। নইলে, কোথায় ছিস, অমন মানী লোক ছুটে এসে আমাদের মত গরীব ঘরে মেয়ে দিতে বলে, সুশীলের কাছে শুনলাম, সে মেয়েও ফ্যাল্‌না নয়! রীতিমত পড়াশুনো করে, দেখতে-শুনতে—সুন্দরী। বাপের একমাত্র মেয়ে।"

বলে উঠলাম,—"মা ?"

"কী ?"

"এটা একটা আশ্চর্য কাণ্ড নয় ?"

"কোন্‌টা ?"

"এই যে, যেটা হতে চলেছে ? এতো লোক থাকতে, আমার মতো গরীব, আমার মতো সামান্য—"

বাধা দিয়ে মা বলে উঠলো,—"ঐ যে বললাম,—ভাগ্য ? ভাগ্য ছাড়া আর কী ? যদিও সুশীলের বন্ধু, সুশীলের কাছ থেকে আমাদের সব কথাই শুনেছে, তবু এটা একটু অবাক হবার মতই ব্যাপার। ভাগ্য ছাড়া আর একে কী বলব, বল ?"

মা একটু পরেই চলে গেল। আর, আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে নামল

অজস্র চিন্তার স্রোতধারা! মায়ার কথাই মনে পড়ল সবার আগে। কেন তুমি এমন করে চলে গেলে? চলে গেলে কি এইজন্য, যে যাতে করে আমায় সৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করার পথ বিঘ্নবিহীন হয়, কুসুমাস্তীর্ণ হয়? যাতে আমি তোমাকে ভুল বুঝি, এমন একটা বিভ্রম সৃষ্টি করাই কি তোমার উদ্দেশ্য? এ বিভ্রম জাল অপসারিত করে তবে কি তোমাকে একদিন পাবার আশা আছে? আমার বাবা কি দূর থেকে সেটা লক্ষ্য করেই আমাকে 'নতি স্বীকার' করতে বারণ করছেন? বলছেন,—

কিন্তু, যদি এটা নিছক প্রেমের ক্ষেত্রই হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে 'বিজয়ী' দেখে, বাবার কী লাভ? আমি দারিদ্রের বিনিময়ে যদি 'প্রেম' লাভ করি, তাতে বাবার আত্মপ্রসাদ কিসের, যা তিনি মৃত্যুর বিনিময়ে পর্যন্ত পেতে চাইছেন?

ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ আমার চোখের সামনের অন্ধকার থেকে অতীতের একটি অধ্যায় আলোর মতো ভেসে উঠলো। আলো-অন্ধকার-ঘেরা রান্নাঘরের মেঝের ওপরে পড়ে আছেন হাত-বাঁধা পা-বাঁধা, কপাল কেটে রক্ত ঝরছে,— বাবার পাঠানো কাগজপত্রগুলো ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। গৌরী অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো ঐ দৃশ্য দেখে। আমরা দুজনে তার বাঁধন খুলে দিলাম। তিনি উঠে বসলেন, কপালের রক্তধারা মুছে বললেন,— বাড়ীতে ফিরে গিয়ে এসব কথা বলো না, বাবা!

আবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি ছবি ভেসে উঠলো,—গৌরীর বিয়ের পরের একটা দিনের ঘটনা। আমার লেখা চিঠিখানা গৌরী টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে সিঁড়ির কোণে! আর, সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন চিঠি দেখে আমার বুকের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ডটা বোধহয় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে! শরীরের সমস্ত রক্ত-কণিকা বুঝি তারস্বরে চীৎকার করে উঠে বলেছিল,—আমরা থামলুম, আমরা আর চলবো না!

কিন্তু, তবু ত চলতে হয়েছিল! 'সময়' বললে,—আমার রাজ্যে 'থামা' বলে কোন কথা নেই, শুধু চলা আর চলা, এগিয়ে চলা। যে পড়ে গেছে সে পড়ে থাক, তুমি এগিয়ে চলো, কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলাই তোমার ধর্ম; শরীর চলবে জরার দিকে—সমাপ্তির দিকে, মন চলবে,— বিকাশের দিকে, ব্যাপ্তির দিকে। আকাশের দিকে তাকাও। কতো অসংখ্য গ্রহ আর নক্ষত্র অনন্তর বুকে ফুলের মতো ফুটে আছে। যতদূর কল্প-

করতে পারো, ততদূর কল্পনার সুযোগ দেবে অনন্ত ঐ আকাশ। আকাশের বহস্যের সঙ্গে তুলনা করতে করতে মনকে এগিয়ে নিয়ে চলো, দিনে-দিনে বুঝতে পারবে,—ব্যাপ্তির প্রশান্তি কাকে বলে!

কিন্তু ডানা-ভাঙা পাখীর মতো যখন ফিরে আসতে হয় মাটির কোলে? তখন, কাছের তুচ্ছ বস্তুও ভয়ানক বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

তাই বুঝি সেই ছিন্ন পত্রাংশের স্মৃতির দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে মনটা আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলো! প্রফুল্লবাবুর বাড়ী ফিরে গিয়ে রান্নাঘরে বসে বাণী-পিসীর সেই যে একমনে ছোট ছোট ময়দার লুচি তৈরী করা,—সেটা মনে পড়তেই বাবার ওপরে একটা অদ্ভুত ক্রোধ অনুভব করলাম। মনে-মনে বললাম,—আমার প্রেমের সার্থকতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান আপনি? হবে না—কিছুতেই তা হবে না। যা হতে যাচ্ছে, কে বলে একে 'নতি স্বীকার?' এ-আমার প্রাপ্তি, এ-আমার সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখর! গৌরী যাক, মায়া যাক,—প্রেমের থেকে জীবনের দাবী অনেক—অনেক বড় আমার কাছে!

তা-ই হলো। আপন চিন্তার সম্মোহে আপনিই মোহমুগ্ধ হয়ে মায়ের নির্দেশ পালন করে চলেছি! কমলের প্রবেশিকা পরীক্ষাও শেষ হলো। আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো আমাদের পরিবার। আবার ট্রেণ, আবার কলকাতা! মায়ের উল্লাস ধরে না আর! আজ এতদিন পরে ঘুচলো বুঝি আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের অভাব-খিন্ন দিন! ইয়োরোপে তখন সমরানল প্রচুর আয়োজনে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় ।

আমাদের মন দিয়ে সেদিনকার সেই মনোভাবকে হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে হাসিই এসে পড়ে ঠোঁটের কোণে। আমার সারা জীবনের নীরব সংগ্রাম কী সামান্য সংকীর্ণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেই না এসে দাঁড়িয়েছিল! সময়ের কথা আজ পরিষ্কার বুঝতে পারি। দারিদ্রকে পূর্ণ সম্মান দেইনি, হয়ত মায়ের বিক্ষোভের প্রতিচ্ছায়া এটা! কিন্তু, বাবার বৈরাগীমূর্তিও ত সামনে ছিল! ভুল করেছি বাবাকে বুঝতে চেষ্টা না করে। এবং সেইজন্যই, দারিদ্রকে অপরাধ বলে জেনে এসেছিল আমার অবচেতন মন, অর্থের ক্ষেত্রে এসে এই মনই প্রশ্রয় পেয়েছিল। প্রাচুর্যের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, তাই প্রাচুর্যের লোভই বিষবৃক্ষের বীজ হয়ে মনের কোণে রোপিত ছিল। একদিন যে অনুকূল হাওয়ায় এই বিষ ডালপালা মেলে তার প্রখর অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করবে, তার আশ্চর্য কী? মানুষের ট্র্যাজেডি ত এইখানে! কিন্তু থাক, যা বলছিলাম, তা-ই বলি।

বিবাহ-বাসরের ঘটনা এতই সাধারণ যে, তার ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও আজ মনে পড়ে না। বিয়েবাড়ীর ভীড যেমন হয়, তেমনি অস্পষ্ট একটি ভীড়ের ছবি শুধু মনে আনতে পারি, আর কিছু না। শুধু নিজের কথাটা মনে আছে। যেন অসাড হয়ে আছে সমস্ত চেতনা, যেন যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মতো ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে; সে বাজিয়ে চলেছে আমাকে ক্রমাগত, আর আমি বেজে চলেছি। সব মিলিয়ে একটা সুর উঠছে, এই পর্যন্ত। তবু, ফুলশয্যার রাত্রের একটি ঘটনা, কেন জানি না, অদ্ভুত দাগ কেটে গেছে মনে; অনেককিছু ভুলে গেছি, শুধু সেইটুকু না।

শ্রান্ত দেহ-মন নিয়ে বিছানায় এসে শুয়েছি, ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নীল আলো কে যেন জ্বেলে দিয়ে গেছে, আর শিয়রের কাছে রেখে গেছে কয়েক স্তবক রজনীগন্ধা! তন্দ্রা এসেছিল চোখে। তন্দ্রা কেন, ঘুম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠলাম হঠাৎ-ই, জোর একটা বাতাসের ঝাপটা পেয়ে। ঘুমের মধ্যেই মনে হচ্ছিল, যেন ঝড় উঠেছে অকস্মাৎ—প্রবল ঝড! রাত তখন নিশ্চয়ই গভীর, কারণ, বাড়ীর সব কোলাহল থেমে গেছে, সানাই কেঁদে কেঁদে বহুক্ষণ হলো চুপ করেছে, নিঃঝুম নিস্তব্ধ চারিদিক।

পরক্ষণেই বুঝলাম, ঝড়ের কারণটা কী। শিয়রের কাছে টেবিলের ওপরে যে টেবিল-ফ্যানটা ছিল, সেটি এসে কেউ বুঝি খুলে দিয়েছে। পূর্ণ বেগেই ঘুরতে দেওয়া হয়েছে সেটাকে,—আর তাই হঠাৎ জেগে উঠেছে বাতাসের প্রবল ঝাপটা আর সোঁ-সোঁ শব্দ! যন্ত্রে কোন ত্রুটি ছিল কিনা মনে নেই, কিন্তু, সত্যিই কেমন যেন একটা অদ্ভুত শব্দ উঠছিল পাখাটায়। কিন্তু এ-ঝড়ের সৃষ্টি করলো কে,—হঠাৎ?

তাকিয়ে দেখি, নবপরিণীতা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোহার শিকগুলো দুহাতে চেপে, আকাশের দিকে মুখ করে। ঘোমটাটা হয়ত বাতাসেই খুলে গেছে, আমি তাই তার সযত্নরচিত সূক্ষ্মজালে ঘেরা বেণীটি দেখতে পেলাম। খাটের ওপর উঠে বসেছি ততক্ষণে, বললাম,—ফ্যানটা তুমিই খুলে দিয়েছ বুঝি? সত্যি খুব গরম হচ্ছিল।—কোন উত্তর নেই। উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। ঠিক সেইভাবে শক্ত হাতে লোহার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আবছা আলোয় অদ্ভুত লাগছিল ওর উপস্থিতি, অশরীরী ছায়ার মত, যেন হাত দিলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে!

বললাম, "কতক্ষণ এসেছ? অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, না?"

এবারেও নিরুত্তর। লজ্জাই হবে হয়তো। বললাম, "রাত অনেক, শোবে না?"

এইবার কথা বলল, কেমন ফিসফিস-করা অস্ফুট কণ্ঠস্বর, বলল, "আপনি শোন গিয়ে।"

"কিন্তু তুমি?"

"পরে যাচ্ছি। আপনি যান।"

সরে এলাম। রজনীগন্ধার সৌরভে সমস্ত ঘরটা ভরে গেছে, দু-একটি ফুল হাতে করে নিয়ে এলাম তুলে, বললাম, "ফুল নেবে? কী সুন্দর গন্ধ

দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে পাতল আমার সামনে ভিক্ষার্থিনীর মত, বলল, "দিন।" আমি হাতে না দিয়ে ফুল দিলাম খোঁপায় গুঁজে। এইবার এতক্ষণ পরে মুখ তুলল, একটু যেন হাসিও ছুঁয়ে গেল পাতলা দুটি ঠোঁটের ওপর দিয়ে, তারপরে ফিরে এলো বিছানার কাছে। বললাম, "কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখ, আলোটা নিভিয়ে দিই?" আলো নিভিয়ে দিতেই চাপা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল ঘর। বিছানায় বসে জানালা দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না, দেয়ালের আড়ালে পড়েছে বুঝি, কিন্তু আলো তার অবারিত!

নববধূ ঘোমটা তুলে দিয়েছে আবার, খাটের কোণে মাথা নীচু করে বসে আছে চুপচাপ বিবাহ-বাসরে সম্প্রদানের কন্যার মত। ওর পাশে বসে আস্তে একখানা হাত রাখলাম ওঁর কাঁধের ওপর, কিন্তু সে আকস্মিক স্পর্শে ও যেন শিউরে উঠল!

বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণে, ক্রিয়াকলাপে, পরিবেশে যাদু আছে, একথা অনস্বীকার্য। সেই যাদুই সে রাত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল আমার মনে। সমস্ত ক্লিষ্টভাব মুহূর্তে মুছে গিয়েছিল মন থেকে। রজনীগন্ধা, চাঁদের আলো আর মোহময় স্তব্ধ রাত! নববধূকে ধীরে ধীরে টেনে নিলাম কাছে, চিবুক ছুঁয়ে উঁচু করে ধরতে গেলাম মুখখানা! বধূ বারবার মুখ লুকাতে লাগল, আমি বারবার মুখখানা ফেরাতে লাগলাম আমার দিকে। কিন্তু হঠাৎ একসময় চমকে সরিয়ে নিলাম হাত। বললাম, "এ কী, কাঁদছ!"

কান্নার উচ্ছ্বাসে এইবার ভেঙে পড়ল সুনন্দা, দুহাতে মুখ ঢেকে কোনক্রমে বলে উঠল, "আমি তোমার এ আদরের যোগ্য নই! ক্ষমা করো—ক্ষমা করো!"

সুকঠিন বিস্ময়! বললাম, "কিছুই বুঝতে পারছি না! কাঁদছ কেন তুমি?"

উত্তর দিল না। তারপরে ধীরে ধীরে থেমে গেল তার কান্না, রাত্রি শেষের দিকে আমরা দুজনে বিছানার দুটি কোণে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। ওর গলায় ফুলের মালা ছিল, সেটা ছিঁড়ে ফুলগুলি বিছানার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ওদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ক্রমে পাখীর ডাক শোনা গেল, ভোর আসন্ন, আমি উঠে গেলাম ঘর থেকে।

তবু, বিবাহের প্রথম কয়েকটা দিন সদ্য-ফোটা ফুলের মতই বর্ণ-গন্ধের আনন্দে কেটে গেল, কিন্তু একদিন এল ঝরার পালা। মোহের আমেজ মিলিয়ে গিয়ে জেগে উঠল মধ্যাহ্ন-সূর্য। তারই প্রখর আলোয় ফাঁকি ধরা পড়ল! শূন্য মনে ধীরে ধীরে ছবি ফুটে উঠতে লাগল আরেকজনের, অস্বীকার করতে পারি না,—ওর পাশে শুয়ে মনে পড়ত মায়াকে।

আজ এতদিন পরে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা মনে হচ্ছে। সেটা এই,—নারীর পুরুষজয়ের অভিযানের ক্ষেত্রে শুধু লাস্য নয়, সেবারও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই সেবাবৃত্তি সুনন্দার ছিল না। কিংবা হয়ত ছিল, ধনীর দুলালী তার সঠিক ব্যবহার তখন জানত না। ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা এলো আমার মনে, এবং আজ মনে হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় সুনন্দার মনে জাগল নিদারুণ কঠোরতা! দুজনের প্রতিদিনের ব্যবহার দুজনকে প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, আমরা

কেউ কাউকে চাই না। সন্তান এলো আমাদের মধ্যে, কিন্তু সে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব থেকেই দ্বন্দ্ব জেগেছে দাম্পত্য জীবনে, তাই আর জীবনে যেন স্নিগ্ধতা এলো না। যত দিন যেতে লাগল, যত আঘাত আসতে লাগল ওর দিক থেকে, ততই গভীর করে মনে মনে বসে যেতে লাগল ওর সেই ফুলশয্যা-রজনীর কান্নার কাহিনীটা। সত্য কোনটা, সে রাত্রের সেই চোখের জলে ক্ষমা-প্রার্থনা করা, না, পরবর্তী দিনের এইসব কঠোরতা?

এ-কথা এত করেও ভেবে পাই না। আমরা দুজন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন পরিবেষ্টনীর মানুষ, আমাদের দুজনকে একসূত্রে গাঁথল কে? ভাগ্য-বিড়ম্বিত দরিদ্র আমি, দিন কাটাচ্ছিলাম পদ্মাতীরের অখ্যাত এক জনপদে, আমার ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কেমন করে ঘটল আমার শ্বশুরের? তাঁর আধুনিকা শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যার যোগ্যতর পাত্রের নিশ্চয়ই অভাব ছিল না!

মা বলে,—ভাগ্য।

কিন্তু, 'ভাগ্য' বলে আমি যদি মানতে না পারি? আমি যদি 'যুক্তি' খুঁজি? উত্তর পাই না। আর পাই না বলে, মনটা আরও অস্থির হয়ে ওঠে। কথাটা কি কোনদিন হয়নি সুনন্দার সঙ্গে?

হয়েছিল। কথাটা শুনে ও হাসত, বলত,—"কী সন্দেহ করো? ভ্রষ্টা মেয়ে, বাবা তাই ভয় পেয়ে যার-তার হাতে সঁপে দিয়েছে মা-মরা মেয়েটাকে?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠতাম লজ্জা পেয়ে,—"না-না, তা কেন?"

"তবে?"

"তবে আবার কী? কিছু না।"

ও হেসে ফেলত। বলতো,—"তোমার ভাগ্য। আমারও ভাগ্য। সবই ভাগ্যের খেলা।"

তরলকণ্ঠে আমিও বলতাম,—"হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। একজনের 'সৌ', আরেকজনের 'দুর্', তাই না? আমার 'সৌভাগ্য', তোমার 'দুর্ভাগ্য'!"

ও বলতো—"অতো রিয়ালিস্টিক্ কথা বলতে নেই।"

কিন্তু, যা বলছিলাম। আমার বিবাহ-লগ্নের পরে প্রায় আড়াই বছর কেটে গেছে। আমি ইংরাজী ১৯৪২ সালের কথা বলছি। বাবা দীর্ঘদিন একটা নার্সিং হোমে শুয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে একদিন সেরেও উঠলেন তিনি। অর্থাৎ, বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে যে সমস্যার উদয় হয়েছিল, তার নিরসন ঘটেছে।

যুদ্ধের গাঢ় কালো ছায়া তখন এ-দেশের প্রতি নগরে-নগরে, গ্রামে গ্রামে, পথে-পথে এসে পড়েছে! অফিসের কেরাণী, কারখানার মজুর থেকে শুরু করে সামান্য কাষ্ঠ ব্যবসায়ী পর্যন্ত যুদ্ধ করছে।

বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটির মোটা অংশের মালিক এবং সর্বময় কর্তা আমার শ্বশুর মিঃ চ্যাটার্জী সম্প্রতি বোম্বেতে তাঁর অফিস খুলেছেন। দুই বৎসর ধরে তাঁর জামাতাকে ক্রমাগত শিখিয়ে পড়িয়ে শক্ত করে সম্প্রতি বোম্বে গেছেন, সেইখান থেকে আবশ্যকমত ডাকযোগে তাঁর নির্দেশ আসে, যুদ্ধের সুযোগে প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার স্ফীতিলাভ, এই-ই তাঁর একমাত্র কামনা ও প্রচেষ্টা। তাঁর বোম্বে যাত্রার পূর্বে তাঁর কন্যা সুনন্দা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—"এত বড দায়িত্ব ওর ওপর দিয়ে যাচ্ছ বাবা, ও কি পারবে?"

লোকেশবাবু স্বল্পভাষী। গলার টাইয়ের বাঁধনটা শক্ত করে চোখের চশমাটা ঠিক করে বসিয়ে মেয়ের দিকে একটু তাকালেন, তারপর সংক্ষেপে শুধু বললেন, "পারবে।"

সেদিন রাত অনেক। অফিস-ঘরে স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে একা বসে তখনো জরুরী কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করছি।

অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলে আমার হিসাব সুরু করেছি, চলেছে অঙ্কপাত।

অঙ্ক কষছি। জীবনের লাভ-লোকসান নিয়ে সূক্ষ্ম দার্শনিকতা নয়, ভাবুকতাও নয়, নিছক বাস্তবের দাবীকে মেটানো। হয়ত আমার পক্ষে এ কাজ সহজ না, তবু আমি পারব, লক্ষ্মী তাঁর স্বর্ণ-পদ্মের পাঁপড়ি খসিয়ে আমার হাতে তুলে দেন নি সত্যি, কিন্তু আমি তা জোর করে ছিঁড়ে আনব; সুনন্দাকে বলব, আমি অযোগ্য নই, এ ধনতান্ত্রিক পৃথিবীরও না, তোমারও না। বিষয়-বুদ্ধির [illegible] আরও শাণিত আরও তীক্ষ্ণ করতে হবে, আমি জয়ী হব!

কাজ অনেক। শুধু অফিস নয়, শুধু শ্বশুরের ব্যবসা-বৃদ্ধি নয়, নিজেরও পুঁজি চাই! তাই অক্লান্ত খাটছি। এক দালাল এসেছে পাঁচ টন লোহা-লক্কড়ের সন্ধান নিয়ে। কাল ওগুলো হাত করতে হবে, রাখতে হবে গুদামে লুকিয়ে, তারপরে যুদ্ধদিনের কালোবাজারে সুযোগ বুঝে করব বিক্রী, আসবে চতুর্গুণ টাকা।

টাকা-টাকা-টাকা!

দুর্নিবার দুর্দম নেশায় আমি মাতাল।

অনেক রাত। ফাইল ঠেলে রেখে উঠলাম, বন্ধ হলো অফিস-ঘর। ঘরের সামনেই ফালি বারান্দা লম্বা চলে গেছে। এ বাড়ীর অনেক-কালের বুড়ো দরোয়ানটা দরজার কাছে বসে ঢুলছিল, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল। তাকে অতিক্রম করে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম!···

উঠানের প্রান্তে খোলা কলকাতা। চাকর-বাকররাই ব্যবহার করে। হঠাৎ কাণে শব্দ এলো—জল পড়ছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, কে একটি ছায়ামূর্তি স্নান করছে, ওখানকার আলোটা নেভানো বলে অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না লোকটি কে! আশ্চর্য, এত রাত্রে এখন কে-ই বা স্নান করছে? কোন দিকে আমার লক্ষ্য থাকে না, কাজে ডুবে থাকি। কিন্তু যখন লক্ষ্যে পড়ে, তখন খুঁটিনাটিও আমার চোখ এড়ায় না। হেঁকে বললাম, "কে ওখানে?

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছিল, থমকে দাঁড়াল।

"কে?"

আস্তে উত্তর এল, "আমি।"

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "কে বাবা?"

"হ্যাঁ।"

ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালেন। খাটো গামছা-পরা, খালি গা। আরেকটা গামছায় গা মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন।

"স্নান করছিলেন? এত রাত্রে!—তা ওপরে বাথরুমে গেলেই পারেন?"

হেসে বললেন,—"তাতে কী হয়েছে! তুমি ওপরে যাচ্ছিলে যাও।"

বলতে বলতে কোণার একটি ঘরে ঢুকে পড়লেন। পিছনে-পিছনে আমিও গেলাম, "এই ঘরে আপনি থাকেন?"

"থাকিই তো!"

"ছিঃ!"

তাকিয়ে দেখলাম। একটা তক্তপোষের ওপর আধময়লা বিছানা। দেয়ালের আলনায় অগোছালো জামাকাপড়। একটা পুরানো অব্যবহার্য টেবিলে কতগুলি টুকিটাকী জিনিষ, ঘরের কোণে কতগুলি ময়লা কাপড় জড়ো-করা, ঘরের মেঝে অপরিষ্কার, এদিক-ওদিকে অজস্র দেশলাই কাঠি আর বিড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে একযায়গায় পিঁড়ি পেতে বোধহয় ওঁর খাবারটাই সামনে একটা পেতলের ডেক্চি দিয়ে ঢাকা-দেওয়া রয়েছে।

খানিকক্ষণ থমকে থেমে থেকে বললাম,—"এভাবে থাকেন আপনি! অথচ, ওরা কেউ দেখে না!"

এবারও তেমনি হাসলেন, বললেন, "আমার এই বেশ। এতেই বেশ থাকি।"

উনি ততক্ষণে গামছা ছেড়ে ধুতি পরে খাবারের সামনে বসেছেন। আরও কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপরে একটি কথাও না বলে চলে এলাম ওপরে।

ওপরের ঘরে ঘরে আলো গেছে নিভে। শুধু দক্ষিণ-প্রান্তের ঘরখানার খোলা দরজাটা দিয়ে এক-ঝলক আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। হ্যাঁ, ওইটাই, আমার ঘর। আশ্চর্য, সুনন্দা এখনও জেগে? ছেলেটা কাঁদছে বোধহয়। সত্যিই কাঁদছে। দূর থেকে কচিকণ্ঠের কান্না শুনতে পাচ্ছি।

আমারই ঘরের দরজার কাছে এসে আমার জুতোর মস্‌মসানি থামল! কিন্তু ঘরে ঘরণী নেই, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বুড়ী ঝি শান্ত করার চেষ্টা করছে। পাশেই ছোট্ট স্টোভে দুধ গরম হচ্ছে, কাছেই খালি ফিডিং-বটল্‌-টা।

"ওর মা কোথায়? বাথরুমে?"

"না।"

"তবে?"

বুড়ী উত্তর দিল, "দিদিমণি সিনেমায় গেছেন।"

সিনেমায়! এতরাত্রে!…"কখন গেছে?"

"প্রায় নটার সময়।"

"তাহলেও তো এতক্ষণে ফেরবার কথা। ন টার শো এখন নিশ্চয় ভেঙেছে। কোন্‌ সিনেমায় গেছে?"

"কে জানে!"

"কার সঙ্গে গেছে জানো?"

শ্বশুরের আমলের অনেকদিনকার ঝি এই বুড়ী, বলল, "জানি।"

"জানো তো, বলই না।"

"অজিতদাদাবাবুর সঙ্গে।"

অজিতদাদাবাবু! অজিতবাবু কে? আর প্রশ্ন করলাম না। ভিতরটা যেন হঠাৎ আগুনের প্রখর তাপে পুড়ে যাচ্ছে, মনে হল। নিশ্চুপে জামা-কাপড় বদলাতে লাগলাম।

"ও কাঁদছে কেন ?"

ঝি বলল, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

"মা কোথায় ?"

ঝি আমার মুখের দিকে তাকাল।

চেঁচিয়ে উঠলাম, "আমার মা। আমার মা কোথায় ?"

"মা-ঠাকরুণ ?" ঝি বলল, "তিনি শুয়ে পড়েছেন। এই তো কিছুক্ষণ হলো পূজোর ঘর থেকে নামলেন, আজ তাঁর আবার একটা উপোষ ছিল কিনা।"

"হুঁ।"

এ সংবাদ জানি। ধর্মে-কর্মে মার উৎসাহ প্রবলতর হয়ে উঠেছে। কিছু-দিন পূর্বেই মহাসমারোহে দীক্ষা-গ্রহণ হয়ে গেল। তেতলার ছোট্ট ঘরখানায় পটস্থাপনা, এবং নিত্য নৈবেদ্য ও ফুলের টাট কয়েকবার আমারও লক্ষ্যে পড়েছে।

"তারপর, কমল ঘুমিয়ে পড়েছে, বলতে পার ?"

ঝি আবার আমার মুখের দিকে তাকাল।

জলে উঠলাম, "দূর ছাই, কিছু বোঝ না !…কমল…কমল…তোমাদের ছোট্ট দাদাবাবু !…"

"তিনি ?" এতক্ষণে উত্তর এল, "তিনি তো পড়ছিলেন, এইমাত্র দরজা বন্ধ করে ঘুমুলেন।"

"ও।"

কমল আই-এস্-সি পড়ছে। পরীক্ষা ওর সামনে। সুতরাং, পড়া নিয়ে ও ব্যস্ত, এ খবরও আমার জানা।

"ওকে আমার কাছে দাও।"

বোকার মত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ী ঝি, যেন আমার প্রশ্নটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে ! জলে উঠে বললাম, "হাঁ করে দেখছ কী ? শান্ত করো ওকে।"

সরে গেলাম। বাথরুম। খাবার-ঘর। শ্বেতপাথরের ঈষৎ লম্বা টেবিল, এক প্রান্তে খাবার ঢাকা। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বসে খাওয়া শেষ করলাম। চুপচাপ নিঃঝুম বাড়ীটা, বাচ্চাটাও কান্না বন্ধ করেছে। কিছুক্ষণ আগে দরজায় একটা শব্দ পেয়েছিলাম, এখন সব চুপ। মনের মধ্যে তখন কিসের আলোড়ন

চলছিল কে জানে, হঠাৎ চমক ভাঙতে দেখি খাওয়া শেষ, অথচ অন্যমনে থালায় হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। লজ্জিত ঈষৎ ত্রস্ত হয়েই উঠে দাঁড়ালাম, নেভালাম আলো, বন্ধ করলাম দরজা। আবার বাথরুম। ফিরলাম শোবার ঘরে।

এসেছে সুনন্দা। বড় ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার সামনে চেয়ার টেনে বসে আছে, পরনের বহুমূল্য সাড়ীর আঁচলটা পায়ের তলায় খসে পড়েছে। হাতকাটা সিল্কের ঘননীল ব্লাউজের বোতাম খোলা। বাচ্চাটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে স্তন্যদান করছে। ছেলেটা চুপ। সুনন্দা ওকে ধীরে ধীরে দোলাতে দোলাতে চেয়ে আছে আয়নায়, দেখছে নিজেকে।

পায়চারী করতে করতে এলাম একটা খোলা জানালার পাশে। কালো রাত। সুনন্দা তেমনি বসে আছে, তেমনি স্তব্ধ, তেমনি সমাহিত। আমি সরে এলাম একটু কাছে, বিছানার ধারে। এল বুড়ী ঝি, একটা পান আমার হাতে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে চলে গেল। এতক্ষণে উঠল সুনন্দা, ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেটাকে শুইয়ে দিল বিছানায়, আবার ফিরে গেল ড্রেসিং-টেবিলের সামনে। নিঃসঙ্কোচে পোষাক-পরিবর্তন সুরু হলো তার। আমি আধ-শোয়া অবস্থায় একটা সিগারেট ধরালাম। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল—তীক্ষ্ণ, তীব্র দৃষ্টি। বলল, "কী বলেছ ওকে ?"

বিস্মিত হলাম, বললাম, "কাকে ?"

"ঝি-কে ?"

"কী আবার বললাম !..."

"কী আবার বললে !"...চাপা গলা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, "ছি-ছি, লজ্জাও করে না ! আমি সিনেমায় গেছি, কার সঙ্গে গেছি, তা নিয়ে একটা ঝি-র সঙ্গে আলোচনা। রাস্তার ভিখারীকে ধরে এনে যতই ঘসামাজা করো না কেন, তার মনের দৈন্য কিছুতেই ঘোচে না !"

সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

"কী, মারবে নাকি ?"

আস্তে শান্ত কণ্ঠেই বললাম, "রাস্তার ভিখারী, রাজকন্যার গায়ে হাত তোলবার সাহস হবে কোত্থেকে !"

"ওঃ, কথার বাহার খুব আছে !"

জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ঘন কালো রাত্রির মুখোমুখি। টের পেলাম, ঘরে খিল পড়ল, নিভল আলো, বিছানা ঢেকে গেল মশারীতে।

রাত্রি গভীর। আকাশে একটি তারা বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। চেয়ে রইলাম। শরীর-মন ভরে একটা ক্লান্তির স্রোত নামছে। জানি, আজ যে-ভূমির ওপর এসে দাঁড়িয়েছি, তা নিঃসন্দেহে কঠিনতর। স্বাচ্ছন্দ্যের সুধা পান করিয়ে যে-তীরে আজ তরী ভিড়েছে সেখানে কাছে দাঁড়াবার কেউ নেই। মায়ের আছে পূজার অনুষ্ঠান, বাবার ছন্নছাড়া খেয়ালী জীবন, ভাইয়ের পড়াশুনা, প্রিয়ার নির্বিরোধ বিলাস ও প্রমোদের বন্যা। আমি একাকী ডুবছি, ক্রমাগত ডুবছি টাকার নেশায়! যখন আসে ক্লান্তি, আসে বিরামের প্রয়োজন, একান্ত আগ্রহে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে দিই দৈবচক্রে যাকে পেয়েছি পাশে,—কিন্তু কঠিন আঘাত পেয়েই শূন্য হাত ফিরে আসে, বুঝি, নির্মম-ভাবেই বুঝি, আমি—একা!

"শোন?"

চমকে ফিরে চাই। দেখি সুনন্দা পাশে দাঁড়িয়ে, "শোবে না?"

বললাম, "একটু পরে।"

"যা খুসী করো"—সুনন্দা মুখ বাঁকাল, "দেখো, কাল সকালে আমাকে শ'দুয়েক টাকা দিও তো?"

"আচ্ছা।"

"টাকাটা কেন চাইছি শুনলে না?"

"কী দরকার!"

হয়তো মুখ টিপে হাসল, বলল, "রাগ হয়েছে! তা যাক, দেখো, কাল সকালে অজিতদা আসবে। দুজনে একটু মার্কেটিং-এ যাব, বুঝেছ? অজিতদাকে তুমি চিনলে না বোধহয়। আমার এক মাসীমা আছেন, এলাহাবাদে থাকেন, তাঁর ভাসুরপো। আমাদের সঙ্গে দারুণ আলাপ। বিশেষ করে মা যখন বেঁচেছিলেন তখন তো খুব আসতেন, তখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন কি না। বহুদিন পড়ে কলকাতায় আবার এসেছেন। এসেই দেখো আমার খোঁজ নিতে এসেছেন সকলের আগে!···যাক্ গে, এ সব তোমার ভাল লাগবে না, টাকাটা ঠিক করে রেখো, বুঝেছ?"

"আচ্ছা।"

"শুতে চললাম।"

"যাও।"

চলে গেল। ইজিচেয়ারটা জানালার কাছে সরিয়ে নিয়ে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম। জানি, ব্যবধানের চরভূমি স্পষ্ট হয়েই জেগে উঠেছে। কিন্তু কেন

এমন হলো ? ওকে দেখলে আমার সমস্ত উৎসাহ নিভে আসে, আবেগ রুদ্ধ হয়ে যায়। আমাকেও তো ও সহজভাবে নিতে পারে না, আমি কাছে থাকলে অস্বস্তির সুর জেগে ওঠে। ওর আর আমার মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষ ক্রমাগত বহ্নি-বিস্তার করে চলেছে ! মা ও বাবার কথা ভাবি। দুই তীরে দুটি মানুষ একাকী রয়ে গেল, সেতুবন্ধন আর ঘটল না। বাঁধবে কে ? লক্ষ্মীস্বরূপিণী কল্যাণী পুত্রবধূ ? সুনন্দা সে মেয়েই নয়। বধূ সে নয়, সে কন্যা। স্বামীর পরিচয়ে নয়, পিতার পরিচয়েই সে পরিচিত, পিতাই তার গর্ব, পিতৃসম্পত্তিই তার দম্ভ।...

ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে, সেই আধো-খোলা আধো-বোজা চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েকটি মুখ। প্রথমে মা, বাণী-পিসী, গৌরী, মায়া, সুনন্দা !...এরা কারা ? এরা আমার কতখানি আপন ?...

...দূর—অতিদূর থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'দাদুভাই—দাদুভাই !—' কেঁপে ওঠে, বেজে ওঠে আমার সমস্ত স্নায়ুতে স্নায়ুতে এই স্বর—'দাদুভাই যাচ্ছি কৈলাস !' ডাকে, আমাকে ডাকে, মাঝে মাঝে এই ছুটে-চলা-জীবনের সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলে চলে যাবার একান্ত আহ্বান আসে।

'গঙ্গোত্রী দেখেছ দাদুভাই ? গোমুখ ? যমুনোত্রী ? কেদারনাথ বদরীনাথ' ?

'না দেখিনি, কিন্তু দেখব। আমাকে নিয়ে চলো দাদু !'

সহসা যেন চাবুক খেয়ে উঠে বসলাম। আজে বাজে এ সব ভাবছি কী ? সময় আছে এ সব ভাববার ? আমার অফিস, আমার ব্যবসা, আমার পুঁজি। আসবে কাল ভোরেই সুরজমল লাখপতিয়ার লোক, আসবে অফিসে তরুণ বিজনেস্-ম্যাগনেট পরেশ পালিত—আমার সাম্প্রতিক অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার সঙ্গে অনেক কাজ আছে গোপনে। চাই পুঁজি !

মশারীটা একপাশে একটু উঠিয়ে বিছানায় এসে সটান শুয়ে পড়লাম ! মাঝখানে অয়েল-ক্লথ্ আর কাঁথার আশ্রয়ে ছেলেটা ঘুমাচ্ছে, ওপাশে সুনন্দা। ঘুমিয়ে না জেগে ?

॥ দুই ॥

এরপরে ঝড়ের কাহিনী। বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ উঠল, তমলুকের পথে প্রবল প্লাবন আর প্রমত্ত ঝঙ্কার ঝাঁঝর বাজিয়ে বাংলার বুকে টেনে আনল বিপুল ধ্বংসলীলা। তারপর মানুষ! বাংলার পথে-প্রান্তরে, ভারতের পথে-প্রান্তরে বয়ে গেল রক্তের ঢেউ! পুত্রের রক্তাপ্লুত প্রাণহীন দেহকে আলিঙ্গন করে পাষাণ-খণ্ডের মতো স্তব্ধ হয়ে রইল জননী, ভ্রাতার শবের কপালে জয়তিলক এঁকে দিল ভগ্নী, মৃত পতির কণ্ঠে শেষ জয়মাল্য পরাল সদ্য-বিধবা পত্নী; সমস্ত অন্তর মথিত করে আর্দ্রচক্ষুর কোণে এসে জ্বলে উঠল ক্ষোভ ও বিদ্বেষের বহ্নি! ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস বাংলা তথা ভারতের বুকে দিয়ে গেল এই দান।···

কিন্তু এই বলি নিয়েই বুভুক্ষু দেবতা তৃপ্ত হলেন না। লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্নের অভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে নগরে, রাজপথে-রাজপথে হাত পেতে বেড়াল, মিলল না ক্ষুধার অন্ন। ওরা একে-একে হাজারে-হাজারে লক্ষে লক্ষে মরল; যারা মরল তারাও মানুষ, যারা মারল তারাও মানুষ। বাঙলার বুকে এই অশ্রুসজল কাহিনী রক্তের অক্ষরে রইল লেখা: এরই নাম তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর।···

আজকের এই মুহূর্তের মন নিয়ে তখনকার 'আমি'কে বিচার করতে বসে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। সে আমার পাপ, সে আমার জীবনের প্রচণ্ডতম গ্লানি! কিন্তু সেই পঙ্কিলতার কাহিনী বলবার পূর্বে কিছু ভূমিকা আছে। বাইরের ঝড় কেমন করে আমাদের অট্টালিকার জানালায় অট্টহাসির ঢেউ তুলে বার বার কেঁপে কেঁপে গেল, তা না বললে আমার জীবন-কাহিনী সম্পূর্ণ হবে না।

আমাদের পরিবারে প্রথম স্পষ্ট ঝড় তুললো কমল। গোড়া থেকেই বলি। অফিসে বেরুচ্ছি, হঠাৎ কানে গেল, গুন্‌গুন্‌ করে কে কাঁদছে! প্রথমটায় তেমন মনোযোগ দিইনি, কিন্তু ক্রমশঃ এত স্পষ্ট হয়ে উঠল যে চাঞ্চল্য অনুভব না করে পারলাম না। সুনন্দা কী জন্য যেন তখন ঘরে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করলাম,—"কাঁদছে কে?"

প্রথমটায় উত্তর পেলাম না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পর সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো,—"মা।"

"মা কাঁদছে! কেন?"

"তার আমি জানি কী!"—বলেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি মূঢ়ের মত মার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

জানালার নীচে বসে বাইরের দিকে চেয়ে মা কাঁদছে! আমি যেতে কান্না আরও বাড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—মুখে আঁচল চেপে ব্যাকুল হয়ে কান্না।

"কী হয়েছে! কাঁদছ কেন?"

"ওরে আমার কমল রে।"—মার কান্না থামল না।

"কমল! কী হয়েছে কমলের?"

মিলল না উত্তর।

এই সময়ে ঘরে এলো সুনন্দা। তার দিকে চেয়ে মা বললে,—"ওঁকে ঘরের বাইরে যেতে বলো ত বউমা।"

সুনন্দা মার কাছে বসে আমার দিকে চেয়ে তা-ই বললো,—"যাও, বিরক্ত করো না।"

"ব্যাপারটা কী?"

"তাও জানো না?"—সুনন্দা বললে, "কাল থেকে ঠাকুরপো যে বাড়ি আসে না, কোথায় গেছে কে জানে!"

"তার মানে?"

"মানে তোমরাই জানো। ভাল ছেলে, দিব্যি পরীক্ষার ফল দেখতে সকালে বেরিয়ে গেল, মাঝে একবার ফিরেছিল, তারপরে যে বেরুল আর পাত্তা নেই। পরীক্ষায় ফেল অনেকেই করে, কিন্তু এভাবে বিবাগী হয়ে যায় আবার কে?"

"খোঁজ করা হয়েছে?"

কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে মা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল,—"বউমা, ও যেন খবরদার খোঁজ খবর না করে বলে দাও, অতি বড়ো দিব্যি রইল।"

একটু উষ্মার সঙ্গে বললাম,—"এর আবার অর্থ কী?"

"অর্থ এ-ই, অর্থ এ-ই"—পাগলের মতো মা হঠাৎ দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল।

"আঃ, করছ কী ?"

সুনন্দা মা-কে টেনে আনতে আনতে বলল আমাকে, "যাও দেখি শীগগির এখান থেকে।"

বললাম, "বাবা কোথায় ?"

"তাঁরও দেখা নেই। একবার আসছেন, আবার বেরুচ্ছেন, খুঁজছেন ঠাকুরপোকে।"

"খবরদার !"—মা প্রায় চীৎকার করে উঠল, "বৌমা, সে যেন খবরদার এ বাড়ীতে না ঢোকে, তাহলে একমুহূর্তও এ বাড়ীতে আমি থাকব না, চলে যাব! সে-ই তো সব নষ্টের গোড়া। সারাজীবন বাউণ্ডুলে হয়ে ভিখারীর মত ঘুরে বেড়ানো। ছেলেটাকে দেখলে না শুনলে না, এখন হন্যে হয়ে ঘুরছেন, ওরে আমার দরদ রে !"

বললাম, "কমল কোথায় গেছে, আন্দাজ করতে পারো মা ?"

জ্বলে উঠল মা, "আমার সঙ্গে কথা কইতে ওদের বারণ করো বৌমা। ওরা বাপ-ব্যাটায় এক হয়েছে। সংসারে কী কোথায় হচ্ছে দেখা নেই শোনা নেই ; যে-যার নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।"

"তুমি এখনো দাঁড়িয়ে।"—সুনন্দা চাপা গলায় ভর্ৎসনা করে উঠল, "যাও দেখি! খোঁজ করবে কোথায় ? খোঁজ মিলবে না। একটুকরো কাগজে লিখে গেছে—আমার খোঁজ করো না, পাবেও না, আমি অনেক দূরে চললাম !"

"বাছা আমার কোনদিন একটুও আদর যত্ন পায় নি !"—মা ডুকরে আবার কেঁদে উঠল।

"আশ্চর্য !"—অস্ফুটকণ্ঠে বললাম, "ফেল কি কেউ কোনদিন করে না ?"

"বউমা ?"—মা বলে উঠল, "ও কী এখান থেকে যাবে না ?"

"যাচ্ছি !"—চলে এলাম। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নীচে।

"হ্যালো !"

চমকে চাইলাম। ঝকঝকে স্যুট পরিধানে তরুণ উঠতি বিজনেস-ম্যাগনেট বন্ধু পরেশ পালিত দাঁড়িয়ে সামনে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

"এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন ? এনিথিং···"

বাধা দিয়ে বললাম,—"হ্যাঁ। আমার ভাইটি কোথায় চলে গেছে।"

"তোমার ভাই! কমল ?"

"হ্যাঁ।"

"সে কী হে!"

"এইবার আই-এস-সি দিয়েছিল। পাশ করতে পারে নি। তাই লজ্জায় আর বাড়ী ফেরে নি।"

"আই সি!" এইখানে পরেশ একটু থামল, চোখের চশমাটা নামিয়ে একটু কাঁচটা মুছে নিল একবার, বলল, "ওয়েল—"

"বল ভাই?"

"ভেবো না। ওর সন্ধান করা হবে। যাবে কোথায়? ওকে ফিরতেই হবে!"

"কী করা যাবে ভাই পরেশ?"

একটু হাসল, বলল, "বিজ্ঞাপন দেব কাগজে। কিছু ভেবো না, ঠিক ফিরবে। বিজ্ঞাপনের উত্তরে সে লিখবে 'টাকা চাই'—টাকা পাঠাবে, সে-ও চলে আসবে। আমি জানি, এমনই হয়। কোন ভাবনা নেই। এখন এসো তোমার অফিস-ঘরে। অনেক কাজ। সুরজমল লাখপতিয়ার লোকটি এসেছে। ভাবনা নেই। নাউ, কাম অন উইথ ইওর ওন ক্যাপিট্যাল!"

"কেন?"

সিগারেটে আর একটা জোর টান দিয়ে ডান চোখের কোণ একটু কুঁচকে একটু হাসল পরেশ। বলল, "যেমন তুমি বলেছিলে! শ্বশুরের তাঁবে আর নয়। নিজের টাকা চাই। কেমন, বলেছিলে কি না?"

"হ্যাঁ।"

"এবং," আবার ধূমোদ্গীরণ করল—"আমিও আমার বাবার কর্তৃত্বাধীনে থাকতে চাই না। আমরা নিজেরাই হবো ক্যাপিটালিস্ট, বুঝতে পারছ? আওয়ার ওন বিজনেস। ও টুকিটাকি খুদে খুদে দালালি আর চলবে না, টাকা চাই অনেক, চাই প্রগ্রেস, কাম্, জয়েন হ্যাণ্ডস উইথ মি। তোমার অর্ধেক, আমার অর্ধেক।"

"কী করতে চাও?"

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলে উঠল পরেশ, "মার্কেটের অবস্থা দেখেছ? যুদ্ধের জোয়ার। হু হু করে দর চড়ছে জিনিষের। স্টক করো, স্টক করো। সুযোগ বুঝে চড়া দামে বিকিয়ে দাও। অ্যাণ্ড্ ইউ মেক মানি। আরও পথ আছে। এসো, তোমার অফিস ঘরে, হ্যাভ মোর টকস্ দেয়ার! কিচ্ছু না, হাজার পঞ্চাশেক টাকা তুমি দাও, আমিও দিই, লেট আস স্টার্ট অন।"

"অত টাকা! অত টাকা আমার নিজের তো নেই!"

"সে জানি, আমারও কি আর অতো দেবার মতো আছে ছাই। তোমার অর্থাৎ তোমার শ্বশুরের অফিস থেকে নাও, অবশ্য লোন্-অ্যাকাউণ্টে, বড়জোর মাস ছয়েক, এরই মধ্যে তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে, আই অ্যাম শিয়োর!"

"কী বলছ!"

"আলবৎ! ইউ আর নট এ ফুল! দেখছ তো বাজারটা কী!"

"তা দেখছি বটে!"

"তবে!"

মনে-মনে বললাম, "তবে তা-ই হোক। টাকা চাই।"

সুনন্দার কঠিন মুখ সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঐ কাঠিন্যকে আমি টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দিতে চাই। এ বাড়ীতে না, এ আবহাওয়াতেও না। ওকে টেনে আনতে হবে সেখানে, যেখানে আমার অস্তিত্ব প্রখরতর, আমার স্বাধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। টাকা চাই, টাকা চাই।

পরেশ বলল, "চলো যাই। সুরজমলের লোক অনেকক্ষণ বসে আছে।"

পরম উৎসাহে আমরা অগ্রসর হলাম।...

এর পর সুরু হলো চলা। দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণ ও অর্থ নিয়ে যে ঘটনা-বিবর্তনের দ্রুত স্রোত নেমে এলো, আমার চলার গতি হলো তারই সঙ্গে পা ফেলে ফেলে। ও অপূর্ব গতিবেগ জীবনে আর কখনো অনুভব করি নি। হয়ত এই গতিবেগের আবেগ নিয়েই ছুটে চলে ঝড়, কোনদিকে চাওয়া নেই, থামা নেই, সব কিছুকে পরম কৌতুকে টেনে ফেলে, ভেঙ্গে মুছে নিজের পথ করে নেয়।

পড়ে রইল কমলের নিরুদ্দেশ বার্তা, পড়ে রইল মায়ের মাঝে মাঝে কমলের জন্য ডুকরে-ওঠা কান্না, পড়ে রইল বাবার ছন্নছাড়া অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, পড়ে রইল সুনন্দার উগ্র বিলাস, পড়ে রইল শিশুপুত্র প্রশান্ত, পথের দুপাশে সব কিছুকে ছবির মত অপস্রিয়মান রেখে আমার রথচক্র দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে আবর্তিত হতে লাগল।

বেরিয়ে যাই সকালে, ফিরি রাত্রি দশটার কম নয়, শ্রান্ত ক্লান্ত শরীর নিয়ে। মিলিটারী ঠিকাদারী কিছু-কিছু দু'বন্ধুতে সংগ্রহ করেছি, তাদের কৃপায় পেট্রোলের হয় না অভাব, আমাদের মোটর নিয়ত গতি-চঞ্চল!

এমনি এক ক্লান্ত রাত্রে বাড়ী ফিরেছি, শুনলাম কমল চিঠি লিখেছে। মার

কান্না আরও উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কমল মিলিটারীতে যোগ দিয়ে চলে গেছে দূরে। বর্তমান চিঠিখানা আসছে এডেন থেকে। এর পর অনির্দেশ্য পথে সে যাবে, সম্ভবতঃ ইটালীর সমরাঙ্গনে। লিখছে,—'যাচ্ছি যুদ্ধে। চোখ আমার খুলে গেছে। চোখ মেলে আজ যা দেখছি, তা এক নূতন দিক থেকেই দেখছি। এখানকার কর্ম বড, পথ বড, জীবনও বড। আমি সৈনিক, এসেছি কথা বলতে নয়, কাজ করতে। সুতরাং এর থেকে বেশী কিছু বলতে পারলাম না। বলবার অধিকারও সীমাবদ্ধ, সামর্থ্যও তাই।'

শুয়ে শুয়ে শ্রান্ত চোখে ঘুম না এসে ওরই ছবি, ওরই কথা অনেক রাত অবধি সেদিন ভেসে ভেসে উঠছিল। ওর চিঠি, ওর ভাষা, ওর কাজ, ওর ভাবনা—সবই নূতন! সৈনিকের বেশে ওর একখানি ফটোও পাঠিয়েছে চিঠির সঙ্গে। দিয়েছে ক্ষুদ্র বিবরণ সামরিক জীবনের। লিখেছে—'বেশ আছি, তোমরা চিন্তা করো না।'

রাত্রি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চিন্তা ভুললাম। এখনি আসবে পরেশ। আজ একটি দীর্ঘ ট্রিপ আছে বাইরে, অত্যন্ত জরুরী। চলল প্রস্তুতি। চাই টাকা, আরও টাকা চাই। সাধারণতঃ সুনন্দা আমার কোন ব্যাপারে থাকে না, আমিও থাকি না তার কোন ব্যাপারে। তার নাম লিখে অফিস থেকে তার হাতে টাকা দেবার নির্দেশ ছিল শ্বশুরের পক্ষ থেকে, সে চাওয়া-মাত্রই দিয়ে যাই, এই পর্যন্ত। কিন্তু একদিন সে কর্ত্রীর মত দাঁড়াল এসে সামনে, বলল,— "ওটাকে আবার জোটালে কোথা থেকে?"

"কে?"

বলল—"কে আবার! ঐ লম্পটটা! পরেশ পালিত!"

জ্বলে উঠলাম ওর কথার ভঙ্গীতে, তবু প্রাণপণে সামলে নিলাম নিজেকে, বললাম—"সে কৈফিয়ৎ তোমাকে যদি না দিই?"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল সুনন্দা। তারপরে সক্রোধে বলল—"আচ্ছা! দেখা যাক্, কৈফিয়ৎ তুমি দাও কিনা!"

বলেই আর দাঁড়াল না, সরে গেল কাছ থেকে।

কাটতে লাগল দিন। কর্মব্যস্ত একটি দিনে বহুকাল পর হঠাৎ 'তার' এল বোম্বে থেকে, মিঃ চ্যাটার্জি অর্থাৎ আমার শ্বশুর আসছেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। অফিসের কাগজপত্রে করলাম মনঃসংযোগ। অফিসের কাজের সঙ্গে বহুদিন অ-জড়িত আছি।

পরেশ জিজ্ঞাসা করল, “কী ব্যাপার ?”

“শ্বশুর আসছেন।”

“আসছেন তো আসছেন, কী হয়েছে তাতে ?”

“তুমি তো জানো”—আমি বললাম, “ওর অফিসের অ্যাকাউন্টস থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়েছিলাম, এখনও জমা দিতে পাবি নি।”

“নাই দিলে! পরে দেবে। কিছু বললে বলো, ধার হিসেবে নিয়েছি, পরে শোধ দেব।”

একটু থেমে বললাম, “বেশ। কিন্তু আর একটা কথা।”

“কী ?”

“শ্বশুরের অফিস ছাড়তে চাই।”

“দ্যাটস ইট”—পরেশ বলল, “এই তো ইয়ংম্যানের মত কথা। কী লাভ ও অবলিগেশনের মধ্যে থেকে ? শ্বশুরের বাড়ীও ছেড়ে দাও।”

“সত্যিই ভাই পরেশ! আমি ওদের সব সম্পর্ক ছাড়তে চাই।”

এ-কথায় পরেশ হঠাৎ হেসে উঠল, বলল—“এমন কি তোমাব শ্বশুবের একমাত্র কন্যাটিকেও ?”

হাসিতে আমি যোগ দিলাম না, চুপ করে গেলাম। পরেশ সেটা লক্ষ্য করল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে আমার হাতটা ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল,—“আমি জানি, তুমি স্থখী হওনি! যাকগে, চলো একটু ঘুরে আসি।”

“কোথায় ?”

“চলোই না। একটু নিভৃতে। তোমাকে একটা অদ্ভুত গল্প আজ শোনাব। চলো।”

ড্রাইভারকে পিছনে বসিয়ে ও নিজেই চালাতে লাগল ওর ‘বুইক’টা, আমি বসলাম পর পাশে। রাজধানীর পথ তখন সহস্র সহস্র বুভুক্ষুর আর্তকণ্ঠে মুখর ফুটপাতে জীবন্ত কঙ্কাল শুযে বসে দাঁড়িয়ে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে আমাদেব পথ চলার সমারোহ দেখছে। আমাদের গাড়ী ততক্ষণে একটি কঙ্কালকে বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে একটা ছোট পিচঢালা রাস্তায় ঢুকেছে। কঙ্কালের মিছিল এখানে আরও ঘন, ওখানকার ফুটপাতে আরও জনবহুল। খণ্ড খণ্ড বহু চিত্র চোখে পড়ছে। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর!

“মাগো, একটু ফ্যান!”

“মাগো, আমাকে না, এই বাচ্চাটাকে একটু-কিছু দাও!”

ক্রমাগত উঠছে সর্বভেদী ক্ষীণ আর্তস্বর। খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শূন্যহাতে শীর্ণকায় বুভুক্ষু দল কিছু কেড়ে নেয় না, শুধু মিনতি করে, ভিক্ষা করে করুণা! ফুটপাতের ডাস্টবিনকে ঘিরে অনেকগুলি জীব। খেতে না পেয়ে মানুষ মরছে, তা-ও দেখলাম। দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে পরেশকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম, গাড়ীটা ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ একটা বাঁক নিয়ে ঘ্যাঁচ করে থেমে পড়ল একটা গোলাপী রঙের দোতলা ছোট বাড়ীর সামনে। পরেশ বলল, "নামো।"

"কোথায়?"

"এসোই না।"

নীচের তলায় কতগুলি মাদ্রাজীর মুখ চোখে পড়ল। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পরেশকে চেনে, অভিবাদন-বিনিময় থেকেই এটা বুঝলাম। ওপরতলাটা খালি, চাবি বার করে দরজা খুলে পরেশ আমাকে ঘরগুলো দেখাল, বলল, "কী, পচ্ছন্দ হয়?"

"তা তো হয়। কিন্তু—বুঝেছি তোমার কথা। অনেক ধন্যবাদ। এই বাড়ী ভাড়া নেব। এত সহজে যে কলকাতায় এখন ঘরভাড়া পাওয়া যায়, তা সত্যিই জানা ছিল না।"

পরেশ হাসল, "হেরে গেলে, এ ভাড়ার জন্য নয়।"

"তবে?"

পরেশ আবার হাসল, "আমি তোমার বন্ধু, তাই বন্ধুর কাজই করছি। বাড়ীটা বিক্রী হচ্ছে, পঁচিশ হাজারে। আমিই নেব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার দরকারটা আগে। দাই নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন—"

"সত্যি!" সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—"কিন্তু টাকা কোথায় অতো আমার কাছে?"

পরেশ বললে, "আমি তোমায় টাকা দিচ্ছি—ধার। ভয় নেই, ইন্টারেস্ট নেব না। আমি জানি ছ'মাসেই এ টাকা তুমি শোধ করে দিতে পারবে।"

তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ও একটু হেসে বললে,—"কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? কিচ্ছু ভেবো না, তোমার শ্বশুর বম্বে থেকে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়ীতে তুমি চলে আসতে পারবে।—নাও, এখন চলো এক যায়গায়—একটা গল্প শোনাব আজ তোমায়, বলেছি না?"

আবার পথ। আবার সেই বুভুক্ষু মানুষ! মনে হলো, আমরা চোরের মত ওদের কাছ থেকে পালাচ্ছি। ওদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে…!

আবার মোটর গেল থেমে। একটি অত্যুগ্র অভিজাত অঞ্চলের রেস্তোরাঁ।

আমরা নামলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ব্ল্যাক আউটের কালো রাত। আমরা রেস্তোরাঁর ভিতরে এসে একটি নিভৃত কেবিনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম! বয়কে কী বলল পরেশ, ঠিক বুঝলাম না।

দুহাতে মুখ ঢেকে আবার হাত সরিয়ে নিল পরেশ, বলল, "এবার সেই গল্প, তাই না? দাঁড়াও সুরু করছি।"

বয় এল, কাঁচের পাত্র বেজে উঠল ঝনঝন করে, ফেনায়িত রঙীন পানীয় টলমল করে উঠল।

"এ কী পরেশ!"

একটি পাত্র আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "তোমার কোন প্রেজুডিস নেই আশা করি?"

"না-না!"

পাত্রটি টেনে নিয়ে একটু বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি অত অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ালে কেন? তোমাকে কী আমি বিষ দিচ্ছি!"

"না না, তা নয়। তবে কী জানো, মানে—" পরেশ আমার এ-অধীরতার অর্থ জানে না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, মেঝের বমির ওপর শুয়ে এক অপ্রকৃতিস্থ পুরুষ আর্তনাদ করছেন,—'Oh God! Thy temple they have defiled!'…

ভয়ার্ত, ত্রস্ত কণ্ঠে কোনক্রমে বলে উঠলাম,—"পরেশ!"

বলল—"বসো।"

বসলাম।

"ভয় নেই, তোমাকে খেতে হবে না। কিন্তু অন্য কিছু?"

"না ভাই।"

পরেশ একটি পাত্র নিঃশেষ করে আরেকটি টেনে নিল—"বিজনেসম্যান হয়ে তোমার কোনদিক দিয়েই কোন প্রেজুডিস থাকা উচিত নয়।"

কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় পাত্রটিও শেষ হলো।

"নাউ, তোমার গল্প", পরেশ বলল,—"না ভাই, আজ কিছুতেই তোমাকে বলতে পারছি না।"

বয় ভিতরে এলে সমস্ত মূল্য চুকিয়ে দিযে ও হঠাৎ-ই উঠে দাঁড়াল, বলল, "তুমি একাই বাড়ী যাও। আমার গাড়ী নাও, আমি যাব ট্রামে।"

"কোথায় যাবে ?"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি,—"তুমি জানো নিখিল, আমি বিয়ে করিনি ? কিন্তু কেন করিনি জানো ? ছাট ইজ দ্য স্টোরি, আমি তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না। অথচ, বলতেই হবে, নইলে স্বস্তি পাচ্ছি না। ওয়েল, চিঠি লিখে জানাব, বুঝলে ?"

ওব কথা একটু জড়াচ্ছে, পাও একটু টলছে মনে হলো, বললাম,—"কিন্তু কোথায় যাবে, তা তো বললে না ?"

আমার চোখে চোখ রাখল—দুটি আবক্তিম চোখ, বলল, "তুমিও চলো না আমার সঙ্গে ?"

আমি উত্তর দেবার পূর্বেই হঠাৎ উচ্চকিত হেসে উঠল, বলল,—"না-না, সেখানে নয়, সেখানে যেতে তুমি ভয পাবে! এখন চলো দোকানে—একটা জুয়েলারি দোকানে।"

"কেন!"

"একছড়া হার কিনব। একজনকে দেব, চেয়েছিল।"

চমকে, ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠেই বললাম, "পরেশ!"

"আমি জানি"—স্তিমিত ক্লান্ত চোখেই পরেশ বলল, "তুমি শুনলে ঘৃণা করবে। কিন্তু সেটা ভাল নয। ঘৃণা করো না বন্ধু, কোথায় যে কী লুকিয়ে থাকে তা সবাই জানতে পারে না। দিস্ ইজ হাঙ্গার, ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা মিটলেই চলে আসব; এখানে মন নেই, হৃদয় নেই, স্রেফ মহাজনী কারবার—বিজনেস। বিজনেসম্যান হয়ে এটা তুমি বোঝ না ?"

একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললাম, "আমি যাই।"

"আচ্ছা, যাও। আমি একাই দোকানে যাচ্ছি। কিন্তু আমি ভুলিনি, গল্প তোমায় শোনাব, আমার জীবনের অনেক কিছুই সেদিন তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে!"

টলতে টলতে পরেশ গিয়ে ট্রাম ধরল, আমি ফিরে এলাম।

দিনকয়েক পরে। মনে আছে সেই দিনটির কথা—বিশেষ করে সেই রাত্রিটির কথা। সেই রাত্রিটি অবিস্মরণীয়। সমস্ত দিন অফিসে কাটল, এবং পরে, বাড়ী এসে অফিস-ঘরে।

ইতিমধ্যে বেযারার হাত-দিযে এল একটা খাম—পরেশের চিঠি। অফিসের চিঠি যেমন করে আসে, তেমনি করে এসেছে পিওন বুকে। সই কবে বেয়ারার হাত থেকে চিঠিটা নিলাম, কাজে ব্যস্ত, তবু অফিস-সংক্রান্ত চিঠি হলে তখনি খুলতাম, কিন্তু লক্ষ্য করলাম,—খামের কোণে কালো কালিতে ছোট কবে লেখা—'পারসোনাল্'। পকেটে পুরলাম চিঠি। নিশ্চযই পরেশেব সেই গল্প। কিন্তু পডব সময় কই? অফিসের ফাইলের মধ্যেই তো কাটল সমস্তটা দিন! আর, তাছাডা, হয়ত ইনিযে-বিনিয়ে চমকপ্রদ কোন রোমান্সের বর্ণনা—ওর প্রতি কোন আকর্ষণই অনুভব করলাম না।

শ্বশুর তন্নতন্ন করে সব দেখলেন, তারপরে একসময এসে দাঁডালেন সামনে।

মুখে পাইপ, ট্রাউজারেব পকেটে দুই হাত ঢোকানো, দু-তিন বার ঘরটায় পায়চারি করলেন, তারপরে বললেন—"রাত হয়েছে, ওপরে চলো, যা দেখবার সমস্তই আমি দেখেছি।"

উঠলাম। বললাম, "আমাকে আর কিছু বলবেন?"

মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন, বললেন, "কী আবার বলব? তবে হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার নিজের বিজনেস্ কেমন চলছে?"

মনে মনে চমকেই উঠলাম। ব্যাপারটা উনি জানলেন কী করে, অতদূর থেকে? কিন্তু, আমি লুকোবার চেষ্টা করলাম না। বললাম,—"সবে স্টার্ট করেছি।"

উনি কোন মন্তব্য করলেন না আর। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মুখ নীচু করে কী যেন ভাবলেন, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরলেন ওপরে যাবার। আমি অফিস-ঘরে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে, নিশ্চল—নির্বাক! দেয়ালের ঘড়িতে টিক্-টিক্-টিক্-টিক করে সময়ের কাঁটা পার হয়ে যাচ্ছে, আমার হৃদ্‌পিণ্ডের 'ধ্বক্-ধ্বক্' শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। শ্বশুরমশাই আমাকে তেমন-কিছুই বলেন নি, তিরস্কার করেন নি পর্যন্ত। কিন্তু, ওঁর এই না-বলাটাই প্রচণ্ড প্রহার হয়ে হৃদয়ের তটভূমিকায় এসে আছড়ে পড়ছে!

প্রকৃতপক্ষে ভয়ানক গরম লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গলার 'টাই'-এর ফাঁসটি অতি দৃঢ় করেই চেপে ধরেছে আমার কণ্ঠ। খুলে ফেললাম একটানে। কিন্তু তবুও স্বস্তি নেই, সারা গায়ে আগুন ছুটছে যেন! কী মনে করে পকেট থেকে কলমটা বার করতে গেলাম। হয়ত ইচ্ছা করছিল,—শ্বশুরমশাইকে কিছু লিখে জানাব! হয়ত-বা ওঁর অফিসের কাজে ইস্তফা দেব, এ-অভিলাষও বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠতে পারে!

কিন্তু, কলমটা বার করতে যেতেই ভারী একটা খামে হাত পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, কিসের ঐ খাম। পরেশের সেই চিঠি! একমুহূর্ত থেমে থেকে, খামটা বার করলাম পকেট থেকে। চিঠিটা পড়ার তখন ইচ্ছা ছিল না মোটেই, কিন্তু মন বলছিল, কিছু একটা চাই, কিছু একটা কাজ করি অন্ততঃ! মানসিক অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যেই খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা মেলে ধরলাম চোখের সামনে। কোন গোপন ব্যবসায়িক সূত্র থাকাই সম্ভব। বিশ হাজার টাকা সরানো আছে শ্বশুররমশাইয়ের ক্যাশ থেকে,—সে সম্পর্কেই হয়ত কোন নির্দেশ আছে মনে করে তাড়াতাড়ি পড়তে আরম্ভ করলাম চিঠিখানা!

শ্বশুরের কাছে ধার বিশ হাজার, আর, নূতন বাড়ী কিনবার টাকা-হিসাবে পরেশের নিজের দেওয়া ধার পঁচিশ হাজার—মোট পঁয়তাল্লিশ হাজার। এই পঁয়তাল্লিশ হাজারের হিসাবের বদলে ওর চিঠি এনে দিল ভিন্ন এক জগতের সংবাদ! প্রতিটি পংক্তি পড়ছি, আর প্রতিটি অক্ষর দুঃসহ ব্যঙ্গে করতালি দিয়ে নৃত্য করে চলেছে যেন! লিখেছে—'তোমার শ্বশুরকে চিনি, তোমার স্ত্রীকেও। আজ সত্য বলতে দাও বন্ধু, সুনন্দাকে একদিন ভালভাবেই চিনতাম; এ-অঞ্চলের কে-ই বা না চিনতো? কিন্তু আজ, আমাকে দেখলে চিনতেই পারে না, মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। বলতে পার, আজ আমার অবনতি ঘটেছে কার জন্য? ঐ সুনন্দা। আমি জানি, তুমিও সুখী নও, তোমাকে ও সুখী করতে পারে নি। আর, পারবেই বা কী করে? তোমার ব্যর্থতা প্রাণ দিয়েই অনুভব করলাম, তাই আমার আপন ব্যর্থতা নিয়ে এগিয়ে গেলাম তোমার কাছে। বন্ধুত্ব হলো সহজেই। কারণ, তোমার যেখানে ব্যথা, আমার ব্যথাও সেইখানে। আবারও বলি, 'সত্য' বলতে দাও বন্ধু। বেশ মনে আছে, যেদিন কুমারী সুনন্দা ফিরল কোন এক 'মেটারনিটী হোম' থেকে। চমকে উঠো না বন্ধু, 'সত্য' এমনই নিদারুণ! অজিতবাবুকে তোমার শ্বশুর ইতিমধ্যেই

কৌশলে সরিয়ে দিয়েছেন দূরে, ওঁদের পারিবারিক বিচার-বিবেচনায়, বর্ণ-বিভেদ এবং আরও নানান কারণে ওদের বিয়ে হতে পারে না; বিশেষ করে, তোমার শ্বশুর তা হতে দিতে চাইলেন না। যাই হোক, এর পর সুনন্দাকে পাত্রস্থ করবার দ্রুত চেষ্টা চলতে লাগল। কলঙ্কের কালিমা সহজে ঘোচে না; সম্বন্ধ আসে, কিন্তু ফিরে যায়। বাপের টাকা আছে—এ-খবর রটে গেলেও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। অবশেষে, দূরদেশ থেকে এসে দাঁড়ালে তুমি। তোমার সব কথাই আমাকে খুলে বলেছ, আমি জানি, তোমার মতো গরীব মানুষের পক্ষে ওদের মধ্যে এসে পড়া, কেবল এইজন্যই সম্ভবপর হয়েছে, নইলে—"

আরও দু-তিনটি পংক্তি ছিল এরপর। কিন্তু পড়তে আর ইচ্ছা করল না। বলা যায়, পড়তে আমি পারলামও না। বেশ বুঝতে পারছি, হাতে ধরা চিঠিখানা রীতিমত কাঁপছে থর্‌থর্ করে। চিঠির অক্ষরগুলো যেন সচল হয়ে চোখের সামনে আবর্তিত হতে শুরু করেছে! আমি অবশ্য চিঠিখানা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম না, অথবা, ছিঁড়েও ফেললাম না। ধীর মস্তিকে মানুষ যেমন আচরণ করে, আমি ঠিক তেমনিই করে যেতে লাগলাম। চিঠিখানা ভাঁজে ভাঁজে মিলিয়ে, আবার খামের মধ্যে পুরে রাখলাম; খামখানা আবার স্থান পেল আমার জামার বুকপকেটে। বাহ্যতঃ সবই করে যাচ্ছি স্বাভাবিক মানুষের মত, কিন্তু, ভিতরে বেজে উঠেছে বিপরীত সুর! ট্রেনে যেতে যেতে নিজেরই চিন্তায় বিভোর হয়ে মানুষ যেমন জানালার পাশে মাথা হেলিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পাশ-দিয়ে-ছুটে-যাওয়া দ্রুত-গ্রামী ট্রেনের শব্দে প্রচণ্ড চমকে কেঁপে ওঠে,—ঠিক তেমনি প্রবল এক অভাবিত অপ্রত্যাশিত ধ্বনি যেন বেজে উঠল বুকের ভিতরে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে—রন্ধ্রে রন্ধ্রে!

কিছুক্ষণ নির্জীবের মতো নিথর—নিশ্চল বসে থাকবার পর একসময় যেন চমক ভাঙল, আর চমক যখন ভাঙল, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমি ভিন্নতর মানুষ হয়ে গেছি! আমার বেশ মনে আছে, সেদিনকার সেই আমার অদ্ভুত মনোভাবের কথা! আমার যেন হঠাৎ গুন্‌গুন্ করে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল! কী এক অভাবনীয় তৃপ্তির আবেশ আমার সমস্ত মনটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল মুহূর্তে!

আসল কথা, সে সময় ওঁদের বাড়ীতে—ওঁদের আশ্রয়ে থাকতে থাকতে,

এবং বিশেষ করে সুনন্দার আভিজাত্য-প্রবণতার সংঘর্ষে এসে, আমার মনে প্রবল এক নীচতা-বোধ ক্রমশই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল! যতই কর্মচক্রের চূড়ায় থাকি না কেন, কর্মচারী থেকে বেয়ারা পর্যন্ত সবাই জানে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি! আমি মালিকের জামাই,—কিন্তু অনুগৃহীত। এই অনুগ্রহের অমৃত আমার কাছে তীব্র বিষে পরিণত হচ্ছিল। আর, তা যদি না হতো, তাহলে, অত সহজেই পরেশ পালিতের প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারতাম না! মনে মনে জানতাম, সুনন্দা আমার স্ত্রী হলেও উচ্চকোটির মানুষ, আমি নিম্নকোটির। এই ধারনাটাই দিনের পর দিন ধরে আমার মনে গ্লানি সঞ্চার করছিল।

কিন্তু আজ? পরেশের চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন আমাকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে দিল সুনন্দার ওপরে। পাত্র-হিসাবে কেন যে আমি সেদিন—সেই পদ্মাতীরের নগণ্য জনপদে বরণীয় হয়েছিলাম, আজ তার কারণটা স্বচ্ছ হয়ে এল। নিজেকে করুণার পাত্র মনে করতাম, আজ সুনন্দাকে করুণার পাত্রী বলে মনে হলো। গ্লানি আর নীচতা-বোধের পাষাণভার নেমে গেল অন্তর থেকে, আমি যেন এক অদৃশ্য বন্ধন-দশা থেকে হঠাৎ-ই মুক্তি পেলাম!

আশ্চর্যের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে, অফিস ঘরের আলো নিভিয়ে ওপরে যাবার সিঁড়িতে পা দিয়ে চলতে চলতে আমার মনে হচ্ছিল, আমার প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধরে আমি যেন বহু যুগ ঘুমুই না। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলেই রাজ্যের ঘুম যেন নেমে আসবে আমার চোখে!

বারান্দা দিয়ে ধীর ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলছিলাম নিজের ঘরের দিকে। শ্বশুর মশাইয়ের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পায়ের শব্দে উনি বোধ হয় টের পেলেন। ভিতর থেকেই ডেকে উঠলেন,—"নিখিলেশ?"

থমকে থেমে, পর্দা সরিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকলাম। একটা কাউচে এসে বসেছেন ততক্ষণে, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওঁর মেয়ে, ঈষৎ-ঘোমটা-ওঠানো, নতমুখী। মৃদুকণ্ঠে বললাম,—"ডাকছিলেন?"

"হ্যাঁ। চেয়ারটাতে বসো।"

বসলাম। উনি গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন,—"দেখ, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাসের তুমি অমর্যাদা করেছ তা আমি বলছি না, বরঞ্চ, প্রথম দিকে চমৎকার কাজ দেখিয়েছ, বলা যায়।

তোমার efficiency তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ। কিন্তু, শেষের দিকে, অর্থাৎ ইদানিং কালে তোমার গাফিলতিতে আমার বেশ কিছু টাকা লোকসান গেছে দেখছি।"

মুখ তুললাম। দেখি, সুনন্দা তীব্র আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর ঘৃণায় যেন তার মুখের রেখাগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে! অন্যদিন হলে, আমার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠবার পথে ওর ঐ কঠোর দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট, কিন্তু, আজ, সব মিলিয়ে আমার ভারী মায়া হলো ওর ওপর, দয়া হলো। রুষ্টতার পরিবর্তে আমার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

আর, সেই মৃদু হাসির রেখা যে সুনন্দাকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে, এও বোধ হয় আমি মনে মনে জানতাম। এই দীর্ঘ আড়াই বছরে আমার মনের ধরন-ধারণ ও যেমন জেনে ফেলেছে, আমিও তেমনি বুঝে গেছি ওর মনের রীতি-প্রকৃতি!

তা-ই হলো। জ্বালাধরা তীব্র আর চাপা কণ্ঠস্বরেই ও বললে, "জানো বাবা, সেই পরেশটার সঙ্গে ওর আবার দারুণ বন্ধুত্ব!"

"জানি।"

বলতে-বলতে আমার দিকে মুখ ফেরালেন মিস্টার চ্যাটার্জী, বললেন,—"শোন নিখিলেশ। আমার এই একটিমাত্র মেয়ে। সুতরাং আমার যা-কিছু সবই তোমাদের। টাকা গেছে, আবার হবে, সে ক্ষোভ নেই। কিন্তু, be steady. হুঁসিয়ার হয়ে নিজের কাজ নিজে বুঝে নাও। পরেশের সঙ্গে পার্টনার-শিপে আলাদা অফিস করবার তোমার দরকার কী?"

আমার মুখে হাসির রেখা আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠল। চোখের পাতাদুটি আরও ভারী লাগছে, সারা শরীরে ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি চেয়ারে এলিয়ে দিলাম নিজেকে।

উনি বোধ হয় এতক্ষণে লক্ষ্য করলেন আমার অবস্থা। একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলেন,—"কী হয়েছে তোমার? শরীরটা খারাপ লাগছে না ত?"

তেমনি মৃদু কণ্ঠেই বললাম,—"না, তা নয়।"

"তবে?"

বললাম,—"বড্ড ঘুম পাচ্ছে। অপরাধ যদি না নেন, একটা কথা বলি। বাকী কথাগুলো কাল বসে নিষ্পত্তি করলে ভাল হয় আমার পক্ষে।"

উনি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, "Sure, Sure! যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। কালই কথা হবে।"

. উঠে দাঁড়ালাম, কোনদিকে আর না তাকিয়ে টলতে টলতে চলে আসছিলাম ঘর থেকে। দরজার কাছ বরাবর পৌঁছেছি এমন সময় পিছন থেকে শুনতে পেলাম অদ্ভুত একটা কথা। অনুচ্চ স্বরে উচ্চারিত হলেও ঠিক কানে এসে বাজল। সুনন্দাই কথাটা বলল তার বাবাকে। বলল,—"পরেশটার সঙ্গে মিশে ছাইপাশ গিলে আসে নি ত?"

চাপা গলায় মিস্টার চ্যাটার্জী ধমকে উঠলেন—"কী যা-তা বলছিস তুই? একটু আগে নীচে যখন ছিলাম, he was quite alright. নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছে। Go and attend him."

ততক্ষণে ওদের ঘর পেরিয়ে বারান্দা দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছি। সুনন্দা বাপের কথার পর কী যেন একটা বলল। কিন্তু কী যে বলল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি ঘরে এসে, কোনক্রমে জামাটা খুলে হুকে টানিয়ে রেখে, প্যাণ্টটা বদলে, কাপড় পড়ে, বিছানায় এসে শুয়ে পরলাম। ঝি-চাকরদের কে যেন এসে একবার বললে,—"ভাত দিয়েছে।"

ততক্ষণে ঘুম এসে আমার শরীরের প্রতিটি পেশী আর স্নায়ুমণ্ডলীকে আবেশে নিথর করে ফেলেছে। কোনক্রমে বললাম,—"খাব না। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যা।"

উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নীল বাল্‌বটা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই আবার টের পেলাম, উজ্জ্বল বাতিটা জ্বলে উঠেছে। কে যেন ঘরে এল, দ্রুতপায়ে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। আমার কপালে হাত রাখল, ডাকল,—"খোকা?"

"মা!"

মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "খাবি না কেন?"

কোনক্রমে বললাম, "ভীষণ ঘুম পেয়েছে।"

"তা বলে না খেয়ে থাকবি?"

"তা হোক।" মায়ের ঠাণ্ডা হাতখানা নিয়ে কপালে-গালে বুলাতে বুলাতে বলে উঠলাম—"লক্ষ্মীটি মা। ঘুমোতে দাও। কতো রাত যে ঘুমাইনি!" মা কিন্তু চলে গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপরে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে আরও উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, "কী হয়েছে, আমায় বল্ তো?"

"কিচ্ছু না।"

মা বললে, "কতোকাল যে ঘুমোই না, এ-কথার মানে কী ?"

"সত্যি মা,"—বলে উঠলাম, "ভীষণ ঘুম পেয়েছে। তুমি যাও।"

মা কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপরে ডেকে উঠল, "বউমা, বউমা ?"

কাছেই, কবাটের বাইরে থেকে সাড়া এল, "আমি এখানে।"

মা চলে গেল তার বউমার কাছে। আর আমার কিছু মনে নেই। সারা রাত উজ্জ্বল আলোটা জলেছিল না নীল আলোটা জলেছিল, তা-ও বলতে পারব না। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘুম ভাঙ্গল পরদিন একেবারে বেলা দশটার পর।

বিছানায় উঠে বসে ঘড়ির দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। সেই রাত থেকে এই এত বেলা পর্যন্ত আমি ঘুমোলাম কী করে, একটানা ? ঘরে তখন কেউ নেই, বাথরুমে ঘুরে এসে ঘরে ঢুকেছি, দেখি টিপয়ের ওপর চা-বিস্কুট রেখে সামনের চেয়ারে মুখ নীচু করে বসে আছে সুনন্দা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। সাদা ব্লাউজের ওপর হাল্‌কা কমলা রঙের একটা শাড়ী পরেছে, মাথার ওপর ঘোমটা তোলা। স্নান সেরে এসেছে বোঝা যায় ভিজে চুলের দিকে তাকালে। ভিজে চুল শুকোয়নি, একগোছা ভিজে চুল ওর ডান কাঁধ দিয়ে বুকের ওপর নামিয়ে দিয়েছে। এক নজরেই মনে হলো, মুখখানা একটু বিবর্ণ—ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, চোখ দুটো একটু ফোলা-ফোলা।

আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা ও নিশ্চয়ই টের পেয়েছে, কিন্তু মুখ তুলে তাকাচ্ছে না, বরং মনে হলো, মুখখানা মুহূর্তে নত করে দিল আরও।

ধীরে ধীরে আমার চেয়ারে গিয়ে বসলাম। টেনে নিলাম চায়ের কাপ। ও মুখও তুলছে না, কথাও বলছে না। কপালের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে, ঠোঁটের ওপরও। মুখখানা ক্রমশ আরক্ত হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, ও যেন নতুন এক অপরিচিত মেয়ে, আমার সামনে এসে চুপ করে বসে আছে। ওর মাথায় যে অত বড় চুলের গোছা, এ-যেন আমি প্রথম দেখলাম। মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠতে যে লাবণ্য জেগে উঠল,—তা-ও যেন প্রথম লক্ষ্য করলাম আমি। একটু লম্বা ধরনের মুখ, চিবুকের কাছটায় একটা অদ্ভুত ছেলেমানুষী মিশে আছে। চোখের পল্লবগুলি ঘন কৃষ্ণ আর নিবিড়। ভ্রূ-যুগলও তাই। কপালটা ছোট, নাসিকা তীক্ষ্ণ এবং সুগঠিত।

চা-টা শেষ করে, গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলে উঠলাম,—"এত বেলা হয়ে গেছে, কেউ আমাকে ডেকেও দেয়নি। খোকা কোথায়, প্রশান্ত ?"

মুখ না তুলে, যেভাবে বসেছিল সেভাবে থেকেই বলল, ধীর গম্ভীর কণ্ঠে,—“মার কাছে।”

“বাবা ?”

“শ্বশুরমশাই ভোরেই বেরিয়ে গেছেন।”

বললাম,—“আর, আমার শ্বশুরমশাই ?”

এইবার চোখ তুলল, কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে ফেলল। বললে,—“তৈরী হয়ে নীচে বসে আছেন। এখুনি বেরুবেন।”

তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম,—“যাই। বাকী কথাগুলো সেরে ফেলি গিয়ে।”

ও বললে,—“উঠতে হবে না। অফিসে আজ বেরোনোর দরকার নেই। বাবা বিশ্রাম নিতে বলে গেছে।”

বললাম,—“তা বলে যেতে পারেন। কিন্তু, আমার দিক থেকেও ত কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে ?”

চোখ তুলল, এবার আর নামাল না। বলল,—“আমাকে বললেই ত হয়। আশা করি উত্তর দিতে পারব।”

বললাম,—“ধার হিসেবে কিছু টাকা নিয়েছিলাম। সেটা—”

বাধা দিয়ে বললে,—“সেটা ত Loan accountএ entry করা আছে।”

বললাম—“জানো দেখছি।”

তেমনি গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল,—“বাবা বলেছে।”

বললাম—“কী ভাবে আমাকে শোধ দিতে হবে, সেটা বলেছেন কী ?”

চুপ করে রইল। চোখ নামাল, মুখখানা আরও নীচু করল।

বললাম,—“শোধ আমি দেবই। তবে একবারে পারব না, ধীরে ধীরে। এটুকু বলে দিও, টাকা আমি মারব না।”

মুখ তুলল সুনন্দা, বেশ দেখলাম, চোখদুটি ছলছল করছে। কোনক্রমে বলে উঠল,—“এসব কথা উঠছে কেন ?”

একটুক্ষণ থেমে থেকে, সোজা হয়ে বসলাম, প্রশ্ন করলাম,—“বলব ?”

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল একমুহূর্ত। তারপরে, সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাতে গেল, কিন্তু পারল না, চোখ নত করল। বলল,—“বললেই ভাল হয়, আমি সব-কিছুর জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছি।”

গলার স্বরে, ভাবভঙ্গিমায়, এমন একটা কিছু ছিল,—যাতে করে একটা

সন্দেহ হঠাৎ ধ্বক্ করে উঠল আমার মনে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে হুকে-টানানো আমার সার্টটার বুক-পকেট দেখতে লাগলাম। যা ভেবেছি ঠিক তাই। পরেশের চিঠিখানা নেই। বুঝলাম, আমি যে অনেক কিছু জেনে গেছি, সেটা ও-ও জেনেছে, হয়তো ওর বাবাও জেনেছেন।

ফিরে গিয়ে বসলাম টেবিলে। ঠিক এই এতক্ষণ পরে অদ্ভুত এক ক্রোধ এসে অধিকার করল আমার মন। স্থির জানি, আমার চিঠি পকেট থেকে ও-ই বার করেছে। কিন্তু, ওর বাবাকে মেয়ে হয়ে সে সব কথা বলতে পারল কী স্পর্ধায় ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দমন করলাম অন্তরের উত্তেজনা। এবং, চিঠির কথা প্রথমেই উত্থাপন না করে পূর্ব কথার জের টানবার প্রয়াস করলাম। বললাম,—"আমার গাফিলতির জন্য ওঁর অনেক টাকা গেছে ; আমি চাই না, যা গেছে, তার থেকে আরও বেশী যাক।"

মুখ নীচু করে শান্তভাবেই আমার কথাগুলো শুনে চলেছে সুনন্দা। বললাম,—"এইসব অফিস-টফিস আমার আর ভাল লাগছে না।"

ভেবেছিলাম, হয়ত কোন প্রশ্ন করবে। কিন্তু করল না। যেমন ছিল, তেমনি শান্তভাবেই বসে রইল। একটু রুক্ষ কণ্ঠেই এবার বলে উঠলাম,—"আমার জামার পকেটে একটা-কিছু ছিল, তুমি নিয়েছ ?"

আস্তে, মাথাটা একটু নেড়ে জানাল,—"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

চোখ তুলল আমার দিকে। চোখদুটো যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠে পরক্ষণেই নিভে গেল। মুখ নীচু করে বলল,—"দরকার ছিল।"

"কী দরকার ?"

চট্ করে মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তারপরে বলে উঠল,—"আপনি বুঝবেন না।"

'তুমি' থেকে 'আপনি'। আমি উত্তরে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। একসময় যেন আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম আগে,—"আমার মা জানে ?"

"না।"

"তোমার বাবা ?"

"জানে।"

বলে উঠলাম,—"ওঁকে জানানো কি খুবই দরকার ছিল ?"

"ছিল।"

"কেন ?"

তেমনি নিস্পৃহ-নিষ্ঠুর গলায় বললে,—"আপনি বুঝবেন না।"

কয়েক মুহূর্ত আবার চুপচাপ। বললাম—"ওর reaction ?"

চুপ করে রইল। বললাম—"বেশ। কথাটার উত্তর না হয় না-ই দিলে, কিন্তু, জানতে পারি কী, চিঠিটা এখন কার কাছে ?"

"আমার কাছে।"

"পেতে পারি কী ?"

"না।"

"কেন ?"

চোখ দুটো ওর দেখতে-দেখতে ভরে এলো জলে। কোনরকমে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে,—"থাক না এটা আমার কাছে ?"

"কিন্তু, কেন ? মানহানির মামলা করবে ?"

ঘৃণায় ঠোঁট ওর বেঁকে গেল। বললে,—"ছিঃ !"

চুপ করে রইলাম। ও মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ দুটো মুছতে লাগল। আমি শুরু করলাম,—"দেখ, আমি ভেবে দেখলাম, আমাদের সম্পর্কে ছেদ পড়াই ভাল।"

'হ্যাঁ' 'না' কোন উত্তরই দিল না। তাকাল না পর্যন্ত আমার দিকে। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, কথাটা ও আগেই চিন্তা করে নিয়েছে। কথাটা যে ওর কাছে অপ্রত্যাশিত, এমন মনে হলো না।

বললাম,—"দু-একদিনের মধ্যেই আলাদা বাসায় যাব। খোকা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, ও তোমার কাছেই থাক। একটু বড হলে ওকে নিয়ে যাব।"

আর পারল না সুনন্দা, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল! প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে গিয়েও পারল না। বললাম, "কাঁদছ কেন ? আমি কি অসঙ্গত কোন কথা বলেছি ? অথবা তোমার কি মনে হচ্ছে, আমি মিথ্যা কোন ধারণা পোষণ করেছি ? মিথ্যে হলে, সেটা তোমার এক্ষুনি শুধরে দেওয়া উচিত।"

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কান্নাভেজা কণ্ঠে বললে,—"মিথ্যা হবে কেন !"

একটু অবাকই হলাম। ও যে সোজাসুজি এমন করে সব কিছু স্বীকার করে বসবে, এতটা ভাবতে পারিনি। বললাম,—"বিয়ে করে আমি অবশ্য 'জাতে' উঠেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলব, এটা উচিত হয়নি। তোমাব আবার বিয়ে না দিলেও পারতেন!"

কোন উত্তব দিল না সুনন্দা। মুখ ফিবিযে আবার বুঝি অশ্রু সংববণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, চেয়ার সরিযে ঘরের বাইরে এলাম। বাইরে কেন, একেবারে নীচে, অফিস-ঘরে। শুনলাম, মিস্টার চ্যাটার্জী এইমাত্র গাড়ী নিযে কোথায বেবিয়ে গেলেন। আমি আর দেরী না করে তখ্খুনি ফোন করলাম পবেশকে। ওর বাড়ীতে ওকে পেলাম না, পেলাম অফিসে। জিজ্ঞাসা করল,—"কী খবর? চিঠি পেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

বলল,—"মানসিক উত্তেজনার বশে ওটা লেখা ঠিক হযনি। ওটা ছিড়ে ফেলো।"

"অতোই সহজ?"

"কেন?"

বললাম,—"চিঠি এখন সুনন্দার হাতে। যা লিখেছ, তার সত্যতা ও অস্বীকার করে নি, বরং দেখলাম সহজেই মেনে নিল।"

"তারপর?"

বললাম,—"তারপর আবার কী? নতুন বাড়ীটা তুমি কিনে নাও। আমি ভাড়াটে হিসাবে থাকব, মাকে আর বাবাকে নিযে।"

"সে কী? তুমি কিনবে না কেন?"

বললাম,—"না ভাই, burgain করতে আর চাই না! তাছাড়া, আমার টাকাই বা কোথায়?"

ও জানাল,—"টাকা ত ধার হিসাবে আমি দিচ্ছিলাম!"

বললাম,—"শ্বশুরের ধার আর তোমার ধার, যোগফলটা একবার কষে দেখ। এতোটা বইতে পারব না। বাড়ীটা তুমিই নাও, আমাকে দোতলাটা ভাড়া দাও। তারপর কোনদিন যদি 'দিন' আসে—"

ও আর প্রসঙ্গটা বাড়াল না, বললে, "I follow you. বুঝতে পারছি।"

বললাম,—"আরও একটা কথা। আমাদের সম্পর্কে ছেদ পড়ছে।"

"সেটা অনুমান করতে পারছি। কিন্তু 'ছেদ' কি আইনের সাহায্যে—?"

বললাম,—"না। আইনের থেকেও যা বড, সেই অন্তরের সুগোপন নির্দেশে।"

ও জানাল,—"এ ও বুঝলাম। কিন্তু, নিজেকে বড অপবাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এর জন্য আমিই দায়ী। জীবনেব কতগুলি সত্য আছে, যা না ব্যক্ত কবলে চলে। ব্যক্ত না কবলে তুমি তো কিছুই জানতে পাবতে না?"

বললাম,—"সে-সব কথা সাক্ষাৎকাবে হবে। এখন তোমাব সাহায্য যে দরকাব। আমি আজই shift কবতে চাই। অথচ, বাডীটা তুমি বেজেস্ট্রি না করে কেনা পযন্ত—"

ও বললে,—"তাব জন্য ভেবো না, বাডীটা আমাব পজেশনেই আছে। বর্তমান মালিক কোন আপত্তিই কবতে পাববে না। আজই চলে আসতে পাব।"

"তোমাব গাডীটা পাঠাবে?"

"কখন?"

"ধবো, বেলা আজ তিনটে?"

বললে,—"তা পাঠাচ্ছি। কিন্তু গাডীতেই কি হবে? জিনিষপত্র—"

বললাম, "জিনিষপত্র নিজস্ব এমন কিছুই নেই। কযেকটা ট্রাঙ্ক আব বেডিং। ফার্নিচাব নেই। বড়ো জোব দুটো ট্রিপ।"

ও জানাল, "ঠিক আছে। কিছু ভেবো না, আমি সব ঠিক কবে দিচ্ছি।"

ফোন ছেডে দিযে বসে পডলাম চেযাবটায, ধপ্ কবে।

আব, তাবপব? স্নান খাওযা সবই হযে গেল। স্বাভাবিক ভাবে কোথাও যে কোন ছন্দপতন হযেছে, এমন কিছু মনে হলো না বাইবে থেকে বাবা এলেন। খেতে বসলেন। খাওযা শেষ কবে গেলেন নিজেব ঘবে আমাব তখন বাক্স টাক্স গোছানো হযে গেছে। ধীবে ধীবে ওব কাছে গিয়ে বসলাম।

অবাকই হলেন বোধ হয় একটু। বললেন,—"কী বে, খোকা?"

একটা কাগজে নতুন বাডীব ঠিকানাটা লিখে এনেছিলাম। সেটা নীববেই ওব হাতে তুলে দিলাম। উনি সেটা পডলেন। পডে বিস্মিত হলেন আবও বললেন,—"কার বাডী?"

বললাম,—"আপনি কি এখুনি বেরুবেন?"

"হ্যাঁ।"

বললাম,—“সেইজন্যই ঠিকানাটা লিখে এনেছি। বেলা তিনটে নাগাদ ঐ ঠিকানায় আমরা উঠে যাচ্ছি। আপনি যখন ফিরবেন, এ-বাড়ীতে না এসে ও-বাড়ীতেই যাবেন।”

থমথমে গম্ভীর মুখে কী-যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপর, হঠাৎ-ই মুখ তুললেন একসময়, বললেন,—“এখানকার চাকরী কি ছেড়ে দিচ্ছ?”

“হ্যা।”

“বউমা যাবেন?”

“না।”

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে একসময় উঠে দাঁড়ালেন, গায়ে জামাটা দিলেন; বললেন,—“বেশ, যা বলছ, তা-ই হবে। নতুন ঠিকানাতেই ফিরব।”

একটা ছোট্ট ব্যাগ ছিল ওঁর। সেটা হাতে তুলে নিলেন। তারপরে, দেখতে-দেখতে বাড়ীর গেট্ ছাড়িয়ে পড়লেন পথে। পরক্ষণেই আর ওঁকে দেখা গেল না। ‘ফ্যান দাও—বাঁচাও’দের দলে যেন মুহূর্তে মিশে গেলেন।

মার কাছে গেলাম এর পরে। বললাম,—“গুছিয়ে নাও। তিনটেয় গাড়ী আসছে। নতুন বাড়ীতে গিয়ে থাকব।” চিত্রার্পিতের মত তার পূজোর ঘরে চুপচাপ বসেছিল মা। বলল,—“বউমা আমাকে বলেছে।”

“কী বলেছে?”

“তুই চাকরী ছেড়ে দিয়েছিস। চলে যাচ্ছিস।”

“আর কী বলেছে?”

মা বললে,—“আর বলেছে, বৌমার সঙ্গে তুই আর সম্পর্ক রাখবি না।”

জোর করে মুখ ফিরিয়ে রইলাম অন্যদিকে, কিছু বললাম না। মা এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরল, বলল,—“আয় দেখি আমার সঙ্গে। যত সব ছেলেমানুষ!”

“না।”

মা ফিরে দাঁড়াল চট্ করে, তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল,—“না কী? আয় শীগ্‌গির?”

এবং আমাকে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গেল মায়ের বেয়াই মশাইয়ের ঘরে। ভদ্রলোক খাওয়া দাওয়া সেরে সবেমাত্র একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দরজার কাছ থেকেই মা ডাকল—“বেয়াইমশাই?”

ভিতর থেকেই সাড়া এল,—"আসুন।"

মা আমাকে নিয়েই ভিতরে ঢুকল, বলল,—"বউমা কোথায়?"

"তার নিজের ঘরে নিশ্চয়।"

মা বললো,—"শুনেছেন? ছুটিতে কী কাণ্ড করেছে?"

অস্ফুট কণ্ঠে উনি বললেন—"কী কাণ্ড!"

মা বললে,—"কী না কী ঝগড়া হয়েছে দুজনের মধ্যে! একজন কেঁদে বেড়াচ্ছেন, আরেকজন বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! আমাদের হলো মুশকিল, দাদুমণিকে ছেড়ে থাকব কী করে আমি?"

মিস্টার চ্যাটার্জীর বয়স যেন বেশ কয়েক বছর বেড়ে গেছে, এমনি বিপর্যস্ত চেহারা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"এটাই কি তোমার শেষ সিদ্ধান্ত?"

"হ্যাঁ।"

মা বললে,—"হ্যাঁ কী! বেয়াইমশাই, এই সব ছেলেমানুষদের ওপর আপনিও রাগ করছেন? যাবে কোথায় ও? কতটুকু ওর ক্ষমতা?"

মিস্টার চ্যাটার্জী ম্লান একটু হাসলেন। তারপর বললেন,—"বেয়ান ঠাকরুণ, একটা কথা বলি। ওরা যা করছে, ওদের তা করতে দিন। ওর মধ্যে আপনার আমার না থাকাই ভাল।"

মা কি যেন আবারও বলতে গিয়েছিল, আমি মাকে একেবারে ধরেই বাইরে নিয়ে এলাম বলা যায়। মা তখনও বললে,—"কী কাণ্ড বাঁধিয়েছিস বল ত?"

বললাম,—"কিছু কাণ্ড না। এস আমার সঙ্গে। জিনিসপত্র গোছাতে

পরেশের গাড়ী এল ঠিক তিনটের সময়। সঙ্গে, অফিসের একজন বেয়ারা। তাকে দিয়ে জিনিষপত্র সব পাঠিয়ে দিলাম। বললাম—"সাহেবকে গিয়ে বলো, আমরা ট্যাক্সীতে যাচ্ছি। সাহেব কোথায়?"

"নয়া কোঠিমে।"

"ঠিক হ্যায়।"

এরপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ট্যাক্সী ডাকতে বলে মিস্টার চ্যাটার্জীর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে গেলাম। ওঁর ঘরের সামনে—বারান্দাতেই পায়চারী করছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, "যাচ্ছি।"

উনি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন, ধীর মৃদু গলায় বললেন, "এসো।"

কিন্তু, তারপরেই আর অপেক্ষা করলেন না, দ্রুতপায়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। পর্দাটা মুহূর্তের জন্য আন্দোলিত হয়েই স্থির হয়ে গেল।

নীচে থেকে চাকরটা চেঁচিয়ে বললে,—"ট্যাক্সী আয়া, সাব।"

"ঠিক হ্যায়।"

মাকে নিয়ে গিয়ে বসালাম ট্যাক্সীর ভিতরে। মা কাঁদছিল। বিরক্ত হয়ে বললাম,—"কাঁদছ কেন?"

মা এবার স্পষ্টতই ফুঁপিয়ে উঠল,—"আমার কমল রে!"

বাস্তবিক, দীর্ঘদিন কমলের কোন খবর নেই। এডেন থেকে যে চিঠি লিখেছিল, সেই চিঠিই—শেষ চিঠি। মিলিটারী হেড-কোয়াটার্সে খোঁজ নিয়েছিলাম, ইটালীর সমরাঙ্গন থেকে জার্মান-সীমান্তে অবতরণ পর্যন্ত কমলের সংবাদ ওরা দিয়েছিল, তারপরে আর খোঁজ নেই। হয় সে অপর পক্ষের হাতে বন্দী, আর নয়ত, সে এ-পৃথিবীতেই আর নেই!

মায়ের তীব্র বেদনাকে অনুভব করেও মাকে থামাতে হলো। থামাতে হলো প্রায় ধমক দিয়েই বলা যায়।

মা ট্যাক্সীতে বসে কিছুটা সামলে নিল। তারপরে বললে,—"ওরে, যা হবার হয়েছে। নূতন বাড়ীতে চলছিস, চল। কিন্তু, বৌমাকেও নিয়ে আয়, দাদুমণিকে কোলে না নিয়ে বাঁচবই বা কী করে?"

"হয়েছে হয়েছে,—থাম, আর কান্না নয়!"

বলে, আমি ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে রেখে আবার ভিতরে গেলাম। ওপর-তলায়। আমার পূর্বতন ঘরে। এবং যাওয়ামাত্রই আমার পায়ের কাছে খোকাকে ধপ করে নামিয়ে রাখল সুনন্দা। বলল,—"ওকেও নিয়ে যান।"

বললাম,—"না, তার জন্য আসিনি। শেষ একটা কথা বলতে এসেছিলাম। চিঠিপত্র যদি কিছু আসে—"

ও মুহূর্তে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল, বলল,—"মুক্তি যখন দিয়েছেন, তখন সর্ববিষয়েই মুক্তি দিন। ওকে নিয়ে যান। ও ঠাকুমার ভক্ত, ওর কষ্ট হবে না থাকতে।"

খোকাকে কোলে তুলে নিলাম। ও হঠাৎ করল কী, আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। দুটি হাত আমার দুটি পায়ে রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলতে লাগল,—"আপনি ব্রাহ্মণ, পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলব না। বিশ্বাস করুন, ও আপনারই সন্তান।"

মুহূর্তে, মা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বাড়ীর প্রাঙ্গন পার হয়ে ফটকের কাছাকাছি এসেছি, ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। আমি ওকে বুকে চেপে ধরে ট্যাক্সীর দিকে প্রায় ছুটতেই লাগলাম, বলা যায়।

মা বলল, "বৌমা?"

"এল না। তোমার নাতিকে নাও।"

মা-ও তার নাতিকে কোলে নিল, আমিও উঠে বসলাম,—ট্যাক্সীও 'হুস্‌' করে ছেড়ে দিল। পথে পথে বুভুক্ষুর দল আর্ত ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করে ফিরছে,—'ফ্যান দাও মা, একটু ফ্যান!'

অবারিত বন্যার বুকে গাছের ডালে বাসা বেঁধেও মানুষ বাস করে। প্রথমে ভীতি আর আতঙ্ক,—তারপরে, সে-দুঃসহ অবস্থাও ক্রমশঃ মানুষের সয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যে নিজের মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক লক্ষ্য করে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম; দেখলাম,—আমার কাজ আর সংসার নিয়ে আমিও ক্রমশঃ সহজ হয়ে গেছি, অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

পরেশ বাড়ী-কেনার সম্পর্কে আর কোন কথা বলে নি। আমি তার ভাডাটে হয়েই সম্পূর্ণ দোতলাটা ভোগ করতে লাগলাম,—'পাঁচখানা মাঝারী ঘর-কিচেন-স্টোর-বাথরুম'-সমেত সম্পূর্ণ দোতলা।

পরেশ অফিসে একদিন বললে,—"আজ বাড়ী রেজেস্ট্রী করা হয়ে গেল। আমি কিনে নিলাম, বুঝলে?"

একটু হেসে বললাম,—"তা-ই ত কথা ছিল।"

তখন আর কিছু বলল না, একদিন বাড়ী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে, অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে দেখা করে,—তার অধিকার সম্পর্কে ব্যাপারটা 'পাকা' করে গেল বলা যায়।

এ-বিষয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। আমি যথাসময়ে যথারীতি নির্ধারিত ভাড়া গুণে যেতে লাগলাম পরেশের নামে। পরেশের সঙ্গে ব্যবসা করি, অফিসে যাই, ওর সঙ্গে ঘুরি,—কিন্তু, আমার কর্মোদ্যম বহুলাংশে কমে গেল। যা সই করতে বলে সই করি, যা দেখতে বলে দেখে আসি; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমি যেন চিরকালের জন্য 'অন্যমনস্ক' হয়ে গেছি। অথচ, সব-সময় কিছু যে নিবিষ্টমনে চিন্তা করি, এমন নয়।

কিছুদিনের মধ্যে পরেশেরও লক্ষ্য পড়ল এটা। বলল,—"সব বিষয়ে

এমন detached হয়ে গেল কেন? কেমন যেন নির্জীব, নিরুৎসাহ! ব্যাপার কী? ভুলতে পারছ না?''

"কাকে!"

মুখে বললাম বটে, কিন্তু ভিতরটা যেন প্রচণ্ড চমকে থরথর করে কেঁপে উঠল। কোন একজনকে কি ভিতরে-ভিতরে সত্যিই সমসময়ে ভেবে চলেছি?

পরেশ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে,—''আমিই দায়ী। বুঝতে পারছি ভাল কাজ করি নি।"

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—''তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে ও মুক্তিই চাইছিল আমার কাছ থেকে।"

পরেশ বললে,—''অবাক হই, ছেলেটাকে পর্যন্ত তোমার হাতে তুলে দিল কেমন করে?"

আমি স্তব্ধ হয়ে আছি লক্ষ্য করে, নিজেই যেন নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এমনভাবে বলতে লাগল,—''না হে, মেয়েরা সব পারে। এই সেদিনও দেখলাম, ফুটপাত ধরে হেঁটে চলেছে সেই অজিতবাবুর সঙ্গে। মাথায় ঘোমটা নেই, কুমারী মেয়ের ভাবভঙ্গী। এবার সিঁদুরটা মুছে ফেললেই ত হয়!"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম,—''ও প্রসঙ্গ থাক।"

"কিন্তু, ভুলতে পারছ না যে?"

বললাম,—''তা অবশ্য পারছি না, কিন্তু কাকে তা জান? সম্ভবতঃ সে সুনন্দা নয়।"

'আকাশ থেকে পড়া' বলে একটা কথা আছে না? পরেশের হলো যেন ঠিক সেই অবস্থা। কিছুক্ষণ 'হাঁ' করে থাকবার পর, অবশেষে বললে,—''সুনন্দা যদি না হয় ত, সে আবার কে? তোমার জীবনে আর কোন নায়িকা আছে নাকি?"

পরেশের এই সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো নীরব হয়ে রইলাম। ওর মুখে উচ্চারিত "নায়িকা" শব্দটি নতুন এক আবেশ সৃষ্টি করল মনে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও উপলব্ধি করলাম,—জীবনে 'স্ত্রী' নায়িকা হতেও পারে, না-ও পারে।

পরেশ লঘুকণ্ঠে বললে,—''কী হে, মুখে 'রা' নেই কেন?''

অল্প একটু হেসে বললাম,—"অন্তর যখন 'রা'-এ ভরপুর হয়ে যায়, মুখে তখন সত্যিই কথা ফুটতে চায় না।"

ও ব ,,র,—"'হলে কথাটা উঠিয়ে অন্তরে তোমার ঢেউ তুলে দিয়েছি, বলো!"

"তা তুলেছো।"

"কে তিনি? বলবে?"

বললাম,—"চিনবে না তাকে। তার নাম—মায়া।"

"কবে এলেন তিনি, বিবাহের পূর্বে না পরে?"

হাসলাম, বললাম,—"পরে হলে কি তোমার অন্তত অজানা থাকত?"

মুহূর্তে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল পরেশ। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে, একসময়ে যেন চমক ভেঙে জেগে উঠে বলল,—"তোমাদের দুজনেরই পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। দোষ দিতে হয়, দুজনকেই দিতে হবে। নারী বলে সে-ই শাস্তি বেশী পাবে কেন?"

তর্কের ঝড় তোলা যেত, কিন্তু ইচ্ছা করল না। মনটা মুহূর্তে যেন ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হলো, পরেশ কি কথাটা ঠিক আমাকেই উল্লেখ করে বলেছে? না, নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছে তার নতুন উপলব্ধির বাণী?

পরেশ কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন চিন্তার বোঝাটা সরিয়ে দিয়ে সহজ মানুষ হয়ে উঠল। এ-প্রসঙ্গের ওপর সম্পূর্ণ যবনিকাপাত করে চলে গেল ভিন্নতর বিষয়ে। প্রশ্ন করল,—"হ্যাঁ হে, তোমার বাবাকে বেশী দেখতে পাই না কেন?"

অল্প একটু হেসে বললাম,—"দেখার দরকারটাই বা কী?"

পরেশ বললে,—"কথাটা লঘু করে দিও না। সেদিন তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম, মাসীমা অনেক কথাই বললেন। বললেন—প্রায়ই বাড়ী থাকেন না। কখন আসেন, কখন যান তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মাসীমার কথা ত শোনেন না, তুমিই একদিন ডেকে বল না?"

বললাম, "না পরেশ, আমার কথাও শুনবেন না। জীবনে কখনো কারুর কথা শোনেনও নি। কিন্তু থাক ওঁর কথা, ওঁকে ওঁর মতই থাকতে দাও।"

পরেশ বললে,—"মাসীমা কিন্তু, রাগ করছিলেন। বলছিলেন,—ময়লা জামাকাপড় পর্যন্ত বদলান না। তাই নিয়ে দিনরাত ঘোরেন, যারা চেনে তারা বলবে কী?"

বললাম,—"সে বলাবলির ধার মা যতটা ধারেন, বাবা ততটা ধারেন না। কিন্তু, ছেড়ে দাও ওসব কথা।"

পরেশ বললে,—"মাসামা কাঁদলেন আমার কাছে। হ্যাঁ হে, কু...লের খবর কিছু পেয়েছ? মাসীমা ত ধরে নিয়েছেন, সে আর বেঁচেই নেই!"

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। ও আবার বললে,—"খবর কিছু পেয়েছ?"

ধীরে ধীরে বললাম,—"মাকে এখনো জানাই নি। চিঠি এসেছে। সামরিক বিভাগের ধারণা, হয় সে বন্দী আর নয়ত—" কথাটা শেষ করতে পারলাম না। পরেশ বুঝল। বুঝে আর কিছু বলল না, কাজের একটা অছিলা করে উঠে চলে গেল কাছ থেকে।

আমার এখন সন্দেহ হয়, সে-সময় আমার মনটা অসাড় হয়ে গিয়েছিল। দেহের কোন অংশের পক্ষাঘাত হলে, যেমন সে-অঙ্গের আর কোন সাড়া থাকে না,—তেমনি মনেরও অমন নিঃসাড় অবস্থা আসতে পারে। এবং, তা যে সত্যিই পারে, একথা আমার থেকে সেদিন বেশী করে জানত কে?

পরেশ আমাকে ধরে একদিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার বললে,—"Over-worked, বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন। বিশ্রাম নিন, আর টনিক খান।"

পরেশ বললে,—"তাই-ই করো। অফিস আমি দেখব।"

অল্প একটু হেসে বললাম,—"তুমিই ত দেখছ?"

"না-না, তোমার কাজও আমি দেখব।"

বললাম,—"একটা কথা বলব পরেশ?"

"কী?"

বললাম,—"শ্বশুর মশাইয়ের টাকা শোধ করতে এখনো পারিনি?"

ও বললে,—"ভেবো না, সে ব্যবস্থা শীগগিরই হয়ে যাবে।"

"কী করে?"

ও বাঁকা একটু হাসল, বলল,—"গো-ডাউন নিয়েছি। স্টক্ করছি।"

"কী?"

"চাল।"

শিউরে উঠলাম। রোজ সকালে কাগজ খুলেই দেখি, হাসপাতালে নিরন্নদের মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। রাস্তায় ফুটপাথে মানুষ মরছে প্রায়ই! রাস্তায়-ঘাটে ক্ষীণকণ্ঠে—'ফ্যান্ দাও' 'ফ্যান্ দাও'! বলতে বলতে আসে যায় বুভুক্ষু কঙ্কালের দল, কখনো ধপ্ করে বসে পড়ে, তারপর লুটিয়ে পড়ে

ফুটপাথের ওপর, আর ওঠে না। শরীরে দু-একবার আক্ষেপ জাগে, ঠোঁটের কোণে হয়ত বা রক্ত—ব্যস্, তারপরেই সব শেষ।

আতঙ্কিত, বিহ্বল কণ্ঠে পরেশকে বলতে লাগলাম,—"না ভাই না, 'সঞ্চয়'-এ দরকার নেই, বিলিয়ে দাও ওদের মধ্যে সমস্ত চাল!"

পরেশ বললে,—"বোকামী করো না। ওদের জন্য বরং লঙ্গরখানা খুলে দিচ্ছি, সেখানে কিছু টাকা দিয়ে মনের খেদ মেটাও, কিন্তু, এ-রকম মনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। টাকা না হলে চলবে কী করে তোমার? শ্বশুরের অতগুলো টাকা, শোধই বা দেবে কী করে?"

পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিঃসাড় মনে আর কোন কম্পন জাগল না। পরেশের কথাই মেনে নিয়ে ধীর পায়ে বাড়ী এলাম। খোকনকে কোলে নিয়ে বুড়ি ঝিটি বারান্দায় দাড়িয়েছিল, আমাকে দেখতে পেয়েই ভিতরে সরে গেল তাড়াতাড়ি।

ছেলেটাকে রোজই দেখি, রোজই কোলে নিয়ে আদর করি, কিন্তু আজ, ওকে অমনভাবে দেখে হঠাৎ মনে হলো,—অনেক রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা! বুড়ী-ঝিটি সুনন্দার খাস-ঝি ছিল, সুনন্দার থেকে ও-ই খোকনকে কোলে-কোলে রাখত বেশী। সেই টানে আমরা চলে আসবার পরদিনই ও এসে উপস্থিত হয়েছিল। বলেছিল,—"খোকনমণিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবুনি বাপু। যে পেটে ধরেছে সে নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে পাবে, আমি পারবুনি,—তাই চলে এনু।"

বুড়ীর কথা বলার ধরনটা একেবারে ঠিক আমাদের ছোটবেলার সেই মানুদি বা মানদার মত। মানুদি আজও বেঁচে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তারও টান ছিল আমাদের ওপর ঠিক এমনিই—অসাধারণ।

বলা বাহুল্য, এই বুড়ী ঝি-টি আসাতে খোকন-সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম। মা খোকনকে ভালবাসলেও, সব-সময় ওর তদ্বির করা, মার দ্বারা আজকাল ঠিক হয়ে ওঠে না। মা পূজা-আচ্চায় যতটা মন দেয়, সময় দেয়, ততটা সংসারের ব্যাপারে দিতে পারে না।

খোকনের শরীর কিন্তু তেমন সারছে না। চোখ মেলে যখন তাকায়, তখন বড় করুণ মনে হয় ওর দৃষ্টি। আজকাল কাঁদে কম, দুষ্টুমিও করে কম,—কেমন যেন শান্ত, স্তব্ধ, নিস্তেজ হয়ে গেছে।

এমনদিনে বাবাকে দেখলাম আমরা, হঠাৎ! বাবা বাড়ী আসতেন না, কোথায় থাকতেন, কী করতেন, কিছুই জানতাম না। তাই ওঁকে সেদিন

দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম বলা যেতে পারে। ছুটিতেই ত তখন দিন কাটাচ্ছি? দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল,—বাবা। এক রক্তাপ্লুত বুভুক্ষুকে দুহাতে করে তুলে নিয়ে এলেন একেবারে বাড়ীর ভিতরে। নিয়ে এসে, শুইয়ে দিলেন একটা চাতালের ওপরে। কঙ্কালসার মানুষটির হাতের কাছটিতে রক্ত, মাথায় রক্ত, হাঁটুর কাছে রক্ত আরও বেশী,—বাবা নিজের হাতে পরিষ্কার করছেন ওকে, পাশেই পকেট থেকে বার করা ছোট্ট একটা শিশি। টিংচার আয়োডিন। আর আছে তুলো।

মুমূর্ষুর ওপর মাঝে মাঝে হাহাকার করে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে অপর একটি স্ত্রী-কঙ্কাল, সম্ভবতঃ লোকটির স্ত্রী।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাবার কাছে এগিয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম,—"কী ব্যাপার?"

বাবা মুখ ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন শুধু, আর কিছু বললেন না।

"গাড়ী চাপা পড়েছে।"—দোতলার ভিতরকার বারান্দা থেকে মা একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল,—"কিন্তু, কী দরকার বাপু ওসব ঝঞ্ঝাট পোয়াবার! হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও না?"

"তাই দিন।" বলে উঠলাম,—"আর নয়ত কল দিন কাউকে।"

"তার আর কোন দরকার হবে না।"—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন বাবা। তাকিয়ে দেখি, পুরুষটির রক্তাপ্লুত দেহটা ততক্ষণে নিথর—নিস্পন্দ—স্তব্ধ হয়ে গেল।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "মারাই গেল?"

"হ্যাঁ।"

মা বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, তাড়াতাড়ি, নীচে। লোকটির স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে নির্জীবের মতো পড়ে আছে ওর পায়ের ওপর।

রাগ করে বাবাকে বললাম,—"হলো ত? এবার ঝঞ্ঝাট পোয়ান সহস্র রকম!"

কোন উত্তর দিলেন না বাবা, দুই প্রসারিত হাতে তুলে নিলেন সেই শক্ত দেহটা, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন রাস্তার দিকে,—স্ত্রী কঙ্কালটি পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে দেহটার ওপরে।

নিশ্চল একখণ্ড প্রস্তরস্তূপে পরিণত হয়েছিলাম যেন আমি। চোখের সামনে থেকে বাবার শরীরটা পথের বাঁকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, আমি না পারলাম নড়তে, না পারলাম ডেকে উঠতে!

ওপরের বারান্দা থেকে মার গলার স্বর ভেসে আসতে যেন সম্বিত ফিরে পেলাম আবার। মা ডেকে বললে,—"তুই উঠে আয় খোকা। তোর রোগা শরীর, তুই যেন পিছন-পিছন যাস নি!"

বিনাবাক্যব্যয়ে মার কথামতই ওপরে উঠে এলাম আমি। কিন্তু দিন আমার কাটে কেমন করে? যাকে সবাই 'ছুটি' বলে, সেই 'ছুটি' যে এমন অসহ্য হয়ে উঠবে—একি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম? এর থেকে পরেশের অফিসে গিয়ে অঙ্ক কষা, খাতা মেলানো আর সই করা,—অনেক ভাল ছিল।

অসহিষ্ণু হয়ে মাকে একদিন বলি,—"বাবার কী হলো বলো ত? সেই যে চলে গেলেন মরা লোকটাকে দুহাতে তুলে, তার পরে আর কোন খোঁজই নেই!"

মা ঠোঁট উলটে বললে,—"আছে নিশ্চয়ই কোথাও। ও আর ভেবে করবি কী?"

"খোঁজ করব?"

"কোথায় খোঁজ করবি?"—মা বললে,—"তার নিজের ইচ্ছা না হলে তাকে দিয়ে কিচ্ছুটি করাবার উপায় নেই! সে যদি লুকিয়ে থাকবার মন করে,—তাকে খুঁজে বার করবে কে?"

আর কোন কথা হলো না। দিনকতক পরে, আবার অফিসে বেরুতে আরম্ভ করলাম আমি। পরেশের সঙ্গে গিয়ে এখানে-ওখানে বাবার সন্ধান করেছি, দেখা মেলে নি। মার সে নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই দেখা গেল। বরং, একরাত্রে ঘটল এক ভিন্নতর ঘটনা। বাড়ী ফিরে এসে ক্লান্ত দেহটা ডুবিয়ে দিয়েছি নরম একটা সোফায়, মা বললে,—"আজ ও-বাড়ী গিয়েছিলাম।"

"কোন্ বাড়ী!"

মা বললে,—"বৌমার বাড়ী।"

"কেন?"

মা বললে,—"বৌমাকে নিয়ে আসতে।"

"হঠাৎ?"

মা বললে,—"আমি আর কত সামলাব, যার সংসার সে না থাকলে

চলে ? চেয়ে দেখ ছেলেটার অবস্থা, মাকে ছেড়ে ঐটুকু ছেলে থাকতে পারে নাকি ?"

গম্ভীর হয়ে গেলাম। মা আমার ভাবটা তত লক্ষ্য না করে নিজের মনেই বলে যেতে লাগল,—"অনেক করে বললাম, তবু এল না। তুই একবার যাবি খোকা ?"

মুখ তুললাম, বললাম,—"আচ্ছা মা ?"

"কী ?"

"ঐ যে বুড়ি ঝি-টা এসেছে, এর সঙ্গে তোমার বউমার সম্বন্ধে কোন কথা হয়েছে কোনদিন ?"

মা অবাক হয়ে বললে,—"একটা ঝির সঙ্গে আমার আবার কী কথা হবে ? হয়নি ত।"

বুঝলাম, সুনন্দার জীবনের নিগূঢ় ঘটনার সংবাদ মা এখনো জানে না, শোনে নি।

হঠাৎ কী হলো আমার মধ্যে কে জানে, একটা উৎকট নিষ্ঠুরতা আমার মনটাকে যেন নিষ্পেষিত করতে লাগল। সোজা মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম,—"আর যেও না তার কাছে। সে কখনো আসবে না।"

"ইস্, আসবে না। বললেই হলো ? ছেলে রয়েছে না ?"

বললাম,—"তাহলেও আসবে না। চিরতরে মুক্তি নিয়েছে।"

"কী বলছিস তুই ?"

বললাম,—"তার থেকেও কঠোর কথা তোমার শোনবার আছে মা। তুমি ব্যথা পাবে বলে এতকাল বলি নি। অজিতবাবু বলে একটা লোক ওদের বাড়ীতে খুব যায়, জানো ?"

মা বললে,—"তা ত নিজের চোখেই দেখলাম। আমার কাছে এসে ছেলেটি আমাকে প্রণাম করল। বউমাকে বুঝি পড়াচ্ছিল বসে বসে। জিজ্ঞাসা করলাম,—বেয়াই মশাই কোথায় ?"

"কী উত্তর পেলে ?"

মা বললে,—"তিনি আজ কাল কলকাতাতেই আছেন, অফিস নিয়ে খুব ব্যস্ত। বাড়ী ফিরতে রাত দশটা এগারোটা হচ্ছে রোজ !"

বললাম,—"যাক তাঁর কথা। ঐ অজিতবাবুর সঙ্গেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিলে পারতেন !"

মা ধমকে উঠল,—"কী বাজে কথা বলছিস!"

বললাম,—"পরেশকে জিজ্ঞাসা করো মা, বাজে কথা নয়। তোমার ছেলের সঙ্গে বড়লোকের মেয়ের বিয়ে হলো কী করে? খুঁৎ ছিল বলেই ত?"

মার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, মুখের সব রক্ত বুঝি শুষে নিয়েছে কেউ! আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললে,—"কী সর্বনাশা কথা বলছিস রে! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!"

বললাম,—"চমকে উঠো না মা। ছেলের বিয়ে দিয়ে তুমি জিততে পার নি, ঠকেছ। তবে, খোকাকে ঘেন্না করো না, খোকা তোমার নাতি সত্যিই।"

মা অস্ফুট আর্তনাদ করে সোফার ওপরে বসে পড়ল। বলতে লাগলাম,—"তোমাকে জানানো উচিত মনে করলাম। আর ঢেকে রেখে কী হবে?"

"ছি-ছি—কী ঘেন্নার কথা!"

বললাম,—"না মা, ঘেন্নার কথা ঠিক নয়। ওদের কাছে নীচু হয়ে ছিলাম, এখন মাথা উঁচু করে আছি। এ কি কম গৌরবের কথা?"

মা বলে উঠল,—"রাখ তোর গৌরব। আমার কেমন যেন ওসব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।"

"কিছু ওলট-পালট নয়!"—বললাম, "ঝামেলা একটু মিটলেই কোর্টে দরখাস্ত করব। Legal separation. তার পরে আর কোন কথা নেই। যা ইচ্ছে সে করে বেড়াক, আমাদের আর কিছু দেখবার দরকার নেই।"

মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে গভীর ভাবে কী যেন চিন্তা করছে মা। এক সময় মুখ তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বললে,—"সেই মায়া মেয়েটি কোথায়?"

ভিতরটা প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠল। গলাটা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল মনে হচ্ছে। প্রশ্ন করলাম,—"কোন্ মায়া?"

মা শান্ত কণ্ঠে বলল,—"কোন্ মায়া আবার! পদ্মাতীরের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলি?"

বললাম,—"বুঝেছি। না মা, তার খবর আমি কিছু জানি না।"

মা বললে,—"বরুণ বলে একটি ছেলে ছিল ওখানে। চিনতিস না?"

"খুব।"

মা বললে,—"তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।"

"তুমি কোত্থেকে শুনলে?"

"শুনেই এসেছিলাম।"

বললাম,—"বেশ ত, তাতে হয়েছেটা কী?"

মা বললে,—"হবে আবার কী! আমি বলছিলাম,—সে মেয়েও কম যায় না। একে যদি ঘেন্না কর, তাকেও কি ফুল বেল পাতা দিয়ে পূজো করবে?"

"মা!"—চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, "তার কথা আসছে কেন আর?"

মা উঠে দাঁড়াল, বলল,—"আমি তোর মা, মনে রাখিস। তোর মনের খবর আমি জানব না ত কে জানবে? তাকে তুমি আজও ভুলতে পার নি। বেশ ত, খুঁজে পেতে বার করো না। করে, বিয়ে কর। আমার কী? আমাকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। আমি বৃন্দাবন চলে যাব।"

বলতে-বলতে গলাটা ধরে গেল মার। চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মা।

বেশ মনে আছে, রাত তখন একটার কম নয়। ঘুম আসছে না, মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে আছে নানান এলোমেলো চিন্তায়। বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারটায় নিজেকে তলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি, সারা বাড়ীর বাতি নেভানো, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশে তারাগুলো জ্বলছে শুধু মিটিমিটি। এময় সময়, সেই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে যেন মিশিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে মা এসে দাঁড়াল কাছে।

আস্তে, মুখ ফিরিয়ে বললাম,—"এ কি, ঘুমাও নি?"

"না।"

"খোকন?"

"ঘুমোচ্ছে।"

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপরে মা-ই কথা বলল প্রথম। বললে,—"খোকা, কোন খোঁজ পেলি?"

"কার!"

মা চুপ করে রইল।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম,—"কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

মা তবুও নিরুত্তর। মুখ নীচু করে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম,—"বাবার?"

ভেসে এল ছোট্ট উত্তর,—"হ্যাঁ।"

চুপ করে রইলাম আমি।

মা বললে,—"সেই যে বেরিয়ে গেছে, আর আসে নি। ঐ তো চেহারা, ময়লা কাপড়, ময়লা জামা! যে পাগল, হয়ত কোথাও খাবার জোটেনি, শেষে খেতে না পেয়ে···!"

প্রায় চীৎকার করে উঠলাম,—"মা!"

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মা,—"এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না! সবসময় মনে হয় আমার কমল গেছে,—এবার আমার আর যা কিছু আছে সব যাবে, অমনি করে না খেতে পেয়ে সব শুকিয়ে মরে যাবে!"

আজ বুঝতে পারছি না, সেদিন কেমন করে কঠিন প্রস্তরস্তূপের মত স্তব্ধ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পেরেছিলাম! কেমন স্বাভাবিকভাবেই আবার সেই অফিস, আর পরেশ পালিতের সঙ্গ—!

বেশ মনে আছে,—এক লঙ্গরখানায় সেদিন গিয়েছিলাম আমি আর পরেশ। পরেশের ভাষ্য অনুসারে, এখানে আমাদের কিছু দান আছে বলেই গিয়েছিলাম আমরা।

দলে-দলে আসছে কঙ্কালসার মানুষ, পাতছে পাতা, এক ধরনের খিচুড়ি-জাতীয় উপকরণ তাদের পাতে এসে পড়ছে, পরিবেশন করছে একদল কর্মী। এই অক্লান্ত পরিশ্রমীদের মধ্যেই ইতস্ততঃ চোখ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ-ই মনে হলো, দলের মধ্যে বাবাকে দেখছি যেন!

উত্তেজনায় কেঁপে উঠল বুক!—হ্যাঁ, বাবা-ই তো!

হাসিমুখে নিরন্নদের অন্ন পরিবেশন করছেন!

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রথমটা ঈষৎ চমকেই উঠলেন মনে হলো, তারপরে একটু হেসে বললেন, "কী রে?"

"আপনি!"

"হ্যাঁ। এই একটু···এদের মধ্যে"—বাবা বললেন, "তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি হাতটা ধুয়ে আসছি।"

ইতিমধ্যে দেখি পরেশ একটি যুবক-কর্মীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছে, ইশারায় আমাকে ডাকতেই কাছে গেলাম। পরেশ বললো—"শোন নিখিল. ইনি কী বলছেন!"

"কী আর বলব!"—ছেলেটী বলল, "উনি আমাদের বিনয়দার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তাই বলছিলাম, বিনয়দা কী যে সে লোক! উনি আমদের প্রাণ, এ যা কিছু দেখছেন, সবই ওঁর নিজের হাতে করা, তবে সরবে নয়, নীরবে; উনি নীরব-কর্মী, খ্যাতি চান না, নাম চান না, মান চান না, উনি চান কাজ!"

বাবা ততক্ষণে এসে কাছে দাড়িয়েছেন। মনে হলো, সত্যিই তো, কোনদিন মানও চান নি, নামও চান নি, আগাগোড়া স্তব্ধীভূত সাধকের মতই চুপচাপ কাটিয়ে এসেছেন! ইচ্ছা হলো, এই নিভাঁজ ঝকঝকে পোষাক নিয়ে ঐ হাতে-পাযে ধুলো, ময়লা জামা গায়ে, ভিখারী রাজ্যেশ্বরের পাযে সাষ্টাঙ্গে লুটিযে পড়ি!

আরও শুনলাম ওর দলের কাজ শুধু লঙ্গরখানায নয, ওরা ফুটপাতে ফুটপাতে ঘুডে বেডান, রোগগ্রস্ত মুমূর্ষুকে নিয়ে যান হাসপাতালে, বস্ত্রহীনকেও যথাসাধ্য বস্ত্র দান করেন, অনাথ শিশুদেরও ব্যবস্থা করেন! বাবার কাছে নতমুখে গিযে দাঁডাতেই সেই মধুর হাসি হেসে আবার বললেন, "কী রে!"

বললাম, "বাডী চলুন বাবা!"

"বাডী"—বাবা একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন, "আচ্ছা চল।"

কর্মীদল ওকে প্রশ্ন করলেন,—"ইনি কী আপনার ছেলে বিনয়দা?"

"হ্যা।"

সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির মধ্য দিযে মাথা নীচু করে আমি এগিয়ে যাই। উনি আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, যেন আমি নই, একটা যন্ত্রচালিত পুতুল যাচ্ছে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে।

"আর ভয় নেই," মোটরে ওঠবার আগে বাবা তাঁর কর্মীদের লক্ষ্য করে বললেন,—"ধনীরা এবার নজর দিয়েছেন। মাড়োয়ারী রিলিফ-ফণ্ড, ব্যবসাযী-মণ্ডল, মিশন, সবাই এসে পড়েছেন—আর ভয় নেই!"...

এরই কয়েকটা দিন পরের এক রাত্রিবেলা। বাইরের একটা জরুরী কাজ সেরে বাডী ফিরছি, ছাডছি পোষাক। বুডী ঝি এসে জানাল—"মা ডাকছেন!"

মা ডাকছে! আমাকে মার এভাবে ডাকাটা অভাবনীয়, তাই একটু বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

ওঁদের ঘরে ঢুকে দেখি, একটা চেয়ারে বসে আছেন বাবা। বাবার পায়ের কাছে মেঝের ওপর বসে মা। একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে মনে হলো, মায়ের চোখ ফোলা, ঈষৎ আরক্ত, বোধহয় কাঁদছিল।

"খোকা?"—কান্নাভরা কণ্ঠে মা বলে উঠল, "একটা ভিক্ষা দিবি? কিছু টাকা। আমরা বৃন্দাবন চলে যাব।"

"বৃন্দাবন!"

"হ্যাঁ নিখিল,"—বাবা বললেন, "অবশ্য, তোমার যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে! তোমার মা সারাজীবন বড কষ্ট পেয়েছেন, বৃন্দাবনে গিয়ে ধর্মকর্মে যদি কিছু শান্তি পান শেষ-বয়সে, কী বলো?"

অস্ফুটস্বরে বললাম,—"ধর্ম বুঝলাম, কিন্তু কর্ম?"

অল্প একটু হাসলেন বাবা,—"কী সব অনাথ-আশ্রমের কর্ম—ইচ্ছা হলে কতো কাজই তো করা যায়!"

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম ওঁদের দৃষ্টির বাইরে। আকাশটা কালো, হয়তো কৃষ্ণ-পক্ষেরই কোন একটা রাত সেটা।

"কত অন্যায় করেছি তোমার ওপর"—মার কান্নাভরা কণ্ঠস্বর এখান থেকেও শুনতে পাচ্ছি, "কেমন করে সহ্য করেছ!"

পরম স্নেহভরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন বাবা,—"ছিঃ, কেঁদো না। এসো, যাবার বেলায় নিখিলকে আশীর্বাদ করে যাই।"

"কিন্তু"—মা হু হু করে কেঁদে ফেলল, "আমার কমলকে কোথায় ফেলে গেলাম!"

"ছিঃ, কাঁদে না!"

আমি সরে এলাম, পালিয়ে এলাম ওঁদের কাছ থেকে। ওঁরা আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন, একটা অব্যক্ত রুদ্ধ অভিমান আমার অন্তরে নিরন্তর গুমরে উঠছে!…অন্যদিকে একটা প্রচণ্ড উল্লাস! আজ, এতদিন পরে, কোন সে মহান্ ভিত্তিভূমির ওপর এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে মা ও বাবার মধ্যে অবশেষে সেতুবন্ধন সম্ভব হলো!

শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত যে-গ্লানি যে-বিষ আমার জীবনকে তিলে তিলে জীর্ণ করে চলেছে, সে-গ্লানি সে-বিষ মথিত হয়ে উঠেছিল ওঁদেরই পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও অন্তরের অসহযোগিতা থেকে।…বাবার পায়ের কাছে বসে আমার মা—এ দৃশ্য যাঁরা আজ দেখলেন না—তাঁরা কোথায়? পায়ে সেই

কাঠের ফলক, দু'চোখে স্বপ্নময় দৃষ্টি—আমার দাদুকেই মনে পড়ল সব থেকে আগে!

পরদিনই চলে গেলেন মা আর বাবা। প্রশান্তকে শেষবারের মত আদর করে আমার কোলে তুলে দিয়ে মা বলল—"যা হবার হয়েছে, তুই না হয় আরেকটা বিয়ে কর। না হয় মায়াকেই—"

কথাটা মা শেষ করতে পারেনি এবং তার উত্তরে আমিও কিছু বলতে পারিনি।

এদিকে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হয়। নির্বোধ শিশু, কিছু বোঝে না, কোলে উঠে মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে! সজোরে ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরি—"সকলেই চলে গেল, কিন্তু ভয় নেই বাবা, আমি আছি।"

বড করুণ, বড করুণ ওর মুখ। কিন্তু বড় সুন্দর, শান্ত। মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওর মাকেই মনে পডে। সেই রকম চিবুকের গঠন, পাৎলা ঠোঁট, বড বড় চোখ দুটোয় ওর চোখের চঞ্চলতাই ভেসে ওঠে!

"বাব্বা!"—ছোট ছোট হাত দিয়ে আমার গলাটা বেষ্টন করে ধরে তারপর টুকটুকে ঠোঁটে চমৎকার হাসি টেনে আনে ঐটুকু ছেলে।

"কী বাবা?"—বোধ হয় ও বোঝে আমার বুকের ভিতরের ঝডটাকে, তাই ছোট্ট মাথাটা বুকে রাখে। বলতে পারে না কথা—এইভাবেই যেন সান্ত্বনা দিতে চায়।

কিন্তু আমি কী ভেঙে পড়ব? একটা প্রচণ্ড অভিমান অন্তরটাকে মথিত করে ওপরের দিকে ঠেলে ঠেলে আনছে,—ইচ্ছা করছে তাসের ঘরের মত সব কিছু ভেঙে চুরমার করে ছুটে পালাই!

বাড়ীতে আমি আর ঐ শিশু। আর কেউ নেই, মা-ও নেই। যেন সমস্ত ছায়ার স্নিগ্ধতা সরে গিয়ে অসহ্য রৌদ্র এসে পড়েছে পথে ঃ মা কাছে নেই! যেন জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বনটাই নেই—মনটা অদ্ভুত ফাঁকা, কেমন যেন আরও অসাড়, আরও-চেতনাহীন!

এক সন্ধ্যায় হঠাৎ-ই রেঁস্তোরায় বসে পানরত পরেশের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, "আমিও খাব।"

প্রথমটায় ও হেসে উঠেছিল। কিন্তু হাসবার কথা নয়—আমি সত্যই

পানপাত্র মুখের কাছে তুলে ধরলাম। আর তারপরেই যেন জলন্ত অগ্নিস্রোত আমার গলা দিয়ে জঠরে নেমে গেল।

ঝন্‌ঝন্‌ করে তারের যন্ত্রের মত আমার সমস্ত শরীর যেন বাজছে সেদিন! ওকে বললাম,—"কোথায় যাচ্ছ, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

আবার হেসে উঠল। তারপরে একটু থেমে বলল—"কী হয়েছে তোমার?"

"কিচ্ছু না। কিন্তু আমি যাব। পরেশ, আমাকে স্রোতের মতো দুর্নিবার গতিতে ভেসে যেতে দাও—এক মুহূর্তও যেন থামতে না হয়, থামলে আমি পাগল হয়ে যাব!"

পরেশ হয়তো বুঝল না, হয়ত বুঝল। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ওর সঙ্গে। সহরের বুকেই এবং ভদ্রপল্লীতেই। পরেশ বলল, "বিশ্বাস করো, ভদ্রঘরেরই মেয়ে।"

"কিন্তু…!"

হেসে উঠল সশব্দে, বলল, "তুমি আজ একটু নেশা করেছ, না? তাই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। দিস্‌ ইজ্‌ ফ্যামিন্‌—মন্বন্তর। দু'মুঠো অন্নের কাছে সব গেছে ভেসে! তোমার সমাজ, তোমার নীতিবোধ, তোমার নারীর সতীত্ব—সমস্তই আজ মাত্র দু'মুঠো ভাতের কাছে নগণ্য হয়ে গেছে!"

"কিন্তু…তুমি!"

"এবং তুমিও,"—পরেশ আবার হেসে উঠল, "দিস্‌ ইজ্‌ দ্য এজ্‌ মাই ফ্রেণ্ড! মেক মানি অ্যাণ্ড এন্‌জয় লাইফ! যে মেয়েটার কাছে আমি যাই, সে তরুণী বিধবা। ওরা দুই বোন। দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার। বাপ বুড়ো, যৎসামান্য আয়, তার ওপরে মা নেই। মেয়েটি এইভাবে গোপনে আয় করে, সংসার চালায়। তারপরে ছোট বোনটিকে শিক্ষয়িত্রী রেখে বাড়ীতে পড়ায়। বোনটি পাপস্পর্শহীন হয়ে যাতে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই ওর ইচ্ছা! নট্‌ ব্যাড, কী বল? এই যে এসে গেছি!"

দুটো-তিনটে ক্ষুদ্র গলি পার হয়েই একটা ক্ষুদ্র টিনের বাড়ী। তারই এক অংশে এসে চুপি চুপি পরেশ বন্ধ দরজায় কয়েকটা টোকা দিল।

এতক্ষণ এতটা বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি নেশায় ধরেছে, পা টলছে, কথাও একটু জড়াচ্ছে, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, ইচ্ছা করছে কোথাও বসি বা শুয়ে পড়ি!

একটু পরেই দরজা খুলে গেল, পরেশ আমার হাত ধরে টেনে তাড়াতাড়ি

নিয়ে গেল ভিতরে, দরজা বন্ধ হল। ছোট্ট উঠান, ছোট্ট দাওয়া, তারপরে একখানা ঘর। আমরা মেয়েটীর পিছনে পিছনে সেই স্বল্পালোকিত ঘরে গিয়ে বসলাম। দাওয়ার মাঝখান থেকে উঠানের প্রান্ত পর্যন্ত একটা বিস্তৃত দরমার আড়াল লক্ষ্য করেছি। বুঝলাম, ওপাশেই মেয়েটীর সংসার, পিতা ও বোন—এপাশের আয়োজন সাময়িক। পরিচয়-বিনিময়ের মুহূর্তে মেয়েটীকে ভাল করে দেখলাম। সরু চুড়ি-পাড় ধুতি পরনে, গায়ে সাদা একটা ব্লাউজ। হাতে ছু'গাছা করে চুরি, গলায় সরু একছড়া হার। মুখে সামান্য একটু প্রসাধনের স্পর্শ! মেয়েটী, যতদূর সে-রাতে মনে হয়েছিল,—সুন্দরীই বটে। মেঝেয় পাতা পরিস্কার বিস্তৃত বিছানায় বসে আমরা গল্প করছিলাম। মেয়েটির নাম ললিতা। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, কেমন যেন চকিত হয়ে এদিক-ওদিক চাইছিল। একসময় পরেশেরও এটা লক্ষ্য পড়ল।

"'কী গো, আজ এত চমকে চমকে উঠছ যে বড় ?"

''ভয় করছে!"—মেয়েটী উত্তর দিল, ''আজ সেই শিক্ষয়িত্রীটি আসবে বোনকে পড়াতে! সে যদি একবার টের পায়!"

''ড্যাম ইট্",—জড়িত কণ্ঠে পরেশ বলে উঠল, ''কিন্তু তার আসবার দিন তো আজ নয়! সপ্তাহে সে ছুদিন আসে, মঙ্গল আর শুক্রবারে, তাই না? তার জন্যে ঐ ছুটো দিন আমিই ছাই আসতে পারি না। তা সে বেটী আজ কেন আসছে, আজ তো তার দিন নয়, আজ তো আমার দিন, কী বলো!"

''আগে জানতুম না,''—ললিতা বলল, ''বোনের পরীক্ষা সামনে, বোনকে নাকি বলে গিয়েছিল আজ আসবে, আমি এ খবরটা ওর কাছ থেকে এই একটু আগে জানলুম।"

''যাক্ গে,"—পরেশ বলল, ''একটু সামলে নাও, জানতে দিও না। আর জানলেই বা? হ্যাঁ, ওরকম অনেক ছুঁড়ি-শিক্ষয়িত্রী…!"

মেয়েটী হেসে বললে,—''সে গুড়ে বালি, বড় শক্ত মেয়ে!"

''ড্যাম্ ইট্"—পরেশ পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা শিশি বার করে, তার পর বলে, ''যদি অনুমতি হয়…!"

মেয়েটী একটু মুচকি হেসে মাথা নেড়ে বলে,—"আচ্ছা খেতে পারেন।"

পরেশ আমার দিকে তাকায়, বলে—"উইল্ ইউ ?"

আমি হাত নাড়তেই কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে নিরাশার ভঙ্গী করে ঢক ঢক করে গলায় অনেকটা ঢেলে ফেলে।

"ঐ এসেছে বুঝি"—মেয়েটা উঠে দাঁড়ায়, "হ্যাঁ, এসেছে ; গলা পাচ্ছি, আপনারা বসুন, আমি এখ্‌খুনি আসছি। দেখবেন, গোল করবেন না যেন!"

মেয়েটা চলে যায়, আবার একটু পরেই ফিরে এসে পরেশের কাছ ঘেঁসে বসে—পরেশ ইতিমধ্যে শিশিটা প্রায় খালি করে ফেলেছে। মেয়েটা বলে, "পড়াতে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। তাহলেও মাঝে মাঝে আমাকে ছেড়ে দেবেন কিন্তু, এক-একবার গিয়ে দেখে আসব।"

"অল্ রাইট"—পরেশ মেয়েটার হাত ধরে এক ঝট্‌কা মারতেই ঢলে পড়ল ওর বুকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বেড়ার কাছ থেকে একটা ধারালো মেয়ে-কণ্ঠ ভেসে এল—"ললিতা ?"

ললিতা ধড়মড়িয়ে তৎক্ষণাৎ উঠতে গেল, কিন্তু পারল না। প্রমত্ত মাতাল মানুষটি তখন তাকে কঠিন বাহুপাশে বেঁধে ফেলেছে।

দ্রুত পদশব্দ, আর তারপরেই দরজার সামনে একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়াল।

"ললিতা!"

বেগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বিস্রস্ত বেশবাসে ললিতা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মূর্তিটি ঘরে এল। কঠিন কণ্ঠে ওর দিকে চেয়ে বলল,— "অনেক শুনেছি, সন্দেহও করেছি, আজ নিজের চোখেই দেখলাম।"

ললিতা তখন কাঁপছে থর্‌থর্ করে। মূর্তিটি ততক্ষণে চট্ করে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। কঠিন কণ্ঠেই কী যেন বলতে গিয়েছিল—আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ-ই থমকে থেমে গেল।

বিপুল বিস্ময়ে আমিও ততক্ষণে ওর মুখের দিকে চাইতে চাইতে উঠে দাঁড়িয়েছি —"মায়া!"

দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে মুহূর্তকাল নিজেকে সামলে নিল মায়া। তারপরে আবার কঠিনতর হল তার ঋজুভঙ্গী, ধারালো তীব্র কণ্ঠে বললে,— "বেরিয়ে যান—আপনারা বেরিয়ে যান শীগ্‌গির! এটা ভদ্রলোকের বাড়ী মনে রাখবেন। আর কোনদিন এদিকে আসবেন তো যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে বলে রাখছি। যান—শীগ্‌গির যান, নইলে পুলিশ ডাকব, ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে তুলব!"

মাথা নীচু করে টলমল পদক্ষেপে আমরা বেরিয়ে এলাম।

"মায়াদি!"—ললিতা ততক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

মায়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—"ভয় নেই বোন, আমি আছি, ভয় কী? তোমার দোষ নেই, কী নিদারুণ অবস্থায় পড়ে তুমি এসব করতে বাধ্য হয়েছ তা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি এর আগে আমাকে একবারও জানালে না কেন?"

মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল। দরজার বাইরে এসে আমি কিন্তু আর পারলাম না। আমার সর্বশরীর কাঁপছে, মাথা ঝিমঝিম করছে, পা টলছে, দরজার পাশে আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসে পড়লাম।

পরেশ বললে,—"এ কী?"

ধমকে উঠলাম ওকে,—"যাও, চলে যাও, আমি থাকব এখানে, তোমার জন্যই ত এই সব।"

এ অবস্থাতেও মানুষ হাসে? পরেশ হাসল,—"মেয়েটাকে চিনতে বুঝি, শিক্ষয়িত্রীটিকে?"

জ্বলে উঠে চীৎকার করে বললাম,—"গেট্ আউট্!"

"একা থাকবে এভাবে বসে?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা-ই থাকব, শীগগির চলে যাও তুমি।"

"যদি পুলিশ-টুলিশ···।"

চীৎকার করে উঠলাম, "তুমি যাবে কি না?"

"যাচ্ছি—যাচ্ছি।"

"না, এখখুনি যাও!"

টলতে টলতে পরেশ সেই নির্জন গলিটা পার হয়ে গেল দেখতে পেলাম। আমার সমস্ত শরীর দিয়ে তখন যেন আগুন ছুটছে।

কতক্ষণ ঐভাবে বসে ছিলাম জানি না, একসময় হঠাৎ মনে হলো, আমার হাত ধরে কে যেন টানছে, কে যেন মায়ের মত উদ্বেল স্নেহ নিয়ে আমাকে স্পর্শ করছে। চোখ মেললাম।

"মায়া।"

"হ্যাঁ, আমি",—ধীর কণ্ঠে মায়া বলল, "বন্ধুটি পালিয়েছে বুঝি? উঠে দাঁড়াও, এস আমার সঙ্গে। চলতে পারবে? আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল।

"মায়া!"—বললাম, "আজ কতদিন পরে···।"

"এখন থাক ওসব কথা,"—মায়া বলল, "আমার কাঁধে ভর দিয়ে খানিকটা চল দেখি, বড রাস্তায় নিশ্চয়ই ট্যাক্সী পাব।"

"মায়া, আমি বড় পাপী!"

"ছি!"—মৃদু তিরস্কারের স্বরে ও বলে উঠল, "নেশার ঝোঁকে কী যা তা বকছ!"

"আমাকে ক্ষমা করো মায়া!"

"আঃ। বড্ড বাজে বকছ। তাড়াতাড়ি তোমাকে বাসায় নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। ঐ যে ট্যাক্সী। একটু দাঁড়াও, না—না, আমার হাত ছেড়ো না, পড়ে যাবে, আমি ট্যাক্সীকে ডাকছি···এই ট্যাক্সী···ট্যাক্সী!"

এলো ট্যাক্সী, বহু কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে পার হলাম কতগুলো অন্ধকার পথ। তারপরে একটা একতলা পরিচ্ছন্ন বাড়ীর একাংশ। তালাবদ্ধ দরজায় চাবি দিয়ে তালা খুলে আমাকে নিয়ে মায়া ভিতরে ঢুকল। আলো জ্বালল। তারপরে পায়ের জুতো খুলিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল আমাকে। আমার সমস্ত ভিতরটা তখন কিসের একটা দুঃসহ উদ্বেগে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে। তারপরে সঠিক মনে নেই কী হয়েছিল রাত্রে। অস্পষ্ট মনে আছে আমার মুখের কাছে কে যেন এসে ধরল জলের গ্লাস, কে যেন পরম যত্নে মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল। শিয়রের কাছে বসে কে যেন জোরে-জোরে হাত পাখা নেড়ে আমাকে সুস্থ করে তুলতে লাগল।

এইভাবে কেটে গেল রাত। যখন আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠলাম, তখন রীতিমত সকাল হয়ে গেছে। আর সেই প্রখর আলোয় যখন সব কিছু হয়ে উঠল স্পষ্ট, তখন লজ্জায়-গ্লানিতে ভরে গেলাম। পাশ ফিরতে গিয়ে দেখি মাথাটা তখনও যেন ভারী ভারী—গা-হাত-পা বেদনায় ভরা। মেঝেয় চোখ ফিরিয়ে দেখি জল ও একগাছা ঝাঁটা নিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করে তুলছে মায়া। ঘরখানা ছোট। যদিও সামান্য উপকরণ তাহলেও চমৎকার সাজানো! আমার সাড়া পেয়ে মায়া উঠে দাঁড়াল। জলের ঘটী ও ঝাঁটা ফেলে রেখে আমার একটু কাছেই সরে এল, বলল,—"ঘুম ভাঙল এতক্ষণে?"

ওর মুখের থেকে চোখ নামিয়ে আবার চোখ তুললাম মুহূর্তের জন্য। বেশ দেখাচ্ছে ওকে। আঁচলের প্রান্ত আঁট করে কোমরে বাঁধা, পায়ের কাছে সাড়ীটা অনেকখানি ভিজে গেছে।

আরও কাছে এল, বাহু-প্রান্তে হাত দিয়ে একটু নাড়া দিল, বলল, "ওঠ দেখি, আগে বাথরুম হয়ে এস। ঈস্, জামাকাপড়ের অবস্থা দেখেছ? নোংরায় ভর্তি। সব ছেড়ে ফেল। বাথরুমের আলনায় আমার একটা পরিষ্কার কাপড় রেখে এসেছি, সেটা পরো। তেল আছে, ভাল করে স্নান করো কিন্তু।"

ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছি, বললাম, "শরীরটা যেন কেমন-কেমন…!"

"ও সব ঠিক হয়ে যাবে, আগে স্নান করে এস, আমি কড়া করে এক কাপ চা করে দিচ্ছি, দেখবে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে! কেন যে ঐসব বদ্-বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ছাইপাঁশ গিলতে যাও? ও কী তোমার কাজ? দেখ দেখি, সারারাত বমি করে ভাসিয়েছ, নিজেও ঘুমোওনি, আমাকেও ঘুমুতে দাও নি! কই, ওঠ? আজ আবার ঠিকে ঝি-টা আসে নি, একা হাতে সৃষ্টি করতে হচ্ছে!"

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "আমি বাড়ী যাই!"

চট্ করে ফিরে এসে হাতটা ধরল, বলল, "পাগল! এ অবস্থায় তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না!"

তারপর হঠাৎ-ই মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "রাগ করছ আমার ওপর?"

আমাকে নিরুত্তর দেখে মৃদু একটু হাসল, বোধ হলো হাসিটা ম্লান, বলল, —"যত রাগ করতে হয় করো পরে, আগে সুস্থ হযে নাও লক্ষ্মীটি!"

মুহূর্তকাল থমকে থেকে ওর নির্দেশিত পথে বাথরুমে এলাম। পরিষ্কার সাড়ী ছিল আলনায়, সেটা পরলাম, গায়ে দিলাম ওরই একটা চাদর। আমার পরে ও ঢুকল বাথরুমে, বলল, "লক্ষ্মীটি, ঠিক তিন মিনিট, আমি চট্ করে স্নানটা সেরে নিই!"

ঘরে এসে দেখি, ঘরটা ঝক্‌ঝক্ করছে। বিছানার তোষক-বালিশ সব বাইরে রোদে শুকুচ্ছে, খাটের ওপর এখন একটা শুধু সাদা চাদর পাতা। বাড়ীটা ছোট্ট। তাহলেও অপরদিকে অন্য পরিবারের অস্তিত্ব বোঝা গেল। ওর অংশে এই একটিমাত্র ঘর, ভিতরে-বাইরে ছোট্ট দাওয়া, রান্নাঘর, বাথরুম, ইত্যাদি। অল্পের মধ্যে বেশ গুছানো। ওর ক্ষুদ্র টেবিলটার সামনে চেয়ার টেনে বসলাম। দেয়ালে গায়ে একটা কাঠের র‍্যাক্, তাতে খানকতক বই, টেবিলেও কয়েকটা বই-খাতা সাজানো। সামনেই একটা বই পড়ে ছিল, সেটা তুলতেই চোখে পড়ল একটা ছোট্ট বাঁধানো ফটো উপুড় করা। ফ্রেম্‌টা রূপালী কোন ধাতুনির্মিত, স্ট্যাণ্ডটিও তাই। কৌতূহল ভরে ফটোটা উঠিয়ে নিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে চমকে উঠলাম। একদা পদ্মাতীরের সেই ক্ষুদ্র জনপদে মায়াকে আমিই দিয়েছিলাম ওটা৮ বলা বাহুল্য, ওটা আমারই সেই বয়সের তোলা একটা ফটো।…

"এই…চোর!"

. পিছনে কখন ও এসে দাঁড়িয়েছে টেব পাইনি, চট্ করে হাত থেকে ফটোটা কেড়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল। সবেমাত্র স্নান সেরে এসেছে, একরাশ এলানো ভিজে চুল, কপালে সিঁদুরের টিপ্, ফটোটা বুকে চেপে ধরতে গিয়ে সমস্ত মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে! মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়াতেই চঞ্চলা হরিণীর মতই ছুটে গেল পালিয়ে, বলল,—"এক মিনিট, দাঁড়াও আসছি!"

একটু পরেই নিয়ে এল চা। চা খেয়ে বাস্তবিকই অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। বললাম,—"এবার কিন্তু আমাকে বাড়ী যেতে হবে।"

"না। আজ কিছুতেই যেতে দেব না। দেখছ না, আমিও অফিস কামাই করলুম। আমি বসে বসে রান্না করি, আমার হাতে আজ খেয়ে যাও।"

"কিন্তু…।"

"কিন্তু না,"—প্রগলভা কিশোরীর মতই বলে উঠল, "আমি যা বলছি তা করতেই হবে! রাত্রের আগে তোমাকে ছাড়ছি না, তা সে তোমার সুনন্দা যা-ই বলুক!"

"সুনন্দা!"

"বৌদির নাম না?"

বিস্মিত হয়ে বললাম, "কিন্তু তুমি জানলে কী করে?"

"জেনেছি!"

"না, বল শীগ্‌গির!"

একটু থেমে উত্তর দিল, "তোমারই মুখ থেকে, কাল রাত্রে; আন্দাজে বুঝেছি নিশ্চয় বৌদি! আচ্ছা, বৌদি এখন বুঝি বাপের বাড়ীতে?"

"হ্যাঁ। আর-কার নাম করেছি বল তো?"

"ওমা, নাম করবার মত আরও কেউ-কেউ আছে নাকি!"—বলেই হেসে ফেলল,—"না গো না, আর কোন নাম না, কেবল প্রশান্ত-প্রশান্ত করছিলে কয়েকবার। প্রশান্ত কে গো?"

"আমার ছেলে।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ,—"তাই নাকি! কত বড়!"

"বছর দেড়েকের হলো। কিন্তু আমাকে আজ ছেড়ে দাও মায়া, আমি বাড়ী যাই, ছেলেটা একলা রয়েছে, কী করছে কে জানে।"

"একলা! তার মানে!"

"সে এক বিরাট কাহিনী!"

"বলবে না আমাকে?"

"বলব।"

"তাহলে এস রান্নাঘরে,"—মায়া বলে উঠল, "আমি রান্না করব, আর তোমার কথা শুনব!"

"বেশ। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। কাছাকাছি কোথাও ফোন আছে? ফোন করে খোঁজ নিই কেমন আছে ছেলেটা। অবশ্য বুড়ো ঝি আছে, খুব বিশ্বাসী।"

"ফোন তো পাশের বাড়ীতে রয়েছে! দাঁড়াও তুমি, না আমি যাই, বল তো তোমার ফোন নাম্বার?"

বললাম।

"বিশ্বাসী কোন চাকর-বাকর আছে?"

বললাম, "কেন বল তো?"

"বলে দিই, প্রশান্তকে নিয়ে এখখুনি যেন এখানে চলে আসে। আর তোমার একপ্রস্থ জামা-কাপড, কেমন?"

পরম তৃপ্তিতে, পরম কৃতজ্ঞতায় ওর চোখের দিকে চাইলাম। ও একটু হেসে চলে গেল পাশের বাড়ীতে। খানিক পরেই ফিরে এল, বলল, "খবর সব ভাল।"

"প্রশান্ত?"

"ভাল আছে। একটু অপেক্ষা কর, এসে পড়ল বলে। কিন্তু একটা কথা, তোমার ঠিকানাটা জেনে নিয়েছি!"—হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে।

রান্নাঘরে একটা পিঁড়িতে বসে ওকে সব বলতে শুরু করলাম। উনুনে রান্না তদারক করতে করতে ও শুনছে। এমনই দুর্বল স্থানে ও স্পর্শ করেছে আমাকে—নাড়া-দেওয়া ফুলগাছ থেকে শরতের শিশিরের মত ঝরঝরিয়ে আমার মনের সমস্ত বেদনা আজ ওর কাছে ঝরে পড়ল। মা-বাবা, কমল, সুনন্দা সকলের কথাই ও শুনল।

"ঐ যাঃ, উনুনে কী যেন রান্না তোমার পুড়িয়ে ফেললে।"

মুহূর্তে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল মায়া, কিন্তু ব্যঞ্জনটা ততক্ষণে বাস্তবিকই পুড়ে গেছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "মুখখানা মুছে ফেল, চোখের জলে ভরে গেছে!"

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "চোখ জ্বালা করছিল উনুনের আঁচ লেগে।"

"তবে, গলাটা কেন অত ধরা-ধরা, লক্ষীরাণী!"

লুকাতে পারল না, আঁচলে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল, বলল—"এত ঝড় যাচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে!"

"ও কিছু না,"—বললাম, "তোমার রান্না আর তা বলে পুড়িও না যেন।"

"না।"

"এইবার কিন্তু তোমার গল্প।"

বললে,—"আমার আবার কী গল্প?"

"বলবে না?"

"কী শুনতে চাও?"

"সব।"

একটু থেমে বললে,—"বরুণবাবুকে মনে আছে? আমি তারই সঙ্গে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলাম!"

"কেন?"

মুখ টিপে হাসল, বললে,—"কী হবে শুনে, এই 'কেন'র উত্তর? সোজা বললাম, আমাকে তুমি চাও আমি জানি। যেতে পারবে এখখুনি আমাকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে? সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? দুদিনের সখ, একদিন মিটেও গেল। হয়ত সহজে মিটত না, আমিই মিটিয়ে দিলুম। বললাম, যথেষ্ট হয়েছে আর নয়, এবার পালাও। পালালেন। আমি একটা অফিসে চাকরী জুটিয়ে নিয়েছি। দাদা-বৌদি আমাকে কিন্তু ক্ষমা করেনি। সেই থেকে ওদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কও নেই, আমি যে কী ভাবে আছি, কোথায় আছি, তা-ও তাঁরা সঠিক জানেন না!"

বললাম—"সব কথা স্পষ্ট হল না কিন্তু।"

হেসে বললে—"মেয়েদের সব কথাই স্পষ্ট করে শুনতে হবে নাকি?"

"তা দরকার হলে হবে বই কি!"

"খুবই কী দরকার মনে হচ্ছে মশাযের? তবে শোন। দাদাবৌদি বিয়ে-বিয়ে করতে লাগলেন।"

"কার সঙ্গে ?"

হেসে উঠল,—"কার সঙ্গে আবার ? এই যে আমার সামনে এখন বসে রয়েছে। কিন্তু দাদা-বৌদি ত জানতেন না, সেখানে আমার স্থান হবার নয় !"

বলে উঠলাম—"কী করে জানলে ?"

বললেন,—"জেনেছিলাম বই কী। কিন্তু না, রাগ করিনি, তোমার ভাল হোক এটাই চেয়েছিলাম।"

বললাম,—"যাবাব সময় দেখা করলে না কেন, মাযা ?"

একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললে,—"কী বলছ ? দেখা ? না, দেখা করিনি। করাটা ভাল হতো না।"

আমি আর কোন কথা বলতে পাবলাম না। মায়া নয়, মনে জেগে উঠল আরেকজনের মুখ। পাশাপাশি আরও একজন, অজিতবাবু।

এইসময় রান্নার ফাঁকে হঠাৎ-ই উৎকর্ণ হযে কী যেন শুনল মায়া, তারপবে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল বাইরে ; যখন ভিতরে এল, কলকণ্ঠে ও তখন মুখবিত, ওর কোলে আমারই প্রশান্ত।

"বা-ব্-বা !"

আমাকে দেখতে পেযে দু হাত প্রসারিত করতেই মায়া বলে উঠল,—"কী বাপ্-সোহাগী ছেলে বাবা ! আমি যে এত আদর করলুম, আমি কেউ না, কেমন ? নাও, তোমার ছেলে নাও।"

ওকে কোলে নিয়ে মাযাকে দেখিয়ে বললাম,—"ও কে বল দেখি ?"

মুখে একটা আঙুল ঠেকিয়ে মায়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে দুষ্টুটা হঠাৎ-ই বলে উঠল,—"ম্-ম্-মা !"

লজ্জায় রাঙা হযে উঠল মায়ার মুখখানা, তারপর হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে—"দূর বোকা ছেলে, বল 'পিসী' ! আমি তোমার পিসী হই ; কত ভালবাসি। আসবে ? এস আমার কোলে। কত খাবার দেব, বিস্কুট দেব—আসবে ?"

সেই হতভাগিনীকে চকিতের জন্যে আবার মনে পডল, উদ্গত নিশ্বাস চেপে ওকে বললাম,—"যাও, পিসী হয়, পিসীর কোলে যাও।"

অবশেষে গেল। ওকে কোলে নিয়ে মায়ার কী আনন্দ !

[illegible]টা পোষাক নিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে দু চারটে কথা বলে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। মায়া প্রশান্তকে উচ্ছ্বসিত হয়েই আদর করছে।

আমার মনে পড়ল, এমনি একটি ছবি, সেই কতকাল আগেকার দেখা! আমি বালকমাত্র, বাবা নিয়ে এসেছেন আমাকে বাণী-পিসীর কাছে, ঠিক এমনি করেই বাণী-পিসী কাছে ডেকে আদর করেছিলেন আমাকে।

কিন্তু তারপর? সমস্তই একদিন সময়ের প্রলেপে বিবর্ণ হয়ে ক্রমশ মুছে যায়, সমস্ত আকর্ষণ, সমস্ত শ্রদ্ধা একদিন হয়ে ওঠে অর্থহীন! বাণী-পিসী মুছে গেছেন তাঁব সমস্ত সত্তা নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, হয়ত মায়াও একদিন যাবে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। অন্ততঃ আমার তা-ই তখন মনে হয়েছিল।

দুপুববেলা। বিছানায় শুয়ে আছি, প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে। মায়া শিয়রে এসে বসল একসময়। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আমিও স্তব্ধ। কয়েকটি দীর্ঘ মুহূর্ত নিশ্চুপে পার হয়ে গেল। শুধু অনুভব করলাম, আমার মাথাব চুলের মধ্যে ওর হাতখানা স্পর্শে নিবিড় হয়ে উঠেছে! কিছুক্ষণ পবেই শুনলাম ওর আগ্রহান্বিত মৃদু কণ্ঠস্বর,—"ঘুমুলে?"

চোখ বুজে ছিলাম এতক্ষণ, বললাম—"না।"

তারপর ওর হাতখানা টেনে নিলাম হাতে, বললাম—"মায়া?"

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে উঠে দাঁড়াল, বলল,—"একটা জিনিষ দেখবে?"

"কী?"

"দাঁড়াও, আনছি।"

উঠে গেল, কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল কী কতগুলি কাগজপত্র খাতা-বই নিয়ে। তার মধ্য থেকে বেছে বেছে বের করল ছোট একটা ছবি, মেলে ধরল চোখের সামনে। বললে—"কে, বলতে পার?"

দেখলাম, ভাল করেই দেখলাম ছবিটা। ছবিটা তরুণীব মূর্তি। বিশীর্ণ বিবর্ণ চেহারা, একরাশ কালো চুল মাথার ওপরে এলোমেলো জট পাকিয়ে আছে, চোখের নীচে কালি, কপালে-গালেও কালিমা, তবু চোখেব কোণে যেন আগুনের স্পর্শ লেগে আছে! মুহূর্তে শিউরে উঠে বললাম,—"চিনলাম না তো!"

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, বলল,—"আমি।"

"তুমি!"

"হ্যাঁ।"

সবিস্ময়ে বললাম,—"এ ফটো কবে তোলা? কী হয়েছিল তোমার! এ রকম কঙ্কালের মত! এ যে চোখ চেয়ে দেখা যায় না!"

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল মায়া, বলল,—"অথচ চোখ চেয়ে তোমরা সবাই দেখেছ। খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে মানুষ পথের ধারে মরে পড়ে গেল, এ ছবি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি লোকই দেখেছে।"

"মায়া!"

"কী?"

ওর হাত চেপে ধরলাম, "আমায় সব খুলে বল মায়া!"

আবার হাসি জাগল ওর ঠোঁটের প্রান্তে, তারপরে একখানা বই হাতে দিল তুলে, বলল—"পড়ে দেখ, সব বুঝতে পারবে।"

অসীম আগ্রহে বইটা খুললাম. একখানা নাটক, মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা।

মায়া বললে,—"বরুণবাবুই এ-দলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পালিয়েছেন, কিন্তু আমি এখনও আছি। কাজ ফুরোলে আমিও সরে আসব। জান? এ-অভিনয় আমাদের পেশা নয়, সাধনা, আদর্শ। আমরা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এইভাবে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আগুন ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি।"

আমি চুপ করে আছি।

একটু থেমে মায়া আবার বলল, "সামনের বুধবার কলকাতার এক থিয়েটারে আবার অভিনয় হচ্ছে, তুমি যাবে তো? টিকিট কিনেই যাবে। না গেলে রাগ করব।"

"যাব!"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ।"

গিয়েছিলাম। কিন্তু ভেতরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করিনি। চোরের মত গিয়েছিলাম, চোরের মতই ফিরে এসেছি। সেই থেকে চোখের সামনে কেবলি ভেসে ওঠে,—অনশনক্লিষ্টা সর্বহারা নায়িকার বেশে মায়া চীৎকার করে বলছে,—'আমাদেরই মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে তোমরা যারা ঘরের আঁধারে কুয়ে রাখলে, জমিয়ে রাখলে,—যখন আমরা অন্নহীন বস্ত্রহীন পথ চলতে চলতে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে গেলাম, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখলে,

তবু দিলে না পেটের ভাত, পরনের কাপড, আজ শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে বলে যাই—আমাদের মরণ বৃথায় যাবে না, তোমাদেরও মাথায় একদিন নেমে আসবে বজ্র, তোমাদেরও পায়ের নীচের মাটি একদিন কেঁপে-কেঁপে ধ্বসে পড়বে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে আতঙ্কে শিউরে উঠি। আমিও যে পাপ করেছি! পরেশের সঙ্গে মিশে আমিও যে ঘরের আঁধারে ওদের ক্ষুধার অন্ন লুকিয়ে রেখেছি!

মায়া একদিন এসেছিল আমার বাড়ীতে, দেখে গেল আমাকে আরও ভাল করে, তন্নতন্ন করে, অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে। কাছে তো আমিও দাড়িয়েছিলাম। সেই বিস্তৃত পদ্মার তীর—সেই নির্জন আমের বন। সেই আম্রবীথির পাতা-কাঁপানো শির্‌শিরে বাতাস আর ওর গান!

মায়া শুধু বললে,—"করেছ কী তুমি! এভাবে জড়িয়েছ নিজেকে! এ তো তোমার কাজ নয়! তুমি না কবি? টাকা—টাকা! কী হবে তোমার টাকা দিয়ে!"

গভীর কণ্ঠে বললাম,—"ঋণ শোধ করছি!"

"কিসের ঋণশোধ?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

আর কিছু বলল না মায়া। মুখখানা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ নিশ্চুপে কেটে যাবার পর উঠে দাঁড়াল, বলল,—"যাই, কেমন? আবার আসব।"

মায়া চলে গেল, কিন্তু রেখে গেল একরাশ চিন্তার বোঝা মাথায় চাপিয়ে! আর কত বাকী, কত বাকী ঋণশোধ হতে?

ছুটে গেলাম পরেশের কাছে। বললাম,—"আর বাকী কত?"

"কিসের বাকী?"

"শ্বশুরের ঋণশোধ?"

পরেশ অল্প একটু হাসল, বলল,—"পাগলের মতো এ কি চেহারা করেছ! বস দেখি চুপ করে।"

অস্থির হয়ে উঠলাম আরও। বললাম—"বুঝছ না পরেশ, আমরা পাপ করছি। ওদের মুখের অন্ন—"

বাধা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে ও বললে,—"Please keep quiet. যথেষ্ট নীতিকথা শুনেছি, আর না। পড়নি ?—'এ-জগৎ মহা হত্যাশালা' ?"

মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে বসে পড়লাম! বললাম,—"আমি ঋণজাল থেকে মুক্ত হলেই এ-সব কাজ ছেড়ে দেব—"

"What ?"

বললাম,—"শ্বশুরমশাইকে কত দেওযা হযেছে, আব কত বাকী, এটুকু এখন আমাকে জানিযে দেবে কী ?"

পরেশ বললে,—"সেটা তোমাব শ্বশুর-কন্যার কাছে গিযে এখুনি ত জেনে আসতে পার !"

মুখ তুললাম, ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম,—"ঠাট্টা করছ পরেশ ?"

ও আমার মুখের মধ্যে কী দেখল কে জানে, কোন কথা বলল না, শুধু ড্রয়ারটা টেনে খুলে ফেলল, বার করল একটা নোট বই। সেটাব একটা পাতা খুলে মেলে ধরল আমার সামনে। বলল,—"বুঝতে পারছ? পরশুদিন, শেষ পাইটি পযন্ত শোধ করা হয়ে গেছে। ভাউচার সই করেছে স্বযং তোমার শ্বশুর-কন্যা। দেখতে চাও ?"

বললাম,—"না।"

"বুঝতে পারছ, তুমি আজ সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত ?"

মাথা সোজা করে উঠে বসলাম, বললাম,—"কার টাকা থেকে এ-ঋণমুক্তি আমার ঘটল পরেশ ?"

ও বুঝি একটু অবাকই হল এ-প্রশ্নে, বলল—"কার আবার! তোমাবই টাকা !"

"বল কী! এরই মধ্যে আয় করলাম এত টাকা !"

ও একটু হাসল, বলল,—"যুদ্ধের কাল, ভুলে যাচ্ছ কেন ?"

তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলাম,—"দুর্ভিক্ষের কাল বল! কিন্তু এবার তুমি রেহাই দাও আমাকে এ-সব কাজ থেকে !"

পরেশ বললে,—"রেহাই আর নতুন করে কী চাও? অফিসের কোন কাজটা আজকাল দেখ তুমি! আমি জানি, সেই কমিউনিস্ট মেয়েটাই তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

"কমিউনিস্ট !"

পরেশ বললে,—"আমি খোঁজ নিয়েছি। ঐ যে মায়া বলে মেয়েটি তোমার

কাছে আসে? সেই যে ললিতার বাড়ীর শিক্ষয়িত্রীটি? অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কী? সেই মেয়েটি কমিউনিস্ট। ওর পাল্লায় পড়ে তুমিও না বিপদজনক মানুষ হয়ে দাঁড়াও।"

ভিতরে ঝড় বয়ে চললেও মুখে তার কিছু প্রকাশ হতে দিলাম না। অল্প একটু হেসে বললাম,—"ভয় পাচ্ছ নাকি?"

পরেশ বললে,—"ভয় পাচ্ছি না, সতর্ক হচ্ছি। **Any way,** কতগুলো কাগজ পত্র সই করবার আছে, করে যাও। আজও ত বসছ না অফিসে?"

বললাম,—"না, আজ কেন, কোনদিনও বসব না অফিসে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।"

মুখখানা ওর পাংশু হয়ে গেল মুহূর্তে। আমার দিকে কিছুক্ষণ ও তাকিয়ে রইলো ফ্যালফ্যাল করে। তারপরে, জড়দেহে যেন চেতনা ফুটে উঠল। ও বললে,—"এতই সহজ? সময় লাগবে।"

"লাগুক। আমি জানব, আমি আজ থেকেই ভিন্ন হলাম।"

"কী করবে?"

বললাম,—"ভাবি নি।"

ও বললে,—"বেশ, ভাবতে থাক। এখন, এই কাগজ পত্রগুলো সই করে দিয়ে যাও। কিছু কিছু কাজ আটকে পড়ে আছে।" নির্বিবাদে ও যা-যা বলল, করে দিলাম।

"হল ত?"

"হ্যা।"

"এবার যাই?"

"বেশ।"

এগিয়ে গিয়েও দরজায় কাছ থেকে ফিরে এলাম, বললাম,—"পরেশ, আমাদের বন্ধুত্বও কি ছিন্ন হবে?"

ও বললে,—"তোমার মর্জি।"

বললাম,—"যদি বলি, তোমার বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে গিয়ে ভাড়া থাকব,—তাতে কি তুমি খুব ক্ষুন্ন হবে?"

পরেশ বললে,—"এতটা এগিয়ে গেছ তা জানতাম না। **Divorce** আমাদের দেশে এখনও আইনসিদ্ধ নয়, নইলে পরামর্শ দিতাম, আগে সুনন্দার সঙ্গে **divorce**টা করে নাও।"

উত্তর দিলাম না, কঠোর একটা ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু। তারপরে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম ওর কাছ থেকে।

পথে নামতেই এক ঝলক হাওয়া এসে যেন আমাকে মুক্তির বার্তা শুনিয়ে গেল। ফিরে গেলাম বাড়ী। তখনও কলকাতায় বাড়ী-ভাড়া পাওয়া এত কঠিন হয়ে দেখা দেয়নি। সেইদিনই ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট্ খুঁজে বার করলাম। দেরী করা আমার আর সইছিল না, পরদিনই বুড়ি ঝি আর খোকাকে নিয়ে চলে এলাম ফ্ল্যাটে।. ছোট ছোট তিনখানা ঘর। সাজাতে গোছাতে সেইদিনটা কেটে গেল।

পরদিন চাবিটা ফিরিয়ে দিতে গেলাম পরেশের হাতে। ও বললে,—"সত্যিই বাড়ী ছাড়লে!"

"হ্যাঁ ভাই, মনে কিছু করো না।"

ও বললে,—"তোমার নতুন ঠিকানাটা লিখে রেখে যাবে কী?"

"নিশ্চয়ই।"

লিখে দিলাম। তারপর, আমার টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বই আর চেক্ বইটা পকেটে ফেলে আবার পথে নেমে এলাম। যে টাকা ব্যাঙ্কে আছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তা দিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবাও যায় না।

না যাক্, মনে মনে অদ্ভুত এক তৃপ্তি অনুভব করতে পারছি।

নতুন প্যাড আর নতুন বিল-বই ছাপিয়ে নতুন নাম নিয়ে শুরু করলাম অর্থোপার্জনের নতুনতর প্রয়াস। কিনলাম ছোট একটা টাইপ্‌রাইটার—সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। ফ্ল্যাটের একটা ঘরেই খুললাম আমার অফিস। সে অফিসের আপাততঃ আমিই কর্তা, আমিই বেয়ারা, আমিই ক্লার্ক্। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ ধরবার চেষ্টা করছি। সারা শহর জুড়ে যুদ্ধোদ্যম চলছে। মিলিটারী লরীর অবাধ গতি, বিপন্না নারীর আর্তনাদও কানে ভেসে আসে। ছেঁড়া কাপড়ে সমাজের লজ্জা নিবারণ হয় না!

মায়ার সঙ্গে দেখা করে ওকে একদিন বললাম সব কথা। ও এসে দেখেও গেল আমার নতুন ঘর। প্রশান্তকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে আদরও করে গেল। একসময় হাসিমুখখানা আমার দিকে ফিরিয়ে বললে,—"ওর যুগ হবে আলাদা, বুঝলে? ও যখন বড় হবে, তখন পৃথিবীরই চেহারা বদলে যাবে। তুমি ওর জন্য পুঁজি জমিয়ে যাও, সে পুঁজি ওর কোন কাজেই

লাগবে না। না-না, কষ্ট ও পাবে না,—ওর দুঃখকষ্ট নিরসনের ভার থাকবে সমগ্র মানব সমাজের হাতে। এক দলকে না খাইয়ে রেখে আরেক দল খেয়ে বাঁচবে, এ-আর হবে না। একদলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে, তার ফল ভোগ করবে আর এক দল,—এ-ও হবে না। সেদিন প্রতিভারও মুক্তি ঘটবে। শিল্পী সচ্ছন্দে করবে তার কাজ, কবি লিখবে তার কবিতা,—তার খাওয়া-থাকার ভাবনা তাকে আর ভাবতে হবে না।"

মায়া চলে গেল। প্রশান্ত তার অবোধ চোখ দুটি বড় বড করে তাকায় আমার দিকে, আর অদ্ভুত মায়ায় ভরে ওঠে মন। সেদিন কাজ ফেলে রেখে ওকে নিয়েই সারাটা দুপুর কাটাব বলে স্থির করেছিলাম। আকাশটা কালো হয়ে-হঠাৎ মেঘ করে এল। সেই মেঘমলিন আকাশের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইলাম, আর সঙ্গে বিচিত্র চিন্তায় ভরে উঠতে লাগল মন। মায়া তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত আমি জানি, কিন্তু তবু যদি আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, সে কাজ রেখে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করবে কী? সত্যি কথা বলতে কী, মায়া যে আমার কাছে কী চায়, আজও তা বুঝে উঠতে পারলাম না। অথবা কিছুই সে চায় না, চাইবার কথা ভাবতেও হয়ত পারে না।

সেদিন, কোথায় যেন কার কাছে একটা কাহিনী শুনছিলাম। কে এক ভদ্রলোকের অল্পবয়সী বউকে বিদেশী সৈন্যরা টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, স্বামীর বাপ-মা তাকে ঘরে তুলতে চান না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তরুণ স্বামীটি আর থাকতে পারল না, এগিয়ে এসে হাত ধরল বউটির, বললে,—"চল, এখান থেকে চলে যাই আমরা। আলাদা বাসা করে থাকব।"

কোন কোন কনট্রাক্টর আরও বেশী কনট্রাক্ট পাবার লোভে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত ব্যবহার করেছে,—এও পর্যন্ত কানে আসে।

চুপচাপ বসে বসে ব্যাপারটা চিন্তা করি। চিন্তা করতে করতে বহু সমস্যাই সহজ হয়ে আসতে পারে।

সমস্যা সহজ হয়ে এল কি না জানি না, কিন্তু, সেই মেঘসজল দিনে আমার মনে অদ্ভুত এক ভাবনার ছায়া এসে পড়ল। মায়ার কাছে ত সহজেই যেতে পারি, কিন্তু যাই না কেন? কোথায় বাধা? যেদিন থেকে শুনেছি, বরুণবাবুর সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল,—সেই দিন থেকে স্বাভাবিক ভাবেই একটা বাধার প্রাচীর গড়ে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। বাধা এল অন্য দিক

থেকে। মনে হতে লাগল, মায়ার থেকেও শক্তিময়ী এক নারী এসে দাঁড়িয়েছে তার সমস্ত বিভা নিয়ে,—যার কাছে দিনের পর দিন ধরে মায়ার মূর্তি হয়ে যেতে লাগল,—ম্লান—বিবর্ণ!

কিন্তু কেমন করে এ-কথা আমার জীবনে ধীরে ধীরে সত্য হয়ে উঠছে? সেই দৃপ্ত মুখ, সেই তির্যক দৃষ্টি,—কেমন করে সবাইকে আজ সরিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ নিজের স্থানটি করে নিল? না-না, থাক তার কথা। প্রশান্তকে বুড়ী ঝিটির কোলে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাজের চেষ্টা ত করতে হবে? বসে বসে আজে-বাজে চিন্তা করে লাভ কী?

পথ চলতে চলতে তবু প্রশ্নের হাত এড়াতে পারি না। সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে-চড়া সেই প্রবৃদ্ধ মানুষটির মত অজস্র চিন্তার ভার যেন একা আমারই ওপর এসে পড়েছে! মনে হল, আধপেটা খেয়ে—ছেঁড়া পোষাকে উদয়াস্ত ছুটোছুটি করে এ-কার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি? মানুষের কল্যাণ, মানুষের নিরাপত্তা, মানুষের জীবনের হয়ে পশুশক্তির বিরুদ্ধে? ক্রমে ক্রমে এক-দিন জার্মানীর পতন ঘটল, তারপরে জাপানের প্রান্তদেশে পড়ল আণবিক বোমা! সহস্র-সহস্র নিরীহ মানুষ হারাল প্রাণ, যুদ্ধ জয় করে কার কল্যাণ করলাম আমরা?

শেষ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অস্ত্রাঘাত থামল, কিন্তু অস্ত্রে শাণ লুকিয়ে লুকিয়ে সমানে চলেছে! জাতিকে গুঁড়িয়ে জাতি চায় এগিয়ে যেতে, এ কী সর্বনাশা ধ্বংসের সূচনা! মানুষের অনুসন্ধিৎসা ক্রমে ক্রমে এ কাকে এসে জাগাল? নিজের মৃত্যুবাণকে? যে ভীষণ পশুকে আজ জাগিয়ে তুললাম, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব কী নিয়ে?

ভাবতে গিয়ে নিজের শৃঙ্খলিত দেশকে মনে পড়ল। একে একে দেশ-নেতারা কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কোথায় সুভাষচন্দ্র?

কানে এল শৃঙ্খলের ঝঙ্কন! বৃটিশ এঁদের হাতে শৃঙ্খল পরিয়েছে, কিন্তু প্রাণকে বাঁধতে পারে নি। 'দিল্লী চলো,' 'জয় হিন্দ্'! জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে এগিয়ে আসছে 'আজাদ্-হিন্দ ফৌজ'! কী ভাবে ভারতের বাইরে গিয়ে সুবিপুল স্বাধীনতাকামী সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সেই অশ্রুতপূর্ব কাহিনী দেশবাসী শুনতে লাগল বিস্ময়ে, গর্বে।

এদেশের কত ছেলে ইয়োরোপের সমরাঙ্গন আর ব্রহ্মের সীমান্ত থেকে যোগ

দিয়েছিল আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে, তারও গল্প শুনেছি। শুনতে শুনতে হঠাৎই মনে হলো, যদি এমন হয়, কমল মরেনি, কমল আছে, ইটালীর সমরাঙ্গন থেকে যোগ দিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, ইয়োরোপ থেকে শ্যাম-ব্রহ্ম ঘুরে হয়ত ফিরে আসছে এতদিনে তার মাতৃভূমিতে, বীরের মত, রাজার মত!

সমস্ত শিরায় উপশিরায় বিরাট উত্তেজনা বোধ করছি, 'কমল আছে, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে।'

বুড়ী ঝি-টি একসময় আস্তে আস্তে কাছে এল, বললে,—"দিদিমণি এসেছিলেন।"

"দিদিমণি!"

বুড়ী ঝি হাসল, বলল,—"আমাদের বৌদিদিমণি গো, আজ এসেছিলেন।"

"বৌদিদিমণি! কে, সুনন্দা? ঠিকানা পেল কোথা থেকে?"

"তা কী জানি!" বুড়ী বললে,—"খোকাকে আদর করল, আমি যে দেখলুম। এত করে বললুম, এঘরের লক্ষ্মী তুমি, থাকো! তা কিছুতেই থাকল না গো, একটু চোখের জল ফেলল, বললে, তোমার দাদাবাবু আমাকে নেবে না, বুড়ীদিদি!"

ঝি-টি এইখানে হঠাৎ কেঁদে ফেলল,—"কষ্ট হয়, ওকেও তো কোলেপিঠে করেছি এককালে, সেই সোণার বর্ণ কালি হযে গেছে। বাবু, যান, লক্ষ্মীকে নিয়ে আসুন, ঘবদোরও আর মানায় না!"

স্তব্ধ হয়ে রইলাম। সুনন্দা এসেছিল! কিন্তু কেন?

কেন, সেকথা বুঝলাম দুদিন পরে। আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজ-দিবস। কলকাতার বুকে অকস্মাৎ বয়ে গেল রক্তের স্রোত! অকারণ কতগুলি তরুণ-তরুণী বালক-বালিকা আরেকবার রাজধানীর পথে বুকের রক্ত দিযে দাগ রেখে গেল! পুত্রের প্রাণহীন দেহের ওপর আবার কেঁদে পড়ল অভাগিনী মা, ভাইয়ের জন্য ভগ্নী, তরুণ পতির শবের পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল তরুণী পত্নী!

রাত্রে এল পরেশ। কী ভাবে যে প্রশান্তকে বুকে করে রাস্তাগুলো পার হয়ে এলাম জানি না, যখন হাসপাতালের একটা কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম, তখনো ওর জ্ঞান আসে নি। হাতে ব্যাণ্ডেজ, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, চুপচাপ শুয়ে আছে। শুনলাম অজিতবাবুও গুরুতর আহত, তিনি অন্য ওয়ার্ডে। আমার শ্বশুরমশাই তখন কলকাতায় নেই।

না, গুলি লাগে নি; কিন্তু আঘাতও সামান্য নয়। শিয়রের কাছে বসে

বিশীর্ণ করুণ মুখখানির দিকে বহুকাল পরে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। ঐ তো সেই মুখখানা! কত শান্ত, কত মধুর! কেমন করে ভরে যেত অদ্ভুত কাঠিন্যে কেমন করে হয়ে উঠত বিদ্বেষের বিষে বিষাক্ত?

ওকে ভালবাসি নি, কাছে ডাকি নি, তাই কি কঠিনতর হয়ে আঘাতে আঘাতে দীর্ণ করে আমার হৃদয়ে করে নিতে চেয়েছিল আপনার স্থান? তাই কি অবশেষে বুকভরা রুদ্ধ অভিমান নিয়ে ছুটে গেল পথে, দাঁড়াল মৃত্যুর সামনে? একবার শুধু এক মুহূর্তের জন্য ওর হাতখানা চেপে ধরেছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম,—"পরেশ, চললাম ভাই।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। ভাল লাগছে না।"

"শোন," পরেশ কাছে এলো, "অবস্থা খুব ভাল নয়। কী ভীষণ ব্লিডিং হয়েছিল শুনলে তো? ভগবান না করুন, যদি এই হয় শেষ—!"

শেষ! চমকে ফিরে চাইলাম ওর দিকে, ঠিক এই সময়ই কোলের ওপর কেঁদে উঠল প্রশান্ত, নার্সদের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলাম, বললাম পরেশকে,—"হোক শেষ, আমি যাই!"

পরেশ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। থাক দাঁড়িয়ে, অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে বিনি রাত কাটাক হাসপাতালে। সুনন্দা ওর কেউ নয়, তবু ওরই জন্য ও সব করছে এবং করবেও। ছায়ার মত অজিতবাবু আর সুনন্দার পিছনে পিছনে ঘুরেছে, লক্ষ্য রেখেছে ওদের গতিবিধির ওপর। পিতৃসম্পদের পিচ্ছিল পথ অবলীলায় ছেড়ে এসে যেদিন অজিতবাবুর সঙ্গে দুর্গম রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনন্দা, সেদিনও পরেশ নিঃশব্দে ওদের লক্ষ্য করেছে। কেন? এ করুণা নয়, দয়া নয়, বন্ধুর মুখ চেয়ে বন্ধুপত্নীর প্রতি এ নিছক প্রীতিও নয়,—এ ভালবাসা!

বন্ধু, পতঙ্গ হয়ে কেন পুড়েছিলে আগুনে, তাই তো অনর্থক এ তোমার উদ্বেগ, যত্ন, উৎসাহ, আশঙ্কা?

যাক চলে যাক, যেখানে খুসী চলে যাক! কিন্তু একি আমার স্পষ্ট চেহারাটা? এ কে? এ কে আমার মনের সবখানটা আজ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে! না, এ গৌরী না, এ মায়াও না, এ সুনন্দা! ভালবেসেছি, আমার সব কিছু নিয়ে সুনন্দাকেই ভালবেসেছি!

মাথায় ব্যাণ্ডেজ, হাতে ব্যাণ্ডেজ, সেই স্তব্ধ মুখখানি চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে। সমস্ত সান্ত্বনার অতীতে এসেছি, মনে হলো, এ কেমন করে

ঘটল, কেন ঘটল, কার জন্য? বর্বরের মত যারা এই নৃশংস মৃত্যুলীলা টেনে আনল, তাদের ক্ষমা করব কেমন করে? উত্তেজনায় সমস্ত রক্ত জ্বলে উঠল স্ফুলিঙ্গ হয়ে! একদিকে সুনন্দা হাসপাতালে, অপরদিকে কমল নিরুদ্দেশ! আমার দৃঢ় ধারণা কমল বেঁচে আছে, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে! একদিন বিজয়ী বীরের মতই ফিরে আসবে। কিন্তু আমি? না. পাগল হয়ে যাব আমি, তীব্র যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে!

এর পরের অনেকগুলি দৃশ্যের কথা আমার স্পষ্ট মনে নেই। এক প্রভাতে দুর্বল দেহ দুর্বল মন নিয়েই আমার ঘুম ভাঙল। ঘুমের মধ্যে এ কয়দিন অস্পষ্ট কেবল দেখেছি, দাদুর হাত ধরে তাক্‌লাথার পুরাংমণ্ডি হয়ে চলেছি কৈলাশে। লিধুপুরার পথে বড কষ্ট হচ্ছে, বড ঠাণ্ডা লাগছে। দাদু বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছেন, বলছেন, 'ভয় কী, আর একটু, আর একটু দূরেই সেই পরম শান্তির রাজ্য, সেই উন্নত শুভ্রতা—কৈলাস!'—কাছে, কাছে, খুবই কাছে! হঠাৎ দাদুর হাত ফসকে পড়ে গেলাম নীচে—অনেক নীচে! গাঢ় অন্ধকারের শূন্যতা! আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম, 'দাদু—দাদু!'

কপালে একটা তপ্ত স্পর্শ পেয়েই চমকে চোখ মেললাম। কে যেন পরম করুণাময় জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করে আমার মুখের কাছে একটা ছোট্ট কাঁচের গ্লাশ এগিয়ে নিয়ে বলছে, "এ ওষুধটা খেয়ে ফেল তো?

চমকে উঠলাম। এ কে! এ কার গলা শুনছি!

কপালের কাছে এখনো একটু তুলো লাগান, চওড়া লালপাড় ধবধবে সাদা সাড়ীর প্রান্ত কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে, সিঁথির সম্মুখটা নেমে পড়ছে, জ্বলজ্বলে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ, চোখ নামানো, ঠোঁট দুটি একবার কাঁপল যেন, তারপরে ওষুধটা ঢেলে দিল আমার মুখে।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, "খোকা কোথায়?"

নিশ্চুপে আঙুল দিয়ে দরজার দিকে দেখাল, পরক্ষণেই ঘোমটাটা ঠিক করে চলে গেল। দরজার কাছে প্রশান্তকে কোলে করে দাঁড়িয়ে ছিল মায়া। মায়া কাছে এল।

বললাম, "বস। কী হয়েছিল আমার বলতে পার?"

"ব্রেন্‌-ফিভার! হবে না? যে-ঝড় গেছে! ভালয় ভালয় যে সেরে উঠেছ এই যথেষ্ট নিখিলদা।"

"কী করে খবর পেলে তুমি ?"

হাসল মায়া, বললে, "তোমাদের সব খবরই আমি রাখি।"

একটু চুপচাপ থেকে বললাম, "ও কবে এল জান ?"

"কে, বৌদি ?"—মায়া বললে, "ও-ও তো হাসপাতালে শুয়ে। তখনো ভাল করে সারেনি। তোমার অসুখের কথা শুনে কিছুতেই থাকবে না হাসপাতালে, কাঁদতে লাগল, তারপরে একরকম জোর করেই চলে এল এখানে !"

"মায়া ?"

"কী নিখিলদা ?"

"কমলের কথা বড্ড মনে হয়। আমার মনে হয় ও বেঁচে আছে। আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজের…"

"আমারও তাই মনে হয়, নিখিলদা।"

কয়েকটা মুহূর্ত আবার চুপচাপ। একসময় প্রশান্তকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, "যাই নিখিলদা, আজ বাড়ী যাই, বহুদিন ওমুখো হই না তো! কী যে হয়ে আছে অবস্থা।"

"তুমি কি এ কয়দিন এখানেই ছিলে ?"

হেসে উঠল মায়া, বলল, "ছিলামই তো! কী রে প্রশান্ত, ছিলাম ?"

বাচ্চাটা কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ-ই অনর্গল হেসে উঠল।

কথা উঠেছে তো ছেলেটা!

"আজ আমার বড আনন্দের দিন, জান নিখিলদা ?" মায়া বল "তোমরা দুটিতে আবার মিলেছ, এ দেখে শুধু নয়, তুমি আজ জয়ী হ পরেশবাবু এসেছিলেন যে। তিনি না এলে কিছুই জানতে পারতাম না তুমি নাকি তোমার সুব স্বত্ব পরেশবাবুকে লিখে দিয়েছ ?"

"লিখে দিয়েছি!" পরক্ষণেই মনে পড়ল, সেদিন অফিসে যে ঘটেছিল, সেই কথা। সেই যে কতগুলি কাগজে পরেশ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিল ? সে-যে এই ধরনেরই কিছু একটা হবে,—এ-যেন মনে আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

মায়া বললে,—"কী ভাবছ ?"

অল্প একটু হাসলাম, বললাম,—"কিছু না।"

মায়া বললে,—"জান ? বৌদির আনন্দই সব থেকে বেশি। আমি

ন্তু জানতাম, এ-প্রেরণা তোমার মধ্যে আসবেই। কিন্তু না, আজ আর ন কথা নয়, ভাল হয়ে ওঠো, তারপরে শুরু হবে আমাদের কাজ।"

কেমন একটা অতর্কিত উচ্ছ্বাস এল ভিতরে, কত কথা বলতে গেলাম, কিছুই বলা হলো না। শুধু মনে হলো, একটা প্রকাণ্ড ভার যেন নেমে ছ হৃদয় থেকে। কী একটা অব্যক্ত আনন্দে আমার সমস্ত সত্তা ভরে গেল। য়ক মুহূর্ত থেমে বললাম, "মায়া?"

"কী?"

"তোমার বৌদিদি—"

অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনল মায়া, বললে,—"কতো সুখীই না হলো দি, যখন তোমার গল্প বললাম ওকে। জানো, বৌদির সঙ্গে ভীষণ ভাব হয়ে ছে আমার।"

করে রইলাম।

মায়া উঠে দাঁড়াল। বললে, "চললাম।"

মাঝে মাঝে এস কিন্তু।"

চলতে চলতে ফিরে এল মায়া, বললে,—"আসবই তো! তোমাকে কাজে মার। শোনো, বৌদিকে কাছে ডেকে দুটো কথা কও, বড্ড অভিমানী নই তো! যাই, ছেলেটাকে দিয়ে আসি, খিদে পেয়েছে বোধ হয়।"

গেল। অনেকক্ষণ কেটে গেল তার পর। কেউ এলো

খ বুজে রইলাম। বড় দুর্বল, বড় অসহায় তখনো মনে হচ্ছে

ৎ মনে হলো, কার যেন কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। কে

সে কান্নাকে রোধ করবার চেষ্টা করছে! চমকে চোখ খুললা

তো নেই ঘরে!

একটু পরে মনে হলো, আমার শিয়রের কাছে জানালায় কে

কমুহূর্ত চুপচাপ থেকে তারপরে ডাকলাম, অতি ধীরে অথচ আ

'ওগো?"

সাড়া এলো না।

"ওগো।"

এবারও না।

পুনর্বার ডাকলাম, "ওগো, শুনছ?"

আস্তে আস্তে এবার কাছে এসে দাঁড়াল, চোখ তেমনি নত, ঠোঁট তেমনি

মৃদুমৃদু কাঁপছে মনে হলো। হাত বাড়িয়ে ওর একটি হাত নিলাম বললাম, "বসো তো, দেখি কপালটা কতখানি কেটেছিল।

একটু আকর্ষণ করতেই হঠাৎ নীচু হয়ে মুখ লুকালো আমার বুকে, বল "বড আশা ছিল তুমি আমায় ডেকে নিয়ে আসবে, তা আর হলো না ডাকতেই আসতে হলো আমাকে।"

বললাম,—"ডেকেছিলাম নন্দা, শুনতে পাওনি মনে মনে ?"

ঘোমটা খসে গেছে, বন্ধনমুক্ত কেশবন্যার ওপরে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, "নন্দা ?"

"কী ?"

"খোকাকে কোলে নিয়ে আমাব কাছে একটু বসো ?"

মুখ তুলল সুনন্দা। এত কোমল, এত সুন্দর ওর মুখখানা! হাসি-ঝলমল মুখে উঠে দাঁড়াল, তাবপর ঘোমটাটা উঠিয়ে চলে গেল। আমার সুনন্দা, আমার সন্তানের জননী, আমাব প্রশান্তব মা!

একদিন আমার মা যেমন তার শিশু খোকনকে নিভৃতে কোলে নিযে দাঁড়াত, তেমনি করে সুনন্দা তাব খোকনকে নিয়ে এসে আমার কাছে বসল। আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি শিশু চোখ! এ যেন আমার মায়ের কোলে আবার আমি শিশু হয়ে দেখা দিয়েছি! বাণী-পিসী মায়া হয়ে শিশু

হেসে রছে, সুনন্দা মা হয়ে! কিন্তু কেমন হবে ওর জীবন? শিশুটির দি

বাচ্চাট অন্তর ভরে নিঃসংশয় চিত্তে এই কথাই যেন বলে যেতে পারি—

হয় উঠেছে। তোমার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক,—এ জন্মের বিন্দু বিন্দু রক্ত দি

"আজ প্রোজ্জ্বল বলিষ্ঠ জীবন ও সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা ক

"তোমরা দু

পরেশবাবু এ ক, এই সুকঠিন ভূমিকার ভূমিতেই রচনা করো আমা

তুমি নাকি তিহাস!